পথ জনহীন

আশাপূর্ণা দেবী

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ : দেবদত্ত নন্দী

প্রথম প্রকাশ
১৯৬১

পথ জনহীন

ফ্ল্যাটটা তিনতলার হলেও ব্যালকনি থেকে সেদিনের ছেলে দুটিকে চিনতে পারলো সুনয়না। 'সাঁতরাগাছি সাংস্কৃতিক সংঘ' না কী যেনর সেই স্যাংৎপেতে ছেলে দুটো। ওই নামটার মধ্যে কোনোখানে 'যুব' শব্দটাও ঢোকানো আছে কী? মনে হচ্ছে যেন।

গেটের সামনে দাঁড়ানো ট্যাক্সী থেকে নামলো ছেলে দুটো। চটপট নয়, একটু যেন কাৎ হয়ে হিঁচড়ে। সুনয়না দৃষ্টিটাকে তীক্ষ্ণ করলো। কী ব্যাপার! এটা আবার কী! এরা কী এখান থেকেই 'কবি সম্বর্ধনা' সেরে নেবে না কী?

একটা ছেলের হাতে মস্ত একটা 'গারল্যান্ড' আর অপর ছেলেটার হাতে একটা ঢাউস মার্কা 'বোকে'।

সুনয়না একটু চঞ্চল হয়ে ব্যালকনি থেকে চলো এলো। দেখলো পুরন্দর এখনো বাথরুম থেকে বেরোয়নি। কী মুস্কিল। কখন ঢুকেছে, পুরন্দর স্নান করতে ঢুকে গেলে সুনয়না পুরন্দরের সভায় যাবার উপযুক্ত সাজসজ্জা বার করে গুছিয়ে রেখে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ওদের আসাটা দেখবে বলেই দাঁড়িয়েছিল।

কী রকম গাড়ি আনবে দেখি, চকচকে ঝকঝকে কোনো প্রাইভেট কার, না ট্যাক্সী। প্রাইভেট কার হলেই ভালো হয়। আশপাশের সব ফ্ল্যাট থেকে দেখে।

কবি পুরন্দর রায় গলফ্‌গ্রীনের এই ফ্ল্যাটটা কিনে চলে আসায় বেশ একটু সাড়া পড়ে গেছে আশপাশের ফ্ল্যাটে।

সুনয়না বাথরুমের বন্ধ দরজায় দুটো টোকা দিয়ে ব্যগ্র গলায় বললে, এই, তোমার এখনো হয়নি? ওরা এসে গেছে।

বন্ধ দরজার ওদিক থেকে একটু তাচ্ছিল্যের স্বর ভেসে এলো, 'এসে গেছে' তো মাথা কিনেছে। বসাও। একটু দেরী আছে।

সুনয়না ব্যস্ত গলায় বললো, একটু তাড়াতাড়ি কর, প্লীজ, ওরা দেখলাম মালাটালা নিয়ে—

ডোর বেলটা বেজে উঠলো।

একেবারেই জোরালো, অসহিষ্ণুর মতো। তার মানে মুখ্যু! জানে না, প্রথমটা একটু আলতো চাপ দিয়ে সামান্যক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। দরজার সামনে তো বসে থাকে না কেউ।

দরজাটা খুলে দিতে হলো সুনয়নাকেই। কারণ, এখানে কাজের লোকেদের

রবিবার বিকেলটায় ছুটি দিতে হয়। ওদের ইউনিয়ন আছে। সব ফ্ল্যাটের ‘‘কাজ করিয়েরাই’’ ছুটি নিয়ে নেয়, ইচ্ছেমত এবেলাটা কাটায় অথবা নীচের চাতালে আড্ডা দেয়।

সুনয়না নম্র মার্জিত গলায় বলল, আসুন! বসবার ঘরের পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে বললো, একটু বসতে হবে। উনি তৈরী হয়ে নিচ্ছেন।

ছেলে দুটো বসবে কী! হাতের জিনিস দুটো নিয়ে যেন হিমসিম ভাব। নামাবে কোথায়?

সুনয়না ওদেরকে পাশের সোফাটা দেখিয়ে দিয়ে বললো, রাখুন এখানে।

তারপর একটু হেসে বললো, কী ব্যাপার? এখানেই মাল্যদানটান সেরে নেবেন নাকি?

ছেলেদুটো খুব নার্ভাস হয়ে গিয়ে বলে উঠলো, না! না! ইয়ে ট্যাক্সীতে ফেলে রেখে আসবো? আজকাল যা হয়েছে, হয়তো দেরী দেখলে আর ওয়েট না করে অন্য প্যাসেঞ্জার নিয়ে—

সুনয়না হাসলো, ঠিক আছে। বসুন আপনারা। দেখি, আপনাদের কবিকে তাড়া দিইগে—

ফিরে এসে দেখলো, পুরন্দর তোয়ালে ঘষে শুকনো-করা গায়ে পাউডার ঢালছে। গায়ে যত পড়ছে, মাটিতে পড়ছে তার বেশী। কারণ, পাখাটা খুলে দিয়েছে ফুল স্পীডে।

খুব চাপা গলায় বলল, এই, একটু চটপট নাও। ওদের ট্যাক্সীর মিটার উঠছে।

ট্যাক্সী?

পুরন্দর চাপা বিরক্তির গলায় বললো, রাবিশ! এই জন্যই ওইসব বাজে জায়গায় যেতে চাইনা।

সুনয়না মনে মনে একটু হাসলো। মনে মনেই উচ্চারণ করলো ‘চাওনা’। আবার চাও ও। যখন এরকম সব এরা এসে তোমার কাছে ধর্না দেয়, যতই ‘না না’ করো, তোমার মুখের রেখায় যে বেশ একটু আহ্লাদ আর গর্বের রেখা ফুটে ওঠে। সে তো আর এই সুনয়না রায়ের চোখ এড়ায় না। আহ্লাদ না হবারও তো কারণ নেই।

সবাই আমায় চাইছে, আমি দুঘণ্টার জন্য তাদের আসরে গিয়ে বসলে ধন্য বোধ করছে, তার জন্যে ধর্না দিচ্ছে এবং খরচাপাতি করে সসম্মানে সাবধানে ‘আনাযানা’ করছে, এটা আবার খারাপ লাগার জিনিস না কি?...এসেও তো তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে হলেও হেসে হেসে শোনাবে হে। কী রকম সব

সুন্দরী-সুন্দরী তরুণীর ঝাঁক তোমায় ঘিরে ধরেছিলো। তোমার অটোগ্রাফের জন্যে কী পরিমাণ বাড়াবাড়ি হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে! আর উদ্যোক্তারা কতোখানি কৃতার্থমন্য ভাব দেখিয়েছিলেন।

পুরন্দর বললো, এই পাঞ্জাবিটা কী জন্যে দিলে?

এটা পুরন্দরের একটা মুদ্রাদোষ। নিজে আগে থেকে কিছু বলে না। অথচ সুনয়না যেটাই গুছিয়ে বার করে রাখবে, সেটা নিয়েই একবার প্রশ্ন তুলবে।

মাখনরঙা ফুলকারি করা পাঞ্জাবিটা আর দুধশাদা পায়জামাটাকে একটু টান মারলো পুরন্দর। পাট আলগা করে এগিয়ে দিলো ফিকে গেরুয়ারঙা শান্তিনিকেতনী উত্তরীয় খানা।

সুনয়না জানে, এখানে জোর দেখাতে হয়। বললো কেন, এটা তো খুব সুন্দর। এই সেটটায় তোমায় দারুণ মানায়।

পুরন্দর চুলে শেষ চিরুণিটা চালাতে চালাতে অবজ্ঞার গলায় বললে, দারুণ মানিয়ে কী হবে? যাচ্ছি-তো ভারী জায়গায়। তাও আবার ট্যাক্সীতে। উৎসবের ঘটা করছে, একখানা প্রাইভেট কার জোটাতে পারেনি। সুনয়না মুচকি হেসে বলে, 'একখানা' হয়তো জোটাতে পেরেছে। তবে সেটা তো আর কবির জন্য খরচা করতে পারেনা? সেটা নিশ্চয় যাবে মন্ত্রীকে আনতে। 'সবার উপরে মন্ত্রী সত্য তাহার উপরে নাই।' এটা তো ঠিক।

সুনয়নার এই মুচকিহাসি-মাখা মুখটা আদৌ পছন্দ হয়না পুরন্দরের। মনে হয় যেন ওর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন একটি বিদ্রূপ রয়েছে। ভাবটা যেন, এই সব 'সম্বর্ধনা' বা 'সভাপতি' প্রধান অতিথিত্বগুলো কোনোটাই তোমার মহিমার খাতে নয়। ওগুলো ওদের নিজেদের মহিমা বাড়াতে।

আশ্চর্য, কেন যে এমন মনে হয় পুরন্দরের, সুনয়না তো মুখে কোনোদিন এ ধরনের কথা বলে না। বরং যখন পুরন্দর আপত্তি জানায়, 'না না' করে, তখন বলে, যাওনা বাবু। এতো করে বলছে। গেলে কৃতকৃতার্থ হয়ে যাবে। তোমার সময় নষ্টর ক্ষতিটা তুমি একটু রাতটাত জেগে ম্যানেজ করে নিও।

অথচ এখন ওই 'মন্ত্রী' নিয়ে কৌতুক উক্তি।

অথচ কপাল এই, মন্ত্রী একখানি আছেনই। এবং যাবেনও। তা সে সভায় যত বড় বড় কবি সাহিত্যিক গায়ক বাদকই আসুন। আর কার্ড দেখলেই সুনয়না বলবে, নৈবেদ্যের চূড়ায় যেমন একখানা 'মণ্ডা' কম্পালসারি, তোমাদের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের চূড়োতোও তেমনি একজন মন্ত্রী কম্পালসারি। আসল জেল্লা ওই ওনারাই। তবে হ্যাঁ, তেমন অভাব ঘটলে একখানি 'চিত্রতারকা' এনে ফেলতে পারলেও চলে যায়। শুধু কবি সাহিত্যিক? জমবেনা।

ঠাট্টাটা সুনয়না অবশ্য ওই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদেরই করে, তবু কেন কে জানে পুরন্দরের গায়ে যেন ফোসকা পড়ে। যখনি সুনয়না ওইসব বলে হেসে গড়ায়, তখনি একটা ধমক খাবেই।

বাইরের ঘরে বসে-থাকা ছেলেরা বোধহয় একটু অসহিষ্ণু হয়েই আবার দরজার বাইরে বেরিয়ে আবার ডোর বেলটাকে একবার ঝনঝনালো।

সুনয়না ব্যস্ত হয়ে বললো, এই দ্যাখো। একটু হাত চালাও গো। বেচারাদের ট্যাক্সীর মিটার উঠছে।

উঠুক।

বলে পুরন্দর শৌখিন চটিটা পায়ে গলিয়ে নিলো।

সুনয়না এখন বললো, জামাটা অপছন্দ করছিলে! তোমায় যা না একখানা দেখাচ্ছে, কতো তরুণী ঘায়েল হবে, কে জানে।

আসলে, পুরন্দর সত্যিই সুকান্তি সুপুরুষ, তাতে সন্দেহ নেই। এবং পুরন্দর সে সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিতও।

এখন একটু হাসলো। সুনয়নার গালে একটু টোকা মেরে বললো, বাড়ির একটাকেই তো আজ পর্যন্ত তা করে উঠতে পারলাম না।

ওরে বাবা! পারলেনা? সে তো মরে লাশ হয়ে পড়ে আছে।

হুঁ, খুব কথা বানাতে জানো।

ওর জোরেই করে খাচ্ছি।... আবার একটু হেসে ওঠে সুনয়না। যাও, এখন 'জয়যাত্রায় যাও গো। ওঠো ওঠো জয়রথে তব।' এই এখন তো নিয়ে যাচ্ছে, কখন ফেরৎ দেবে, কে জানে।

পুরন্দর আর ছেলে দুটো বেরিয়ে যেতেই দরজাটা বন্ধ করে সুনয়না ঘরে ফিরে এসে তাকিয়ে দেখলো।... সারা ঘরে এলোমেলো চেহারা। ঘরের মেজেয় একখানা ভিজে তোয়ালে এবং একখানা শুকনো তোয়ালে ছড়ানো চেহারায় পড়ে আছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে একরাশ শিশি কৌটো টিউবএর মুখ খোলা। চিরুণিটায় চুল আটকানো। আর সারা ঘরে সেই পাউডারের ছড়াছড়ি।

প্রসাধন সম্পর্কে বেশ সচেতন পুরন্দর। মেয়েদের মতো অনেক উপকরণ লাগে তার সাজগোজ করতে।

ঘরখানা ঠিক করতে এখন অনেকটা সময় লাগবে।

তবু চট করে কাজে হাত না লাগিয়ে খাটের ওপর বসে পড়ে, যাকে বলে অবলোকনের দৃষ্টিতে, দেখতে লাগলো অলসভাবে। সন্ধ্যার সময় কোনোদিনই বাড়ি বসে থাকে না পুরন্দর, যদি না বাড়িতে কোনোদিন আড্ডা বসে। সেটা মাঝেমধ্যে! তবু এখন ওর মনে হলো কতো কতোক্ষণ একা থাকতে হবে।

কাজের মেয়েটা রাত নটার আগে ফিরবেনা। এটাই নিয়ম ওদের।

'আমি ইচ্ছে করলেই এই অগাধ অবসরটা কাজে লাগাতে পারতাম। কিন্তু কেন কে জানে ইচ্ছেই করে না। কতোদিন কাগজ কলমে হাত দেওয়া হয়নি। দুর্! দিয়েই বা কী হবে, তার থেকে ঘরঝাড়াই ভালো।'

উঠে পড়তে যাবে, হঠাৎ আবার বেলটা বেজে উঠলো।... এগিয়ে গেলো। 'আই হোল'-এ একটু চোখ ফেলেই প্রায় চমকে উঠে, দরজাটা খুলে ধরে বলে উঠলো, তুই!

কাঁধের ঝোলাটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে সেটাকে কোলে নিয়েই সোফায় বসে পড়ে ছবি একটু হেসে বললো, খুব অবাক হয়ে গেছিস না? দরজা খুলেই যা না চমকে উঠলি। যেন ভূত দেখলি।

সুনয়না বললো, ঠিক বলেছিস। এতো অভাবিত! তবে ভূত না পেতনী! চেহারাখানা কী করেছিস?

ছবি বললো, সৃষ্টিকর্তাই তো যা কববাব করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বাবা! তার ওপর আর কতটুকু কী করেছি? রোদে-জলে যা হয়, তার বেশী নয়। কবে আর তোর মতো সুন্দরী ছিলাম?

বাজে কথা বলিসনা। এই রকম কাকতাড়ুয়া মার্কা ছিলি?

ছিলাম না তো কী? মনে নেই, ছেলেবেলায় যখন দুজনে 'হরিহরাত্মা' হয়ে ঘুরতাম পাড়ার লোকেরা বলতো 'পূর্ণিমা আর অমাবস্যে।'

পাড়ার লোকের কথা বাদ দে—

বলেই সুনয়না ব্যগ্র গলায় অথচ আস্তে বললো, ছবি! টুটুদা কেমন আছে রে?

ছবির কালো মুখে যে সাময়িক আলো ফুটে উঠেছিল, সেটুকু মিলিয়ে গেল। আস্তে বললো, কেমন আর থাকা! জেলের মধ্যে সেই সব মহামতি পুলিশ সাহেবরা তো শরীরের কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। প্রাণে বেঁচে আছে— এই পর্যন্ত।

আশ্চর্য!

একটা গভীর নিশ্বাস ঘরের বাতাসে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে।

একটু পরে বিষণ্ণ গলায় বলে সুনয়না— অথচ অকারণ! মিথ্যে সন্দেহে।

দাদার সামনে এ দুঃখ করবার জো নেই! রেগে বলে, একা তোর দাদারই? আরো কতো কতো জন এমন মিথ্যে সন্দেহে জেলে পচেছে, হিসেব রাখিস? পিটুনি খেয়ে মারাই গেছে কত নেহাত নিরীহ ছেলে।

সুনয়না বললো, জীবনে আর কোনোদিন চন্দননগরে যাওয়া হলো না।

এই হতাশা আর ক্লান্ত স্বরটাও যেন দীর্ঘশ্বাসের মতোই ঘরের বাতাসকে ভারী করে তোলে।

ছবির মধ্যে তো আবার সবটাই ক্লান্তি হতাশা আর বিষণ্নতা। তবু তার থেকে নিজেকে কিছুটা উদ্ধার করে নিয়ে বলে, কী করে আর যাওয়া চলতে পারে? আইনসঙ্গত কোনো আত্মীয় তো আর নেই তোর ওখানে! মাও অনেক সময় বলেন, 'মেয়েটাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে।' তা' যাক, এসে তোকে দেখে খুব ভালো লাগছে রে। ফ্ল্যাটটা কী সুন্দর। সাজিয়েওছিস সুন্দর করে। আর বলতে নেই নজর দিচ্ছি না, তুইও একটু 'শাঁসেজলে' হয়ে আরো অনেক সুন্দর হয়েছিস।

সুনয়না বললো, অতো রেখেঢেকে বলে আর কী হবে? বলনা বাবা সত্যিটা। 'দারুণ মুটিয়ে গেছি।'

ধ্যাৎ, তা মোটেই নয়। ঠিক যেরকমটি হলে বেশ সুখী-সুখী লাগে, তেমনটি।

'সুখী সুখী!' তা ভালো। 'শরীর' জিনিসটা অনেক সময় খুব বিশ্বাসঘাতক।

ছবি বললো, না, না! সত্যিরে, তোকে দেখে খুব ভালো লাগছে। বেশ, মহারানী মহারানী ভাব। হবে না-ই বা কেন? তোর বরের তো এখন খুব নামডাক!

সুনয়নার মুখে একটু বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো। বললো, হ্যাঁ। 'এই প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ কবি।' ওই 'চক্রবাল' পত্রিকার খাসমহলে একবার ঢুকে পড়তে পারলে, আর সেখানে একটা 'কল্কে' পেয়ে গেলে তার 'শ্রেষ্ঠ' হওয়া মারে কে? ওদের হাতে অনেক উঁচু-উঁচু মই।

ছবি বলে ওঠে, তোর স্বভাবটা দেখছি একই রয়ে গেছে। নিজের বরের ব্যাপারেও ঠাট্টা মার্কা মন্তব্য। সত্যিই তো বাবা, এখন কবি পুরন্দর রায়ের নাম সকলের মুখে মুখে।

সুনয়না বললো, আমি কী অস্বীকার করছি। শুধু নামটাই মুখে মুখে কেন? পুরন্দর রায়ের কাব্যগ্রন্থও তো সকলের হাতে হাতে! 'চক্রবাল অফিসের' প্রকাশনা থেকেই ঝড়াঝড় বেরোয় তো! দু'লাইনের কবিতাটিও হেলাফেলার থাকে না। যাক গে বাবা, কবিতা-টবিতা তেমন বুঝি না, চিরকালই নিরেট গদ্য! এখন বল শুনি, টুটুদা এখনো লেখে?

ছবির মুখটায় আবার একটা গভীর ছায়া পড়লো। অথবা একটু আগেই পড়েছে। যখন সুনয়না বললো, কবি পুরন্দর রায়ের প্রতিটি লেখা ছাপা হচ্ছে— দু'লাইনেরটাও বাদ যাচ্ছে না। বই বেরোচ্ছে 'ঝড়াঝড়।' তখনই বোধ হয়।

এই সংসারটা কী অদ্ভুত। একজনের কাছে যা— আকাশের চাঁদ, অন্য একজনের কাছে সেটা হাতের মুঠোয়।

ছবির একটা সুবিধে, ওর মুখের নিজস্ব রঙের ওপর ছায়াটায়া পড়লেও তেমন ধরা পড়েনা। গলার স্বরটায় ধরা পড়লো। খাদে নামা গলায় বললো, 'লেখা'ই তো ওর প্রাণ! সেই ছেলেবেলা থেকেই তো লিখে চলেছে। জেলে বসেও লিখেছে, কিন্তু এখন—

থেমে গেল ছবি।

সুনয়না উদ্বেগের গলায় বলল, কী'রে, এখন কী?

ছবি গলা ঝেড়ে বললো, 'চোখটা ক্রমশঃই'— আর একবার গলাটা ঝেড়ে নিয়ে প্রায় হাসির মতো করে বললো, দাদার ভাষায়, 'জবাব দিতে বসেছো।'

সুনয়নার গলা থেকে একটা অস্ফুট আর্তস্বর বেরিয়ে এলো, চোখ! চোখ কেন? চোখে কী হয়েছে?

কোনখানটায় যে কী হয়নি! মাথা থেকে পা পর্যন্তই কিছু না কিছু হয়েছে। তবু চোখটার জন্যেই দাদা—

সুনয়না ক্ষীণভাবে বলে অপারেশন করলে ভালো হয় না?

নাঃ। অপারেশনের ব্যাপার নয়। চোখের নার্ভগুলো আস্তে আস্তে শুকিয়ে ক্রমশ মরে যাচ্ছে। কিন্তু দাদা কী বলে জানিস? বলে, 'একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবার আগে যদি আমার একটা বইও ছাপা হওয়া দেখে যেতে পারতাম! তাহলেও মরার আগে ব্যাটা ভাগ্যকে সেলাম ঠুকে যেতাম।'

ছবি তার কোলের ওপর রাখা ব্যাগটায় আস্তে আস্তে শিশুর গায়ে মায়ের হাত বুলনোর মত স্নেহের হাত বুলোতে বুলোতে বলে, দাদার স্বভাব তো জানিস? চিরকালই নিজের বিষয় সবকিছুই ঠাট্টা-তামাসা করে হাল্কাভাবে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে কী যন্ত্রণা ভোগ করে, তা তো বুঝতে পারি।— জেলে বসে স্মৃতিকথার মতো ধরনে একটা উপন্যাস লিখেছিল, পড়লেই বুঝতে পারা যায়, সে গল্পের নায়ক সে নিজেই। সেই বইটা ছাপাবার কী প্রচণ্ড ইচ্ছে। মনে হয়, ওটা হলেই ও ওর জীবনের সব পাওয়া পেয়ে যাবে! দেখে এতো কষ্ট হয়। আরো বেশী কষ্ট হয় মুখে কিছু হা-হুতাশ করে না বলে। অথচ বুঝতে তো পারি ভেতরটা হতাশার যন্ত্রণায় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। ওই সব লেখাগুলোর মধ্যে দিয়েই তো নিজেকে প্রকাশ করবার, নিজের চিন্তাভাবনা যন্ত্রণাকে মুক্তি দেবার দুরন্ত চেষ্টা ওর। অথচ সেগুলো— জানিস, একদিন বলেছিলো 'পাঠকই হচ্ছে লেখকের যন্ত্রণার শরিক, উপলব্ধির ভাগীদার। পাঠকই যখন জুটবে না, তখন ওই জঞ্জালগুলো যত্ন করে ঘরে রেখে কী হবে? একদিন

বহ্নি-উৎসব করে কোনো মন্দ হয় না।'.... সেদিন দাদাকে আচ্ছা করে বকাবকি করে লেখাগুলো ওর নাগালের বাইরে তুলে ফেলেছিলাম। ফ্রাসট্রেশানে হঠাৎ কখন কী করে বসে বলা যায়না। আশ্চর্য! একটা সত্যিকার সৎ মানুষ যে অকারণ এতো কষ্ট পায় কেন? চলাফেরার কষ্ট ছিলো। তবু সেটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো। হঠাৎ চোখ দুটোও যে এমন শত্রুতা করবে, কে জানতো!

সুনয়না নিজের চোখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে আস্তে বললো, একেবারেই দেখতে পায় না? ছবি নিঃশ্বাস ফেলে বললো, এখনো ঝাপসা ঝাপসা একটু দেখতে পায়। খবরের কাগজের হেডিংগুলো দেখে। তবে ক্রমশঃই—

চশমায় কিছু হয় না?

যেন বুঝেসুঝেও এই বোকার মতো কথাটা বলে ফেললো সুনয়না।

ছবি মাথা নাড়লো, নাঃ— চেষ্টা তো হচ্ছে অনেক। ডাক্তাররা কোনো ভরসা দেয়নি।

একটু থেমে বলে, তবে সে 'চেষ্টা' তো আমাদের ক্ষমতার সীমার মধ্যেই। সে আর কতোই-বা? জেঠুর ওই বাড়িটা আছে তাই থাকার প্রবলেম নেই। জেঠুর সারাজীবনের সঞ্চয় যে টাকাগুলো ব্যাঙ্কে ফিক্সড আছে, তার সুদ থেকে মোটামুটি কিছুটা চলে, আর এই কাঠবেড়ালীটা আছে—যেটা টিউশ্যানীর নুড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়ে ''সমুদ্রবন্ধনের সাহায্যে লাগছি'' ভেবে আহ্লাদ পায়।

সুনয়না ওর একটা হাত চেপে ধরে বলে, কটা টিউশ্যানী করিস?

আরে দূর, ওর কী আর বাঁধা হিসেব থাকে? যখন য'টা পাই। বেশী জুটলে আমি আহ্লাদে ভাসি, আর মা রেগে রেগে হাত পা আছড়ায়। বলে, 'মরবি। মরবি। নিজেকে এইভাবে আখমাড়াই কলে ফেলে 'মাড়াই' করলে কতোদিন টানতে পারবি?'....যাকগে আমার কথা। দাদার জন্যেই! কখনো কখনো যদি দুঃখ করে বলি 'চোখের জন্যে তেমন আর কী করা হচ্ছে? ম্যাড্রাসে কোথায় যেন দারুণ কী চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।' তো দাদা হেসে হেসে বলে, 'ম্যাড্রাসে? দূর। তোর নজর অতো নীচু কেন রে? নজর উঁচু কর। 'সুইজারজ্যাণ্ডের' কথা ভাব।'.... কাগজে কাগজে একখানা আবেদন ঝেড়ে দে, 'আমার পরমারাধ্য দাদার চক্ষুদুটির আলোক নির্বাপিতপ্রায়। সে আলোক ফিরাইয়া আনার জন্য বিদেশযাত্রার প্রয়োজন। এবং তজ্জনিত বেশ কয়েক লক্ষ টাকার প্রয়োজন। অতএব সহৃদয় সরকার বাহাদুর অথবা হৃদয়বান দেশবাসী যদি এই ব্যয়ভার—' বলতে বলতে হা হা করে হেসে ওঠে। নিজেকে নিয়েই ওর যতো ঠাট্টা। তবে এখন দেখছি— সেটা যেন আর তেমন বজায় রাখতে পারছে না। ভেতরে ভেতরে ভেঙে যাচ্ছে। তাই ভাবি, বেচারার চোখের

আলোটা একেবারে মুছে যাবার আগে যদি ওব এই একটা বইও ছাপা হয়ে বেরোতে পারতো।

আবার সস্নেহে নিজের কোলে বাখা ব্যাগটার ওপর হাত বোলায় ছবি।

কিন্তু সুনযনার চোখে পড়ে না এসব।

সুনয়না অন্ধকার হয়ে-আসা আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যেখানে এখন দুটি চারটি কবে তারা ফুটতে শুরু করেছে। ছেলেবেলায় 'একতারা' দেখে ফেললেই আকাশে চোখ ঠিকরে তাকিয়ে থাকতো সে আর ছবি— কতোক্ষণে দু'তারা দেখা যায়। সে কবে? কোন পরিবেশে?

ছবি বলে উঠলো, এতোদিন পরে হঠাৎ এসে তোর মনটা খারাপ করে দিলাম। কিন্তু তুই ছাড়া আব কাউকেই মনে পড়লো না। ... আর মনে পড়েই মনে হলো সত্যিই তো। তুই তো বেস্ট। তোর হাতে তো এখন এ ক্ষমতা রযেছে। তাই তোর কাছেই নিয়ে চলে এলাম।

সুনয়না বোধহয় শুধু কথার শেষটুকুই শুনতে পেয়েছে, তাই চমকে বলে, 'কী' নিয়ে এলি?

...ওর বুকটা হঠাৎ থরথর করে ওঠে।

কী নিয়ে এলো? 'কাকে' নিয়ে এলো? নীচে রাস্তায় কেউ কি গাড়িতে অপেক্ষা করছে? কি হবে তাহলে?

ছবি বললো, দাদার কথায় খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেছলি, না? এমন চমকে উঠলি।....কী এনেছি, বলছি। তার আগে আমায একটু ঠাণ্ডা জল খাওয়া।

সুনয়না যেন একটু আছাড় খায়।

সে যেন ঘুমের জগৎ থেকে রোদের জগতে ফিরে আসে। মরমে মরে যায় সে। এতোক্ষণ এসেছে ছবি, ট্রেনের পথে এসেছে, অথচ সুনয়না শুধু ওর সঙ্গে কথাই চালিয়ে যাচ্ছে। কিম্বা ওকে কথা চালিয়ে যেতে দিচ্ছে। আতিথ্যের যে একটা অভ্যস্ত নিয়ম আছে, সেটা সুনয়না ভুলে গেলো কী করে?

ও বলে উঠলো, ছবি! তুই আমায় মার। ঠাশঠাশ চড়িয়ে দে। তুই এতোক্ষণ এসেছিস, আর আমি—

ছুটে বেরিয়ে যায় সে ঘর থেকে।

সুন্দর সুদৃশ্য ছোট একটা ট্রে'র ওপর দুটো ফিনফিনে সুন্দর কাঁচের গ্লাস বসিয়ে নিয়ে এলো সুনয়না। একটাতে পরিষ্কার টলটলে ঠাণ্ডা জল, অন্যটায় অরেঞ্জ স্কোয়াশ!

এনে ছবির সামনে বসিয়ে দিয়ে আবার খুব আক্ষেপের গলায় বলল, তুই

তেতেপুড়ে এসে এতক্ষণ বসে আছিস, আর আমি অজ্ঞান হয়ে, সেই কতদিন আগের চন্দননগরের রাস্তায় মাঠে স্কুলে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আরে, আমিও তো এসেই কথা জুড়ে দিয়েছি।

ছবি আগে জলের গ্লাসটাই তুলে নিয়ে প্রায় একচুমুকে শেষ করে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বলে, অথচ ভাবতে ভাবতে আসছিলাম, যেই দরজা খোলা পাব, নাটকীয়ভাবে চেঁচিয়ে একখানা আর্তনাদ ছাড়ব, নয়না রে, এক কুঁজো বরফঠাণ্ডা জল খাওয়া। তা, দরজার সামনে তোকেই দেখে ভুলে গেলাম।

তার মানে তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল?

তা বলতে পারিস। কিন্তু একটা ভারি মজা লাগছে রে, তোর কথার ধরনটা অনেকখানি মা'র মতো। ঠিক মার মতো বললি, 'তেতেপুড়ে এসেছিস।' ....এখন বলছিস, 'তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল।' একদম মার মুখের কথা। এভাবে আর কারো মুখে শুনি না। অন্তত তোর-আমাদের মতো বয়েসের কারো মুখে।

সুনয়না একটু হাসল। বলল—তোদের কবিও মাঝে-মাঝে বলে, 'তোমার বাচনভঙ্গিটি স্রেফ গিন্নিমার্কা।' .... আসলে, কী জানিস? প্রায় কথা শেখার বয়েস থেকেই তো সোনাকাকীর পায়ে-পায়ে ঘুরে মানুষ হয়েছি। ছেলেবেলায় নিজের বাড়িতে আর কতটুকু থেকেছি বল? .... সব ঝক্কি তো সোনাকাকীর ওপর। বাবা তো অকালে বৌ মরে যাওয়ায় হাফ-সন্নিসী বাউণ্ডুলে। নেহাত পোস্ট অফিসের চাকরিটা ছাড়েনি এই যা! মা-মরা মেয়েটাকে পাড়ার লোকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্দি। অথচ সোনাকাকীরও তখন একই অবস্থা। তোর বাবা সবে গেছেন। আর তুই একটা বাচ্চা রয়েছিস আমারই বয়েসের! মানুষ বড় স্বার্থপর জীব। বাবা তো ভেবে দেখেনি।

বাঃ! ওভাবে বলছিস কেন? বাড়িতে তিনি একা, অফিসটা বজায় রাখতে হবে, ওইটুকু একটা মেয়েকে রাখবে কোথায়?

তা সত্যি!

সুনয়না একটু হাসল, তবে মেয়েটা যেই একটু বড় হল, ''কামলায়েক'' হয়ে উঠল, তখন গার্জেনের কী হম্বিতম্বি! 'চব্বিশঘণ্টা পরের বাড়িতে! ঘরে মন টেঁকে না? বাড়িতে যে একটা হতভাগ্য বাপ পড়ে রয়েছে, তাকে দেখাশোনা একটু কর্তব্য, তা মনে থাকে না।'

ছবি বললো, ছাড় ওসব কথা! তোর এখনকার কথা বল।

এখনকার কথা? সে তো তুই নিজেই বললি।

সুনয়না একটু হেসে বলে, 'সুখী সুখী' .... 'মহারানী মহারানী' .... 'মুটকি হাতি!'

ভাগ! ওইকথা বলেছি আমি?....ছবি এবার শরবতটা একটু-আধটু করে খেতে-খেতে চারদিক তাকিয়ে বলে, বাড়িতে আর কেউ নেই?....কবিমশায়কে তো দেখলুম, বিজয়যাত্রায় বেরোলেন। বোধহয়, কোথাও সভাপতি হতে?

ওমা! তুই দেখেছিস? কখন?

ওই যখন বেরোলেন। দু'খানা ছেলে খুব ফুলটুল সঙ্গে নিয়ে ভক্তিভরে গাড়িতে তোলাল। .... আসলে লোকমুখে আন্দাজে আন্দাজে এসেছি তো? .... ফ্ল্যাটের নম্বরটা জানি না। .... একটা ছোট ছেলে ঘুরছিল, তাকে জিজ্ঞেস করলুম, কবি পুরুন্দর রায় এখানে থাকেন? শুনে ছেলেটা বলে উঠল, 'থাকেন না তো কোথায় থাকেন? ওই তো ট্যাক্সিতে চাপছেন।' ....তখনই ভরসা করে ঢুকে পড়ে লেটাববক্সগুলো দেখতে দেখতে—

সুনয়না বলল, রীতিমতো একখানা অ্যাডভেঞ্চার।

না, এখন আর ভয় করছে না 'নিচে রাস্তায় কেউ গাড়িতে অপেক্ষা করছে না তো?' ভেবে। .... বলল, আয়, তোকে একটু খাওয়াই।

আরে, এই তো খেলাম।

চমৎকার ! ওই খাইয়ে বিদেয় করে দেব তোকে? .... তারপরই আস্তে বলে, তা যা ব্যাভারটা করলাম। জল চেয়ে খেতে হল .... কই, তখন যে বললি কী একটা নিয়ে এসেছিল আমার জন্যে।

যাবার সময় দিয়ে যাব।

সোনাকাকীর হাতেব তৈরী কিছু বুঝি?

সোনাকাকীর নয়। .... তো হ্যাঁরে, বাড়িতে কবির আর কেউ নেই? মা বোন?

নাঃ। তাঁরা পুরনো বাড়িতে আছেন। এখানে—ঝুটঝামেলা বাদ দিয়ে শুধু কবি আর কবিপত্নী! ....

ছবি এই সুরটার ঠিক ভাব ধরতে পারল না। আলগা গলায় বলল, তো, কর্তা তো সর্বদা বাইরে-বাইরে, তোকে একদম একা থাকতে হয়? কাজের মেয়েটেয়ে নেই কোনো?

তা আছেন একজন মডার্ন গার্ল। তবে রবিবার বিকেলটা, মানে একটা বেলা ছুটি দিতে হয়। এখানে ফ্ল্যাটগুলোর সকলেরই এই নিয়ম। ওদেরও তো একটা ইউনিয়ন আছে। ....এ আর আমাদের সেই ছেলেবেলার, ''কেষ্টর মা''। ''বংশীখুড়ো''-র কাল নয়। ....হ্যাঁরে, তোদের কেষ্টর মা এখনো আছে এখানে?

ছবি বলল, তা আছে। কাজটাজ তেমন করে উঠতে পারে না। তবু ছাড়তেও চায় না, বলে, 'মাইনে দিওনি, এমনি পড়ে থাকি এখেনটায়। বের্ধ বয়েসে

কোথায় আর যাব?' অথচ গ্রামে নাকি আছে আপনজনটন।

সুনয়না হাসল! বলল, ওদের সঙ্গে সঙ্গেই 'পুরাতন ভৃত্যের' অধ্যায় শেষ হয়ে যাবে। এখন আর কেউ ছ'মাসও একজায়গায় টিকে থাকতে চায় না। নতুন বৈচিত্র্যের সন্ধানে ছোটে। যা দেখছি সর্বদা।

আজ আর ফিরবে না?

রাতে ফিরবে। ইউনিয়ন তো আর খেতেশুতে দেবে না। যাগগে, আয়। 'কাজের লোক' নেই বলে তোকে একটু খেতে দিতে পারব না, আমায় এত অকাজের ভাবিস না।

কী আবার খেতে দিবি এখন?

আয় না, বাবা।

বলে সুনয়না ওকে বসবার ঘর থেকে ভিতরে নিয়ে আসে।

ছবি বলে উঠে, এ কি, তোর ঘরের এমন বিধ্বস্ত চেহারা কেন?

ওই যে, কর্তা বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছেন।

ছবি হেসে ফেলল। বলল, মনে হচ্ছে, তোর সময় কাটার বিশেষ সমস্যা নেই।.... তারপরই গলা নামিয়ে বলল, কতকাল হয়ে গেল, কেউ তো কারুর খবরই জানি না। তো, সংসারে কোনো তৃতীয় প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

সুনয়না ব্যস্ত হাতে ফ্রিজ খুলে এটা সেটা বার করে খাবার টেবিলে নামাচ্ছিল। ঘাড়টা ফিরিয়ে একটু হাসল।

ছবি টেবিলের ধারের চেয়ারে বসে পড়ে বলল, অনেকদিন তো হাওয়ায় পানসি ভাসিয়ে চলা হল। কী ব্যাপার? চাস না?

সুনয়না টেবিলে প্লেট রেখে খাবার সাজাতে সাজাতে বলল, আমার চাওয়া না-চাওয়ায় কী এসে যাচ্ছে? কর্তার ইচ্ছায় কর্ম-র যুগ তো আর শেষ হয়ে যায়নি।

বাঃ। কর্তার এমন বেয়াড়া ইচ্ছে কেন?

ওর মতে কবিদের সাততাড়াতাড়ি ওসব মানায় না! পরে দেখা যাবে।

বলিস কী? এতদিন পরেও 'সাততাড়াতাড়ি?'

যে যার মতবাদ আঁকড়ে থাকতে চায়। ওতে নাকি ভক্তরা মনঃকষ্ট পায়। কম বয়েসে ও নাকি যে ভীষণ স্মার্ট তাজা তরুণ কবিটির পরম ভক্ত ছিল, যার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হত 'সদ্যযৌবন', হঠাৎ একদিন যখন জানতে পারলো, সেই কবির ছেলে হায়ার সেকেণ্ডারি দিচ্ছে, ও নাকি আকাশ থেকে আছাড়

খেয়েছিল। আর এমন 'শকড্' হয়েছিল যে, দশদিন আর তাঁর কাছে যেতে পারেনি।

ছবি হেসে উঠে বলল, কোন্ কবি?

থাক। নামটা আর নাই-বা বললাম। নে খা! সাজিয়ে-গুছিয়ে দিল।

ছবি খেতে-খেতে বলল, এত চটপট এত সব করে ফেললি?

সবই ফাঁকিবাজি। রান্না করাই ছিল, শুধু একটু গরম করে নিলাম। আর লুচিটা? ময়দাও মাখা ছিল। শুধু একটু বেলে নিয়ে কড়ায় ছাড়া।

ছবি আস্তে বলল, তোর সঙ্গে কতদিন পরে দেখা হল?

এই তো, সাড়ে ন'বছর। বিয়ের আগে বাবা কলকাতায় চিরকালের অচেনা এক দূরসম্পর্কের মামাবাড়িতে এনে তুলল। ব্যস, খতম! দেখামাত্রই পাকাকথা! অতঃপর গাঁটছড়া। বাবা কতদিন রয়ে গেলেন কলকাতায়, শরীর খারাপ হয়ে পড়ায়। তারপর তো চলেই গেলেন।

তোর বিয়েটা দেখতে পেলাম না বলে আমার কী দুঃখু! দাদা আমায় ক্ষ্যাপাল, 'বন্ধুর বিয়ে হয়ে গেল, আমার হল না'— এইজন্য আমার অত মনখারাপ। তবে দাদা নিজেও কম মনখারাপ করে বেড়ায়নি। স্বীকার পায় না তাই।... তারপর তো গঙ্গার জল কত গড়াল। অথচ দ্যাখ, মনে হচ্ছে না এতদিন পরে দ্যাখা!

তা তুই বুঝি বিয়েটিয়ে করবি না?

ছবি হেসে উঠে বলল, এই আলকাতরার বোতলকে কে বিয়ে করতে আসছে?

তারপরই হঠাৎ গলার স্বরটা বদলে গেল ছবির। আস্তে বলল, দাদাকে ফেলে, মাকে ফেলে, কোথায় যাব বল?

আকস্মিক যে একটু সরস আর হালকা হাওয়া কথাবার্তায় স্বাচ্ছন্দ্য এনেছিল, সেটা থমকে গেল।

আর তারপরই বিষণ্ণ গলায় বলল, তোর কাছে এসেছি, এ-গল্প দাদার কাছে তো নয়ই, মার কাছেও করা যাবে না। মার তো, জানিস, পেটে কথা থাকে না।

সুনয়না একটু অবাক হয়ে বলল, কেন? গল্প করা যাবে না কেন?

ছবি মাথা নিচু করে বলল, দাদাকে না জানিয়ে চুপিচুপি দাদার সব থেকে দামি জিনিসটা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে এসেছি তোর কাছে পৌঁছে দেব বলে।...

...দাদার সেই উপন্যাসটা।

কোল থেকে নামিয়ে রেখে দেওয়া সেই ঝোলাটা থেকে সন্তর্পণে ব্রাউন পেপারে মোড়া একটা মোটা প্যাকেট বার করে ছবি আস্তে বলে, তোর বর

তো এখন আজকের 'সাহিত্য সংসারের' একখানা কেষ্টবিষ্টু লোক! ওই 'চক্রবাল' অফিসে কত খাতির। ওদের তো পাবলিকেশন রয়েছে? কবি যদি একটু বলে দেন তাহলেই ছাপা হয়ে যেতে পারে। বরকে বলিস পড়ে দেখতে। আমার মতে তো দারুণ। তো কবি পুরন্দর রায়ের 'সুপারিশ' 'চক্রবাল' অফিস নিশ্চয়ই ফেলতে পারবে না। আর কবি পারবেন না প্রেয়সীর হুকুমটি ঠেলতে। হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। আমার মন বলছে। দাদার সমস্ত প্রাণমন-নিংড়ানো বাসনাটা পূরণ হবে। ধর সাবধানে রাখ। আমি এবার যাই। আর দেরি করলে শেষ ট্রেনটাও মিস করব। ...মাকে বানিয়ে বলে এসেছি, একজন প্রাক্তন ছাত্রীর বিয়ে। অনেক করে আসতে বলেছিল।

সুনয়না হঠাৎ ছবির হাতটা চেপে ধরে রুদ্ধ গলায় বলে, টুটুদার প্রাণের ভালোবাসার জিনিসটা না বলে নিয়ে এসে রেখে চলে যাচ্ছিস?

ছবি ওর কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে স্থির চোখে একটু তাকিয়ে বলল, দাদার প্রাণের ভালোবাসার জনের কাছেই তো রেখে যাচ্ছি। চলি।

কেঁপে উঠল সুনয়না। বুকটা হিমহিম লাগছে। তার সঙ্গে মনে মনে অদ্ভুত একটা ভয় আর আত্মধিক্কার!... ছবির ধারণা, সুনয়না একবার হুকুম করলেই— বাইরেটা দেখে মানুষ কত ভুল ধারণা গড়ে তোলে।

সুনয়নাদের ফ্ল্যাটবাড়ির ঘেরা কম্পাউণ্ডের আউট গেট দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ছবি কব্জি উল্টে একবার ঘড়িটা দেখে নিল।

স্ট্যাণ্ডে গিয়ে বাসটা যদি এখনই পেয়ে যায় এবং রাস্তায় যদি কোথাও তেমন মারাত্মক কোনো জ্যামের গাড্ডায় পড়তে না হয়, তাহলে লাস্ট ট্রেনটা পেয়ে যেতে অসুবিধে হবে না। তবে দুটো 'যদি' রইল ওই নিশ্চিন্ততাটুকুর সঙ্গে।

কলকাতায় আসাটা ছবির নেহাতই মাঝেমধ্যে, তাও হয়তো 'মরণপণ' করা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটবার মতো তেমন কোনো কাজে নয়। কাজেই, কলকাতার রাস্তার বহুবিধ বিঘ্নর খবর প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বিশেষ রাখে না। তবে লোকমুখে শুনে-শুনে অভিজ্ঞতার আন্দাজ। ভাগ্যটা আজ অনুকূলই বলতে হবে— ছবির দুটো 'যদিই' সহায়তা করল। ট্রেনে চেপে বসে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ছবি। অনেক দিন ধরে যে সংকল্পটি মনের মধ্যে লালন করে চলছিল, আজ সে সংকল্পটি সাধন করতে পারল।

দাদার জন্যে ব্যাকুলতায় দাদার এই বইটার ছাপানো নিয়ে সম্ভাব্য অসম্ভাব্য অনেক কিছুই ভেবে চলছিল ছবি, 'এমনকি নিজের যে সামান্য সম্বল সোনার

সরু হারটা আর রুলিদুটো বাক্সে পড়ে আছে, ছিনতাইয়ের ভয়ে পরে রাস্তায় বেরনো হয় না। সে দুটো মাকে না জানিয়ে বিক্রি করে ফেলে খরচ জোগাড়ের কথাও ভেবেছিল। কিন্তু হিসেব করে দেখল, তাতে ওই মোটাসোটা কাগজের গোছাগুলোর অর্ধেকও ছাপা হবে কিনা সন্দেহ। খোঁজ নিয়ে নিয়ে দেখেছে, বই ছাপানো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। প্রতিপদে আগুনের ছোঁওয়া। আর সোনার বাজারদর যতই ঊর্ধ্বমুখী হোক, বেচবার সময় ছাঁটকাটে অনেক বাদ যাবে। শেষপর্যন্ত এইটাই মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল। নয়নার বর কবি পুরন্দর রায় তো এখন রীতিমত 'টপ'-এ, এবং সাহিত্যজগৎ আর প্রকাশনা জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ওকে একটু ধরতে পারলেই হয়ে যেতে পারে। গত বইমেলার সময় একদিন ছবিদের স্কুলের এক কলিগের সঙ্গে ঘণ্টা কয়েকের জন্যে মেলা ঘুরে গিয়েছিল ছবি। দেখেছিল 'চক্রবাল' পত্রিকার বাহারি স্টলের মধ্যে কবি ভক্তদের অটোগ্রাফ দিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। সে অটোগ্রাফ অবশ্য নিজেরই এক সদ্যপ্রকাশিত কবিতা সংকলনের উপর। যে সংকলনটির প্রকাশক 'চক্রবাল প্রকাশনী'। ঝপাঝপ বই কেটে যাবার এই পদ্ধতিটি নতুন নয়, তবে 'উপকারী পদ্ধতি' পুরনো হলেও বাতিল করা হয় না।

ছবি দেখছিল স্টলের সামনে দারুণ জটলা। ওর মধ্যে মাথা গলিয়ে কবিটিকে একবার চাক্ষুষ দেখে নেবার বাসনা মনেই মিলিয়ে গেল। ছবির কলিগ দু'জন লোপামুদ্রা আর সায়ন্তনী একটু উসখুস করছিল। কিন্তু ট্রেনের টাইম স্মরণ করে ইচ্ছেকে নিবৃত্ত করতে হয়েছে।

ছবি ভেবেছিল, ওকে ধরা মানেই গিয়ে নয়নাকে ধরা। কান টানলেই মাথা আসে। চেষ্টায় থেকে পুরন্দর রায়ের ঠিকানা এবং জায়গাটার ডিরেকশন জোগাড় করে ফেলেছিল। অতঃপর অবশেষে মায়ের কাছে দাদার কাছে বানানো গল্প শুনিয়ে, আজকের এই অভিযান।

মায়ের কাছে এমন অনেক সময়ই গল্প বানাতে হয়। কারণ মায়ের দুটো দারুণ দোষ— ভয়ানক অবুঝ, আর মোটেই পেটে কথা রাখতে পারে না মা। অতএব শান্তি বজায় রাখতেই ওই সব অনৃতভাষণ। কিন্তু দাদার কাছে? মনে মনে একবার যেন কেঁপে উঠল ছবি।

বোধহয় জীবনে এই প্রথম। ছেলেবেলায় দৈবক্রমে দাদার কাছে খুব বকুনি খাবার মতো কাজ করে ফেললেও, কখনো সত্য গোপন করেনি। কখনো বলেনি, 'আমি তো করিনি।' একবার সেই যখন একটা কাককে ধরে, পাড়ার আরো দুটো তিনটে মেয়ে তার নাকে (অথবা ঠোঁটে) ছ্যাঁদা করে একটা নথ পরিয়ে মজা করছিল, ছবি তাদের সঙ্গে থাকার অপরাধে দাদার কাছে খুব বকুনি খেয়েছিল,

অসহায় প্রাণীটার ওপর এইরকম নৃশংসতার জন্যে। দারুণ ধিক্কার দিয়েছিল দাদা! তবু ছবি বলতে পারেনি, 'আমি করিনি।'... পরিকল্পনাটি আর যার হোক, ছবি তো দলে ছিল।

কিন্তু আজ দাদার ভাঁড়ার থেকেই একটা মস্ত চুরি করেছে। চোরাই মাল পাচার করে এল ছবি, দাদার কাছে মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলে।

হঠাৎ ব্যাগটায় হাত পড়তেই বুকটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগল। দিয়ে তো এলাম! শেষ পর্যন্ত হবে তো? মানে, শুধু হওয়াটাই তো নয়, তাড়াতাড়ি হওয়াটাও যে জরুরি।...

যাবার আগে নয়নার ওপর শতকরা শত বিশ্বাস থাকলেও, ক্ষীণভাবে একটু অনিশ্চয়তার ছায়া মনকে আচ্ছন্ন করেছে মাঝে মাঝে, আগের মতোই আছে তো নয়না? বিখ্যাত জনের গিন্নি হয়ে বদলে যায়নি তো? নাঃ। নয়নার সম্পর্কে এমন সন্দেহ অন্যায়, অসঙ্গত, গর্হিত। তবু মনে হয়েছে, প্রায় দশ-দশটা বছর তো কম সময় নয়! সেই দোলাচল মন নিয়েই কবি পুরন্দর রায়ের আস্তানার কাছে এসেও একটু ইতস্তত করেছে ছবি। একটু সময়ক্ষেপণ করেছে।... কিন্তু যে মুহূর্তে দরজা খুলেই নয়না বলে উঠেছিল 'তুই!' সেই মুহূর্তেই প্রায় দশ-দশটা বছরের ধুলোর আস্তরণ সরে গিয়েছিল। সরে গিয়েছিল এই দীর্ঘদিন দেখা না-হওয়ার শূন্যতার ব্যবধান।

কবি পুরন্দর রায়ের সুন্দর সুদৃশ্য ফ্ল্যাটের দরজার সামনেটা হয়ে গিয়েছিল 'চন্দননগর' নামক জায়গাটার একটা পুরনো পাড়ার এবড়োখেবড়ো রাস্তা। বছর তিনেক বয়েসে মাতৃহীন নয়না বলতে গেলে ছবির মায়ের কাছেই মানুষ হয়েছে। নয়নার বাবা সক্কালবেলা মেয়েটাকে পৌঁছে দিয়ে যেত ছবির মায়ের কাছে, আর রাত্রে নিজে শোবার আগে, এসে ঘুমন্ত মেয়েটাকে কাঁধে ফেলে নিয়ে চলে যেত। যাবার সময় প্রায় প্রতিদিনই বলত একবার করে, 'ওটাকে তো আপনার কাছেই সঁপে দিয়েছি বৌঠান, তবে রাতে কাছে না থাকলে, প্রাণটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে।'

কিন্তু সেই মেয়েই যখন বছর দশ-এগারো হয়ে উঠল, লোকটার কী মেজাজ। 'মেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা পরের বাড়ি পড়ে থাকবে? এ আবার কী?' পুরনো ঝি দক্ষকে ডেকে এনে আবার নতুন করে কাজে লাগিয়ে, মেয়েকে বাড়ি নিয়ে গেছে মজুমদার কাকা।

পরে অবশ্য লোকটার এই বীতরাগের কারণ অনুমান করে ফেলেছিল ছবি! মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি 'পাকা' হয়ে ওঠে। এবং সংসারের কুটিল দিকগুলো কেমন বুঝেও ফেলতে পারে।

ছবির চির ব্যাচেলার আলাভোলা জেঠু যে, একমাত্র ছোট ভাইটা মারা যাবার পর তার বিধবা স্ত্রীকে দুটো বাচ্চা-সমেত তার বাপের বাড়িতে চালান করে না দিয়ে নিজের 'স্ত্রীবর্জিত' বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন— এটি নাকি পাড়ার লোকের কাছে বেশ গর্হিত ঠেকেছিল। ...তারপর আবার যখন তাবা দেখল, ওই 'জেঠু'টা দু দুটো ধিঙ্গি মেয়েকে আস্কারা দিয়ে তাদের সঙ্গে দিব্যি খেলায় মাতেন, এবং সেই 'খেলার' মালমসলার জোগানদার হতে ভাইপো ছোঁড়াটাকেও দলে নেন, আর যখন তখন হা-হা হা-হা হাসির শব্দে আকাশ ফাটান, তখন লোকের আরো চক্ষুঃশূল হবে না?

খেলাটা কী? না আম-কাঁঠাল গাছের শক্ত ডালে দোলনা টাঙানো, খিড়কির জমিতে বাগান করা, রথের দিনে রথ বানিয়ে ফুলপাতায় সাজিয়ে রাস্তায় নামিয়ে টানা ইত্যাদি ইত্যাদি। মতিচ্ছন্ন আব কাকে বলে? রিটায়ার করেছো, 'কোথায় একটু ধর্মেকর্মে মন দেবে, সন্ধ্যেবেলাটায় একটু হরিসভার আসরে গিয়ে বসবে, সকালে গঙ্গাস্নানটান করবে, ব্রাহ্মণসন্তানে যা করে থাকে, তা নয়। এই বোকামি! ছিঃ।...

কেউ কেউ আবার চোখমুখের ইশারায় বোঝালেন, এ হচ্ছে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। সারাক্ষণ বসে থাকবার সপক্ষে একটা কারণ খাড়া করা। তা বৌ-মরা বাউণ্ডুলে, চাকরির সময়টুকু বাদে তাসের আড্ডায় পড়ে-থাকা সুবল মজুমদারের কানেও ক্রমে এসব আলোচনা উঠল।... আব আচমকা টনক নড়ে বসল তার। খেয়াল হয়ে বসল সর্বদা এই পরিবেশে থাকলে মেয়ের 'চরিত্র' ভালো থাকবে কিনা সন্দেহ। অতএব!

ছবি যেন সেই কালটায় চলে যায়।

ছবি দেখতে পায়, সুবল মজুমদারের চোখ এড়িয়ে এড়িয়ে সুনয়নার এ বাড়িতে হটহাট চলে আসা। এসে হি হি করে হেসে হেসে ছবির মাকে জড়িয়ে ধরে বলত, 'খুব পালিয়ে এসেছি। ভাগ্যিস, তাসের আড্ডার বন্ধুরা ডাকতে এলো।'

কোনো কোনোদিন বলত, আজ না বাবার জন্যে দারুণ ভালো ভালো রান্না করে রেখে এসেছি। খেয়ে ড্যাম গ্ল্যাড হয়ে গিয়ে বকতে ভুলে যাবে। দক্ষ বুড়িকে বলে এসেছি, 'এই যাব আর আসব।'

তবে মার কাছে আর কতক্ষণ?

যদিও বরাবর ছবি মাকে আর দাদাকে শাসাত, নয়না ফর্সা বলে তোমরা আমার থেকে নয়নাকেই বেশি ভালোবাসো। কিন্তু ক্রমশঃ দাদাকে আর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে যেত না। শুধু দাদার আসরে গিয়ে বসতে যাওয়াই ছিল তখন প্রধান।

দাদা তখন তলে তলে গল্প লিখছে।... লিট্‌ল ম্যাগাজিনে ছাপাও হত কিছু-কিছু। সেই দেখে জেঠু মোহিত। বলতেন, 'এই ছেলেটা আমাদের বংশে একটা কীর্তি-রাখার মতো কাজ করছে। এ বংশে কবে আর কার লেখা ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে?'

ছবির একটা নিঃশ্বাস পড়ল। অথচ এখন সেই ছেলেটার জীবনটা কী তছনছই হয়ে গেল। নয়নার বাবা যেন নয়নাকে তাদের কাছ থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিল। জীবনে আর সেই নয়নার সঙ্গে দেখা হল না। জেঠু মারা গেল। 'নকশাল' সন্দেহে পুলিশ পাড়ার আরো ক'টা ছেলের সঙ্গে দাদাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরল। সেখানের অমানুষ পীড়নে জন্মের শোধ দেহটা অপটু হয়ে গেল। এখন চোখদুটোও জবাব দিতে বসেছে।

অথচ কী সুন্দর ছিল তার আগের সেই দিনগুলো।

দাদার লেখার প্রথম শ্রোতাই ছিল এই দুটি বাল্যসখী। লোক যাদের 'পূর্ণিমা আর অমাবস্যা' বলে অভিহিত করত।

দাদা, ছাপার অক্ষরে যার নাম উতঙ্ক উপাধ্যায়, ওই দুটো মেয়ের চোখেই ছিল 'হিরো'। চিরকালই তো দাদা ছবির চোখে হিরো। এখনো ছবি জানে, দাদার মতো সত্যিকার সৎ আর উচ্চস্তরের মানুষ এ-যুগে বেশি নেই।

আর নয়না?

তাকেও তো বুঝতে ভুল হয়নি ছবির।

সে তো দেখেছে, দাদা যখন তার কাঁচা হাতের লেখাগুলো শুনিয়েছে, নয়না নামের মেয়েটা যেন সম্মোহিতার মতো তাকিয়ে থেকেছে। যেন শুধু কান দিয়ে কী মন দিয়েই নয়, প্রতিটি রোমকূপ দিয়েই ও ওই মৃদুগম্ভীর স্বরমাধুর্য গ্রহণ করে চলেছে।

তবু নয়নাই এক-একদিন প্রতিবাদে মুখর হত। আচ্ছা টুটুদা, কেবলই দুঃখের কথা, যন্ত্রণার কথা, হতাশার কথা লেখো কেন বল তো? সুখী মানুষদের কথা লিখতে ইচ্ছে করে না?

দাদা একটু গভীর হাসি হেসে বলত, সুখী মানুষদের কথা? সেটা কি মানুষের মনে রেখাপাত করতে পারে? জলের দাগের মতো দু'দিনেই মিলিয়ে যায়। আর দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত যন্ত্রণার শিকাররা পাঠকের মনে আগুনের অক্ষরে লেখা হয়ে খোদাই হয়ে যায়। তাকে কেউ ভুলতে পারে না। দেখিস না, পৃথিবীতে যত কাব্য, মহাকাব্য অমর হয়ে আছে, সেগুলো 'বিরহপ্রধান' বলে। বৈষ্ণব কবিতা অমর কেন? সীতা পাতাল প্রবেশ না করে রামচন্দ্রের মহারানী হয়ে সুখে রাজ্যপাট করতে করতে বুড়ো হল, কে তাকে মনে রাখত?... তারপর

একটু স্নেহের হাসি হেসে বলতো, তুই তো সুখীদের কথা লিখিস তাহলেও হবে।

নয়না বলত, ধ্যাৎ, আমার আবার লেখা।

আরে কেন? দেখেছি তো দু'একটা, ছবি দেখিয়েছে। ভালোই তো হয়েছে। লিখে যা।

নয়না বলত 'আঃ টুটুদা ভালো হবে না বলছি। ছবিকে দেখাচ্ছি মজা।'

ট্রেনটা থামল। ....ছবির মনে হল, ওই যাঃ, নয়নাকে তো জিগ্যেস করা হল না, নয়না তুই এখন আর লিখিস না?

ঝন্‌ঝন্‌....ঝন্‌!

ঘরের জানলা দরজা দেয়াল থেকে সিলিং পযর্ন্ত ঝন্‌ঝনিয়ে কেঁপে উঠল। ....কী হল? কী এ? কেঁপে উঠল? না কেঁপে চলেছে?

একটি শিশিরভেজা শিউলিগন্ধ ভোরের বাতাসে নিজেকে হারিয়ে-ফেলা একটু সুষমাময় আচ্ছন্নতার ওপর যেন আছড়ে এসে পড়ল একটা ক্রুদ্ধ চিলের চিৎকারের ঝাপট! দীর্ণবিদীর্ণ করে দিল মগ্ন চৈতন্যের কুয়াশার চাদরখানা। ....সেই বিদীর্ণতার গহ্বর থেকে উঠে এসে, প্রথম মুহূর্তটায় ঠিক বুঝে উঠতে পারল না সুনয়না ঘটনাটা কী! কাচের জানলাগুলোর ওপর কি একখানা পাথরের চাঁই এসে পড়েছে? এ আওয়াজ সেই টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া কাচের ঝন্‌ঝনানি? নাকি কোথাও কোনোখানে বেজে চলেছে কোনো কৌতুকমত্ত মিনিবাসের অনর্গল বিশ্রী কদর্য হর্ন!

কিন্তু এখানে রাস্তায় কী মিনিবাস চলে? চলে না তো।

তাহলে? ক'দিন ধরে মরে-পড়ে-থাকা টেলিফোনটা কি হঠাৎ জিইয়ে উঠে সাড়া দিয়ে চলেছে? ....নাঃ, টেলিফোন এমন অসহিষ্ণু হবে কেন? তার তো মাপা স্বর! ....ওঃ, এ অসহিষ্ণুতা ডোর বেলটার এতগুলো ভাবনা অবশ্য দু'এক সেকেন্ডের মধ্যেই। আত্মস্থ হয়ে উঠে পড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সুনয়না। আচ্ছা, ...এগিয়ে যেতে যেতে কি সুনয়নার আঁচলভর্তি শিশিরভেজা শিউলিফুলেরা ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল?

বেলটা যে বাজাচ্ছে, সে সেটাকে টিপে ছেড়ে দিচ্ছে না, টিপেই ধরে আছে। অতএব কেঁপেই চলেছে জানলা দরজা দেয়াল সিলিং!

সুনয়না কোথায় ছিল এতক্ষণ? ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি? ক'টা বেজেছে? পুরন্দর ফিরে এসেছে? আর চট করে দরজা খোলা না পেয়ে এই অসুন্দর অসহিষ্ণুতাটি প্রকাশ করেছে? কিন্তু পুরন্দর কেন বেল বাজাবে? তার কাছে

তো দরজার চাবির ডুপ্লিকেট আছে। তবে কি আজ পানীয়ের মাত্রাটির একটু মাত্রাধিক্য ঘটে বসেছে? তাই চাবি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে?

এ চিন্তাও এক মুহূর্তের একটু ভগ্নাংশের মধ্যে। প্যাসেজটুকু পার হয়ে সুনয়না দরজায় এসে 'আই হোল' এ চোখটা রাখল। পুরন্দর নয়, জ্যোৎস্না! সুনয়নার অতিআহ্লাদী কাজের মেয়েটা। ও প্রথম যখন ওর নাম বলেছিল, কষ্টে হাসি চাপতে হয়েছিল সুনয়নাকে! ....ডাকতে ডাকতে সয়ে গেছে।

সুনয়না ভাবছিল দরজা খুলে দিয়েই একটা কড়া ধমক লাগাবে এমন বিচ্ছিরিভাবে বেল বাজাবার জন্যে। কিন্তু সুনয়নার বাক্‌স্ফূর্তির আগে তার ওপরই একটা প্রবল ঝঙ্কার আছড়ে পড়ল। ....ব্যাপারটা কী বৌদি? ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি? বাব্‌বা! এতো ঘুম! ঘণ্টি মেরে মেরে হাত ব্যথা হয়ে গেল! ক্রমশ তো ভয়ই ধরে যাচ্ছিল।

সুনয়নার আর ধমক দেওয়া হল না। ভুরু কুঁচকে বলল, 'ভয়টা কিসের?'

তা কত রকম ভয়!....যে দিনকাল! নিত্যিদিন শুনি ফেলাটে ডাকাতে ঢুকে গিন্নিকে মেরে-কেটে সর্ব্বস্ব নিয়ে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। ....আবার এও তো হয়, একা বাড়িতে গিন্নি নিজেই হয়তো কোনো মনমতিতে—,

এখন ধমক দিয়ে ওঠে সুনয়না!....'কী বকছিস আবোলতাবোল? আড্ডায় গিয়ে নেশাটেশা করে এসেছিস নাকি?'

জ্যোৎস্না ঠিক্‌রে ওঠে—'কী? মেয়েছেলে হয়ে নেশা করব আমি? এইকথা বললেন আপনি? জ্যোছোনা ওই তিনকা দেবিকা ছন্দাদের মতো?'

সুনয়নার হঠাৎ হাসি পেয়ে যায়। তবু চেপেই বলে, 'ওরা নেশা করে?'

'করেই তো। খুব করে। আবার কত হাসাহাসি। বলে, এই ইউনিয়নটা আমাদের কেলাব।'

সুনয়না বলে, 'ওরা তাহলে মেয়েছেলে নয়?'

'ওঃ, ঠাট্টা হচ্ছে।....জ্যোছোনা তেমন মেয়ে নয়।....ঘণ্টা কতক ছুটি পেয়ে একটু গালগপ্পো করলুম, তাস পিটলুম, চা পাঁপরভাজা খেলুম, মিটে গেল! তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নিঘ্‌ঘাত!....তা নইলে—'

মেয়েটা এমনিতে খুব অচল নয়। কাজকর্ম ভালোই করে। কিন্তু বড্ড বকবক করে। মুখের বিরাম নেই। তবে একটু বোকামার্কা। তাই ভালো।

ভিতরে ঢুকে এসেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে জ্যোৎস্না।

'দাদাবাবু এসে গেছে নাকি, বৌদি?'

'কই? কোথায় দেখলি?'

ওই যে টেবিলে এঁটো ডিশ-পেলেট পড়ে।

সুনয়নার এতক্ষণে হুঁশ হয়, ছবি চলে যাবার পর সে আর পরিবেশের দিকে তাকিয়ে দেখেনি! সত্যিই শ্রীহীনভাবে পড়ে রয়েছে জলের গ্লাস, খালি প্লেট, বাটি!

জ্যোৎস্নাদের ইউনিয়নের নিয়ম অনুযায়ী, এখন আর জ্যোৎস্না কিছু করবে না। শুধু নিজের খাবারটা খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বে। অতএব সুনযনার উচিত ছিল টেবিলটা ঠিক করে রাখা। ....তবু ভাগ্যিস, পুরন্দর এসে পড়েনি। সেও তো এসেই থমকে গিয়ে বলত, 'কে এসেছিল?'

তাহলেই তো তখনই অনেক কথা।

খুব রক্ষে। ওকে ছবি আসার কথা বলতে হবে ধীরেসুস্থে, মুড বুঝে!

সুনয়না বলল, 'দাদাবাবু এলে একা খেতো?' সন্ধ্যেবেলা আমার একটা ছেলেবেলার বন্ধু বেড়াতে এসেছিল। তাকে একটু খাইয়ে দিয়েছিলাম।

ছেলেবেলার বন্ধু!

জ্যোৎস্না থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, মেয়ে বন্ধু? নাকি—

রাগে গা জ্বলে গেল সুনয়নার। আস্পর্ধাটা দেখো।

বলল, 'তাতে তোর দরকার?'

'না। এমনি জিগ্যেস করতে মন হল।'

সুনয়না ভাবল, ওর কাছে কৈফিয়ত দেবার দরকারটা কী আমার? ভাবুকগে না যা খুশি!....কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চিন্তায় আসতে হল।....শুধু তো ভেবেই থেমে থাকবে না! পাড়াবেড়ানি স্বভাব, ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে আড্ডা দিতে গিয়ে হৃদয় উজাড় করে গল্প করতে যাবে তো। কৈফিয়তটি না দিলে কী ভেবে নিয়ে কী বলে বেড়াবে কে জানে। তাছাড়া, প্রতিটি ফ্ল্যাটেরই এই কবি পুরন্দর রায়ের 'অন্দরমহল' সম্পর্কে দারুণ কৌতূহল। সুযোগ পেলেই ওই বোকাটাকে তোয়াজ করে 'বোস না, একটু চা খা' বলে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সবকিছু জিগ্যেস করে নেবে।

কিন্তু সবকিছু আর কি? খুব রহস্যময় তো কিছুই না। পুরন্দর রায়ের প্রতিষ্ঠা পরিচিতি—এ তো বহির্জগতের সকলেরই জানা। অন্দরমহলে? সে তো মাত্র দুটো প্রাণী। প্রাণী-সংখ্যা বাড়াবার ঘোরতর বিরোধী কবি। সেই বিরুদ্ধতাকে কেবলমাত্র আপন ইচ্ছার আর আবেগের একটু কোমল অভিমান দিয়ে প্রতিরোধ করে এমন সাধ্য নেই সুনয়নার। হয়তো শুধু সাধ্যেই বাধে না, রুচিতেও বাধে।

লোকে জানে, কবিদম্পতি ভাগ্যের খেয়ালে নিঃসন্তান।....সুনয়নার তো মা নেই, বোন নেই। পিসি-মাসি-মামী-খুড়ি কেই-বা আছে যে এই নিয়ে একটু আক্ষেপও করবে।

ছবি কথাটা তুলেছিল একবার। উড়িয়ে দিয়েছিল সুনয়না। ছবিরও বেশি কৌতূহলের সময় ছিল না।

সুনয়না একবার তার জ্যোৎস্নারানী মণ্ডলের দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখল! নিজস্ব ঘনকৃষ্ণ বর্ণের ওপর চোখের নিচে প্রায় গালের ওপর এসে-পড়া মোটা দাগের কাজলের রেখা! কপালে সোনালি টিপ, আলগা করে ফাঁপানো চুলের গোড়ায় চওড়া লাল সিল্কের ফিতে। পরনে লাল টকটকে ব্লাউজ আর চকরাবকরা একখানা গাঢ়ছাপ সিন্থেটিক শাড়ি। আবার পায়ে আলতা। ক্লাবের সাজ।

দেখলে ভক্তি আসে না। তবু এদেরকেই মাথার মণি করে রাখতে হয়। এবং 'ছবির মতো' এই পাখির বাসাটির মধ্যে নিভৃত 'যুগলজীবনের' মাঝখানে একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকায় রেখে দিতে হয়।

'কথা' সম্পর্কে এদের অপরিসীম কৌতূহল। তা যে-কোনো প্রসঙ্গ বিষয়ক হোক। বুঝুক না-বুঝুক, হাঁ করে গিলবে সেসব কথা। শুধু এই জ্যোৎস্না বলেই নয়, এদের সবাই। শুধু কান দিয়েই নয়, যেন চোখ দিয়েও বোঝা-না-বোঝা কথার নিহিতার্থটি বুঝে ফেলবার চেষ্টা করে। দেখলে মাথা জ্বলে যায়। তবু বলে ওঠা যায় না, 'তুমি এখানে কী করছ? নিজের কাজে যাও না।'

কী করে বলা যাবে? তার 'নিজের কাজ' তো তোমাদের এই শৌখিন চৌহদ্দিটুকুর মধ্যেই। নির্দিষ্ট কত শো স্কোয়ার ফুটের মধ্যেই যেন তোমার জীবনযাত্রার সমস্ত লীলাখেলা। ....সেকেলে আমলের মতো তো রান্না-খাওয়া-শোওয়া-বসা-স্নানটানগুলো ছড়ানো-ছিটানো। দৃষ্টিবহির্ভূত জায়গায় নয়। ....সবই ওই কত যেন স্কোয়ার ফুটের মধ্যে। এই আঁটসাঁটো ছাঁচে-ঢালা আধুনিক শৌখিন জীবনকেই বেছে নিয়েছ তুমি।

অথচ একেবারে 'আধুনিক' হতে পারছো না। পুরনো ধারায় রাতদিনের জন্যে মুঠোয় ভরে রাখবার মতো একটা 'কাজের লোক' তোমার না-হলেই নয়। তাই এদের এক-একটিকে নিয়ে এসে একবারে সংসারের হৃদয়কন্দরের মধ্যে ঠাঁই দিতে বাধ্য হচ্ছ।

মা-বাপ, ভাই-বোন হাবিজাবিদের চোখ থেকে সরে এসে 'শুধু দুটিতে' নীড় বাঁধতে এসেছ। কিন্তু তোমাদের সেই প্রেম-গুঞ্জনের 'বকবকমের' সাক্ষী এই একটি থাকবেই। অপরিহার্য। তোমাদের মান-অভিমান, বিরোধ, বিচ্ছেদ, ঝড়ের গর্জন—সব এদের সামনে অভিনীত হয়ে চলবে।

আবার বিক্ষুব্ধ ঝড়ের মুহূর্তেই বাইরের অতিথির আবির্ভাব ঘটলে, কী নিপুণ অভিনয়ে প্রেম-কলহে মুখর তোমরা অতিসুখী দম্পতির পার্ট প্লে করে যাও, তাও এদের দেখতে বাকি থাকে না। কারণ, অতিথিজন এলে, তার আতিথ্যের

ভার তো এদেরই হাতে থাকে। বারে-বারে তাদের সামনে আঁচল দুলিয়ে এসে-এসে হাজির হতে হয় এদের—চা নিয়ে, কফি নিয়ে, খাবার নিয়ে। আবার তোমার ড্রইংরুমের উপযুক্ত হবার জন্যে তোমাদেরই সাপ্লাই করতে হয় সভ্য শৌখিন সাজসজ্জা।....

এরা জেনে ফেলেছে, এরা ছাড়া তোমাদের গতি নেই। এরাই তোমাদের জীবনযাত্রার ছন্দ! একটি 'কাজের মেয়ে'র ওপর তোমাদের সুখ, আরাম, নিশ্চিন্ততা। আর 'মুক্তজীবনের' স্বাদগ্রহণ? সেও তো এদেরই কল্যাণে! তোমাদের 'বালবাচ্চা, বাড়ি' সবকিছু এই একজনার হাতে সমর্পণ করে দু'জনে বেরিয়ে পড়তে পারছ আকাশে ডানা মেলতে।....

কারণ দৃশ্যত ত্রিভুবনে তোমাদের 'আর কেউ নেই'। 'ন মাতা ন পিতা, ন বন্ধু ন ভ্রাতা।' সুনয়নার নাহয় বালবাচ্চা নেই। তা ছাড়াতো বাকি সমস্যাগুলো আছেই।

তবে?

এদের মান আর মন রেখে না চললে?

তাই সুনয়নাকে আবার দ্বিতীয় চিন্তায় এসে বলে উঠতে হল—বললাম না, 'ছেলেবেলার বন্ধু!' একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়েছি। আমার মা ছিল না, ওর মা'র কাছে মানুষ হয়েছি। লোকে ওর মাকে বলত, 'তোমার তো দেখি দুটো মেয়ে।' খুব ভাব ছিল দু'জনে।

যাক্ বাবা! যথেষ্ট কৈফিয়ত দেওয়া হয়েছে।

ভাগ্যের অসীম দয়া যে, এই বাচালটার অনুপস্থিতিতে ছবির আবির্ভাব ঘটেছিল।....তাই-না সুনয়না অমন হৃদয় মেলে কথা বলতে পেরেছিল ছবির সঙ্গে। আর ছবি যাবার পর ছবির রেখে-যাওয়া সেই অমৃতকুম্ভের মধ্যে তলিয়ে যেতে পেরেছিল। হারিয়ে যেতে পেরেছিল একটি শিউলিগন্ধী ভোরের বাতাসের ভিতর।....

পোশাকি শাড়ি ছেড়ে জ্যোৎস্না কী ভেবে টেবিলটা সাফ করতে হাত লাগাল। নিয়মমাফিক এবেলা ওর কোনো কাজে হাত দেবার কথা য়। এটা ছুটির বেলা।

সুনয়না বলল, থাক না। আমি ঠিক করে নিচ্ছি। তুই ফ্রিজ থেকে তোর খাবারটা বার করে নিয়ে নিজের ঘরে চলে যা।....(এটাও 'নিয়মের' অন্তর্গত)। হ্যাঁ, 'ঘর' একটা আছে জ্যোৎস্নার। বাড়ির প্ল্যানে যেটি 'স্টোররুম' বলে চিহ্নিত সেইটিই ওর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। কাজেই 'স্টোর'-এর কিছুটা থাকে ওই ঘরেরই দেয়াল-আলমারির মধ্যে, বাকিটা কিচেনেই।

জ্যোৎস্না অমায়িকভাবে বলল, এখন থাক। দাদাবাবু ফিরুক, তারপর খাওয়া শোওয়া।

টেবিল মুছে অভ্যস্তভাবে দু'জনের খাবার মতো বাসনপত্র সাজিয়ে রাখল। ফ্রিজ থেকে এটা-ওটা বার করে খাবার টেবিলে রাখল। সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্য কথাও চালিয়ে যাচ্ছে, 'তো বৌদি! বন্ধুকে তো কখনো আসতে দেখি না। ....এখেনে থাকে না? রেলের রাস্তায়? ও। সেখানেই বাপের বাড়ি সেখানেই শ্বশুড়বাড়ি?....অ্যাঁ। বে-ই করেনি? ওমা।'

বলতে বলতেই বলে ওঠে, 'ওই দাদাবাবু ফিরল। গাড়ি থামার শব্দ হল।'

'তোর দাদাবাবু ছাড়া এখানে আর কেউ গাড়ি চড়ে না?'

'এত রাত করে না কেউ। এ নিঘ্‌ঘাত দাদাবাবু।....ওই তো সিঁড়িতে কারা সব কথা বলতে বলতে আসছে। ....যাই, দোর খুলে দিইগে।'

থাম। দাদাবাবুর তো সঙ্গে চাবি আছে।

'তা হোক না। এতক্ষণের পর বাড়ি ফিরল।'

'এই! খপ করে দরজা খুলতে যাচ্ছিস যে? সিঁড়িতে অন্য কেউ ওঠে না?'

জ্যোৎস্না হঠাৎ একগাল হেসে বলে ওঠে, 'দাদাবাবুই। সিঁড়ি থেকেই সুবাস ছড়াচ্ছে।....নাকটা একটু কোঁচকায় সন্ধানী ভঙ্গিতে, তারপরই বলে ওঠে, হুঁ! ওই তো....ফুলের গন্ধ, সেন্টের গন্ধ, তার সঙ্গে একটু-একটু 'ইয়ে'র গন্ধ। সভাটভা করে ফিরলেই ঠিক এইরকম দেখি। যাই, দেখিগে কত ফুল পেয়েছো।....বাব্‌বাঃ! সেদিনের সেই তোড়াদুটো! কী পেল্লায়, কী পেল্লায়!'

ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে ধরে।

গতকাল রাত্রে পুরন্দর সভা করে ফেরার সময় জ্যোৎস্না যখন 'যাই দেখি গে কতো ফুল'—বলে দরজার কাছে ছুটে গিয়েছিল, তখনই রাগে হাড় জ্বলে গিয়েছিল সুনয়নার। আবার যখন সে বাইরে কাদের সঙ্গে যেন কী বলাবলি করে, একটু পরেই একগাছা মোটা গোড়েমালা হাতে ঝুলিয়ে আর সুনয়নার দেখা সেই তখনকার বৃহৎ 'প্যারল্যাণ্ড'টা এবং বৃহৎ 'বোকে'টা দু'হাতে বুকে চেপে ধরে আহ্লাদী গরবিনীর ভঙ্গিতে ঈষৎ স্খলিতচরণ পুরন্দরের সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছ থেকে ভিতরে ঢুকে এলো, তদ্দণ্ডে সুনয়না দৃঢ়সংকল্প করে বসল, 'কাল সকালেই ওটাকে বিদেয় করে তবে আর কাজ।'

মেয়েটা যে 'খারাপ মেয়ে' একথা অবশ্যই বলা যাবে না। সুনয়না সেটা ভাবেও না, ওর দোষ হচ্ছে ও ভীষণ বোকা! আর হয়তো সেই বাবদই ওর ওই আহ্লাদী গরবিনী ভঙ্গিটি। ওটা বোঝা যায়। তবু এক-এক সময় অসহ্য লাগে সুনয়নার।

কিন্তু সকাল পর্যন্ত কি সে সংকল্পে দৃঢ় থাকা গেল? রাতেই তো মনে হল, ভাগ্যিস জ্যোৎস্না তখন ফিরেছিল। ....আর সকালের পর? দেখা গেল জ্যোৎস্না অপরিহার্য।....

কোন্‌দিন যে কী হয়। আজ সকাল থেকেই কবির ঘরে দর্শনার্থীর ভিড়। সাক্ষাৎকারপ্রার্থী আর ক্যামেরা বাগিয়ে-আনা রিপোর্টারের সমাগম এবং পুরন্দরের বন্ধুজনও বেশকিছুর আবির্ভাব।

বিশ-পঁচিশ পেয়ালা চা বানাতে হল। কাউকে কাউকে চায়ের সঙ্গে আনুষঙ্গিকও কিছু জোগান দিতে হল! আবার বাইরের লোক বিদায় হলে পুরন্দর বেশ কিছুক্ষণ সোফায় আধশোওয়া হয়ে বসে গোটাদশেক সিগারেট ধ্বংসানোর সঙ্গে বার তিনেক কফি খেল! অতঃপর সে রণক্ষেত্রে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে স্নানের ঘরে গেল!

সুনয়না এসে সারা ঘরের চেহারাটা দেখল। ঘরে যেন একটা খণ্ড যুদ্ধ ঘটে গেছে।....

ফটো তোলার জন্যে ক্যামেরা তাক করতে, ঘরের টেবিল টি-পয় সোফাগুলো নড়ানো সরানো হয়েছে এবং সেই অবস্থাতেই রয়ে গেছে সব। চা-কফির খালি কাপগুলো ইতস্তত রক্ষিত, অর্থাৎ যে যেখানে বসে খেয়েছে, সেখানেই নামিয়ে রেখেছে। পুরন্দরের একটা কফির কাপ সোফার গদির ওপরই কাৎ হয়ে পড়ে আছে।....অ্যাশট্রেটা উপচে ভর্তি হয়ে যাওয়ায় একটা খালি চায়ের কাপের মধ্যে ডুবে বসে আছে একগোছা অর্ধদগ্ধ সিগারেটের শেষাংশ। ঘরের মেঝেয়, টেবিলে, সোফার গদিতে পোড়া ছাইয়ের ইতস্তত ছড়াছড়ি।....দেখে বিতৃষ্ণা এল।

জ্যোৎস্নাকে ডেকে ঘরটা ঠিক করতে বলে ভিতরে ঢুকে আসে সুনয়না। তবে? কোন্ অবকাশে সুনয়না বলবে, 'তোমায় আর আমার দরকার নেই। তুমি বিদায় হও।'

বরং এখন তো এই ভাষায় বলতে হল, 'এই জ্যোৎস্না, যা দেখ গে—তোর কত কাজ বেড়ে বসে আছে।'

'চক্রবাল' অফিস থেকে গাড়ি আসে পুরন্দরের জন্যে। সেই টাইমটা ঠিক রাখতে হয় পুরন্দরকে।....অফিসের গাড়িকে দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না। খুবই উত্তম হত, যদি ঘড়ি দেখে নিচে নেমে পড়তে পারা যেত। তাহলে গাড়িটা এসে থামার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ে নিজের সময়ানুবর্তিতার পরাকাষ্ঠা দেখানো যেত। কিন্তু শত ইচ্ছেতেও সেটা কিছুতেই সে করে উঠতে পারে না। শেষ

মুহূর্তে চুলে একটু চিরুনি ছোঁয়ানো, যে জামাটা মাথায় গলিয়ে ফেলেছে সেটাকে বাতিল করে খাটের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অন্য আর-একটা জামা নিয়ে পরা, কোন্ জুতোটা পরবে তার ডিসিশান নেওয়া, এইরকম ছোটো ছোটো ব্যাপারেই শেষ পর্যন্ত লেট। তখন এই হয়, গাড়ি এসে দাঁড়ানোর সাড়া পেলে বারান্দা থেকে 'যাচ্ছি' বলে হাত নেড়ে ইশারা করে তাড়াতাড়ি নেমে যাওয়া।

গাড়িখানা কেবলমাত্র পুরন্দরকে নিতে আসে—এমন বললে একটু বেশি বলা হয়। যাবার সময় গাড়িতে আরো দু'জন থাকেন এবং ফেরার সময় সেই দু'জনকে নামিয়ে শেষকালটাই যা একটুখানি একা গাড়িটাকে ভোগ করে পুরন্দর।

অবশ্য অফিস শীঘ্রই ওকে নিজস্ব একখানা গাড়ি দেবে—এ আশ্বাসের আভাস পাওয়া আছে। পুরন্দর রায় যেন 'চক্রবাল' অফিসের আবিষ্কার। তাই তার খাতিরই আলাদা।

পুরন্দর স্নানে ঢুকে গেলে সুনয়না টেবিলে ওর ব্রেকফাস্টটা সাজিয়ে রাখে, যাতে ওর জন্যে দু'সেকেণ্ডও দেরি না হয়। সুনয়না চায়, তার বর ঠিক সময় নেমে পড়ুক। সেটা হয় না বলে পুরন্দরকে বলতে ও ছাড়ে না। বলে, 'গাড়িতে আরো দু'জন রয়েছেন সেটাও তো ভাববে একটু? রোজ লেট— লজ্জা হওয়া উচিত।'

মুড ভালো থাকলে হয়তো বর ওর গালে একটু টোকা দিয়ে বলে, 'লজ্জা রমণীর ভূষণ!' ....মুড ভালো না-থাকলে প্রায় খেঁকিয়ে উঠে বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমার ব্যাপার আমি বুঝব।'

পুরন্দরের এ-বেলা বাড়িতে খাওয়া এই ব্রেকফাস্টই। যদিও সেটার সামনে এসে বসে দশটা বেজে যাবার পর।....গাড়িটা আসে ঠিক এগারোটায়, তার মধ্যে সেরে নিলেই চলবে—এই মনোভাব।

লাঞ্চটা সমাধা হয় অফিসের ভি.আই.পি. ক্যান্টিনে। যেখানে মালিকের পুত্রও এসে বসেন মাঝে-মাঝে। খাওয়াদাওয়া অবশ্যই ভালো সেখানে। তবু সুনয়না ওর এখনকার ডিশে শৌখিন সুখাদ্যর ব্যবস্থা রাখেই কিছু। লোকটা সারাদিনের মতো বাড়িছাড়া হয়ে যাবে, বাড়ি থেকে ভালোমন্দ কিছু খেয়ে যাবে না?

আজ আর কিন্তু কোনো কিছুতেই যেন গা লাগছে না সুনয়নার। মোটামুটিই ব্যবস্থা রাখল। তবে তার জন্যে আক্ষেপের কিছু কারণ ঘটাল না। গতকাল ফাংশানকারীরা নাকি কবিকে এত খাওয়া খাইয়েছে যে, এখনো তার পাকস্থলী অধিক কিছু গ্রহণে নারাজ।

কিছু খেয়ে কিছু ফেলে-ছড়িয়ে বেরিয়ে গেল পুরন্দর। সুনয়না আর-এককাপ চা নিয়ে বসল। এটা অবশ্যই তার দ্বিতীয় দফা।....

জ্যোৎস্না বলল, 'ও কী বৌদিদি। আপনি শুধু চা? টোস্ট খাবে না? ডিমসেদ্ধ খাবে না?'

সুনয়না বলল, 'ইচ্ছে হচ্ছে না।'

'ওমা। দাদাবাবুই নয় রাতে নেমন্তন্ন খেয়েছে, আপনার কী হল?'

সুনয়না ঈষৎ বিরক্তভাবে বলে, 'সবকিছুতে কৈফিয়ত দিতে হবে তোকে? যা, যেখানে যা আছে, তুই সব নিয়েটিয়ে খেগে যা!'

জ্যোৎস্না একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলে, 'রান্নার কী হবে?'

'রান্না' বলতে অবশ্য এখন শুধু সুনয়নার আর ওব জন্যেই। তবু সুনয়না রোজই দেখেশুনে বলে দেয়, এবং বিকেলের জন্যে যদি কিছু করে রাখার দরকার হয়, তারও নির্দেশ দেয়। আজ কেমন অন্যমনস্কেব মতো বলল, 'ও তুই নিজে যা পারিস করগে যা।'

ছবির রেখে-যাওয়া সেই লেখাটা সুনয়নাকে লক্ষ বাহু দিয়ে আর্কষণ করে চলেছে।

সুনয়না ভাবল, 'ভাগ্যিস মেজাজ খারাপ কবে ওটাকে বিদেয় দিইনি।'

চা শেষ করে সুনয়না ঘরে চলে এসে লেখাটা হাতে নিয়ে খাটের ওপর উঠে বসল।

খাটের ওপর বসায় বেশ যেন একটা ঘবোয়া শিথিলতা থাকে, যেটা সোফায় পিঠ দিয়ে বসে হয় না।

আস্তে মোড়কটা খুলল।

কোণে আটকানো কাগজের গোছাগুলো কোলে রেখে মোড়ক খুলতেই দেখল, উপন্যাসের নাম—'পথ জনহীন'! লেখক উতঙ্ক উপাধ্যায়।

উতঙ্ক উপাধ্যায়!

ঠিক বটে, এইটাই টুটুদার ভালো নাম।

সুনয়না কেমন একটা আচ্ছন্নভাবে লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ....'পথ জনহীন'! যেন নিরালা নির্জন একটা ছায়া-ছায়া পথ দিয়ে চলেছে একটা ছন্নছাড়া নিঃসঙ্গ পথিক।....

সুনয়নার মনে হল, ঠিক, ছেলেবেলায় তো এইরকমই মনে হত। অনেক লোকের মধ্যে বসেও টুটুদা যেন নিঃসঙ্গ!

কিন্তু টুটুদার এত কষ্টের মধ্যেও হাতের লেখাটি আজও সুন্দর।

প্রথম পাতাটা ওল্‌টাল।

লেখা শুরু হয়েছে এইভাবে—

'জেলখানায় বসে' সাহিত্য করা কিছু নতুন ব্যাপার নয়। দেশে-বিদেশে

এর বৃহৎ নজির রয়েছে। কত কত মহৎ লেখা, মহান লেখা এই জেলখানাতেহ সৃষ্টি হয়েছে।....তবে আর কি! হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া উতঙ্ক উপাধ্যায়, তুইও তাই করতে বসছিস, কেমন? হাসি পাচ্ছে। ....তবে ভাবছি কোন্খান থেকে শুরু করব? কেবলমাত্র সেইখানের কথাই লিখব, মানুষ যেখানে অমানুষের পর্যায়ে নেমে গেছে। মানুষ যেখানে অকারণ নিষ্ঠুর, অকারণ ক্রূর, অকারণ নির্লজ্জ অত্যাচারী। তার আগে? বাল্য-কৈশোরের স্মৃতিতে উজ্জ্বল যে একটুকরো জীবন পেয়েছিলাম? তার কথা বলব না? সেটা দিয়েই শুরু হোক না।'

সুনয়না একবার চোখ তুলে দেখল।

বাইরেটা রোদে খাঁ-খাঁ করছে। জ্যোৎস্না বোধহয় রান্নায় কিছু-একটা ফোড়ন দিয়ে সাঁতলাচ্ছে। বাতাসে সেই গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ছে। কী ওটা? পাঁচফোড়ন? না সর্ষে-লঙ্কা?

এই গন্ধটার সঙ্গে একটি হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখতে পাচ্ছে সুনয়না। একটা ইঁট-বার-করা-বালির আস্তরণ-খসা রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে সেই মুখ উচ্চারণ করছে, নয়না, এই নয়না, তোর টুটুদাকে একটু ডেকে দে তো! বলবি, কাকীমা বলছে, ফুলকপির চচ্চড়ি রাঁধছে, চায়ের সঙ্গে খাবে একটু?

টুটুদা লিখছে।

লিখলেই-বা। একটু খেতে পারে না? একদিন গরম কপিচচ্চড়ি চায়ের সঙ্গে খেয়ে বলেছিল, 'মার্ভেলাস! রোজ এটা খেলেই হয়।'

সেই উজ্জ্বল মহিলাটি, যাকে ডেকে এই ফরমাশ করলেন, সে আস্তে-আস্তে মেটে উঠোনটুকু পার হয়ে দু-তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে একটা ঘেরাদালানে উঠল।....সেখানে মফস্বলি গেরস্থালীর একটা বিশেষ ধরন।....দেয়ালধারে বেঞ্চিতে পরপর ট্রাঙ্ক বাক্স সাজানো, তাতে একটা করে সুজনি ঢাকা দেওয়া। টুলের ওপর জলের কুঁজো বসানো, কাঁসার গ্লাস চাপা-দেওয়া। আরো এপাশে দালানটা থেকে একটা ছোটো ঘর। শোবার এবং পড়বার। একটা গেঞ্জিপরা পিঠ দেখা যাচ্ছে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে লিখছে এদিকে পিছন ফিরে।....

মেয়েটা—হ্যাঁ মেয়েটাই তো।

টানটান করে একখানা তাঁতের শাড়ি পরা মেয়ে। দরজার বাইরে থেকে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, 'টুটু-দা! গরম-গরম কপিচচ্চড়ি। উইথ চা। মার্ভেলাস।'

পিঠটা ঘুরে যায়। একটি চমকিত অথচ ভীষণ খুশি-খুশি মুখ দেখা যায়। কিন্তু সে মুখ থেকে যা উচ্চারিত হয়, সেটা একটু বকুনিই!

'অ্যাই! গুরুজনের সঙ্গে ঠাট্টা?'

গুরুজনের সঙ্গে ঠাট্টা!

কথাটা যে উচ্চারণ করল, সে অবশ্য 'ঠাট্টা' হিসেবেই উচ্চারণ করল। কারণ ব কৃত্রিম গম্ভীর মুখের কোঁচকানো ভুরুর নিচের চোখজোড়াটা চশমার কাঁচের াল থেকে কৌতুকের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ঝিকমিক করে উঠল।

কিন্তু যাকে বলল?

ার কাছে কী ঠাট্টা? যদিও সে তার স্বভাবগত চপলতায় হিহি করে হেসেই ্যারত তপস্বীর তপোভঙ্গ করে বসেছে। কিন্তু তার মনের গভীরে তো ওই ্দার আসনটি গুরুজনতুল্যই। সেই মনের কাছে টুটুদা অনেক বড়।

বয়েসের হিসেবের মাপ নয়, ব্যক্তিত্বের হিসেবে।

মেয়েটা মনেপ্রাণে অনুভব করে টুটুদা নামের ব্যক্তিটি তার দৈহিক উপস্থিতিতে এ সংসারের নাগালের মধ্যে থাকলেও, তার নিজস্ব বিরাট একটা জগৎ আছে। আর সে জগৎটা এই সংসারের নাগালের বাইরে। 'নয়না' নামের সেই মেয়েটা তো এই সংসারের ছায়াতেই বর্ধিত। নয়না তবে আর তার নাগাল পাবার স্বপ্ন দেখবে কেন?

নয়না জানে, টুটুদার মা-ও ভিতরে ভিতরে বোঝেন, ওই ছেলে তাঁর নাগাল থেকে অনেক উঁচুতে। তার বিচরণের ক্ষেত্রটি মাতৃহৃদয়ের অপরিচিত। তবু তিনি যেন জোর করেই সেই অপরিচয়ের বেড়াটা অতিক্রম করে তাকে আপন সীমানায় টেনে আনবার চেষ্টা করেন।

....টুটু রাতদিন কী এতো পড়িস বাবা? তোর ওই ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে ছাপা মোটা মোটা ইংরাজী বইগুলো দেখলেই আমার গায়ে জ্বর আসে। চোখটা তো একেই খারাপ, রাতদিন পড়ে পড়ে আরো খারাপ করে বসছিস।....টুটু, আমি আর কতদিন খেটে মরব রে? এবার আমার খাটুনির একটা দোসর এনে দেবার কথা ভাব? উঠেপড়ে লেগে একটা কাজকর্ম জোগাড় করে ফ্যাল, বাপু।

....ওভাবে হাসছিস যে? তোর ওই হাসি দেখে আমার গা জ্বলে যায় টুটু! এমনভাবে হাসিস, যেন তোর মা স্রেফ একটা পাগলের মতো কথা বলছে।....যেন জগৎ সংসারে কেউ কখনো বিয়ে-থা করে ঘরসংসার করে না।....টুটু, এতো লিখিসই-বা কী? শোনাস তো আমায় একদিন।....কী বলছিস, আমার ভালো লাগবে না? বুঝতে পারব না? পারব না কেন শুনি? ওগুলো তো আর ইংরেজি নয়, বাংলাই তো!....

এইরকম কথার ঝড় চালিয়ে বলতেন সেই মহিলা। টুটুদার মা। নয়না নামের

মেয়েটা যাঁকে সোনাকাকিমা বলে ডাকে।....

নয়না তো তখন ছোটোই। তবু নয়না যেন বুঝতে পারত ও সব কথা ‘বৃথা’ জেনেও বলেন সোনাকাকিমা। ছেলের সঙ্গে অপরিচয়ের দূরত্বর ভ কে ভাঙতে। নুষের

তা নয়না তো সোনাকাকিমার এই হৃদয়-রহস্যটি পড়ে ফেলতে পার কারণ তার নিজের ভিতরেও যে একই রহস্যের খেলা। নয়না কেন কে জানে টুকরো নিয়েছে টুটুদা আর পাঁচজনের মতো সাধারণ নয়। টুটুদা কোনোদিনই সোনাকা ‘খাটুনির দোসর’ এনে দিয়ে মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে বসবে না। টুটু যেন ওর ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো এই মস্তবড় ছবি দুটোর মধ্যেকার মানুষ দুজনের মতো।

মুখে তো কাউকে বলতে যাচ্ছে না নয়না, যে শুনে কেউ ঠোঁট ওল্টাবে। নয়নার নিজের মনের ভাবভাবনা, টুটুদা বিবেকানন্দর মতো। টুটুদা নেতাজীর মতো। টুটুদা দূর আকাশের তারা।....

তথাপি নয়নাও সেই দূর আকাশের তারাকেই না বোঝার ভান করে ডাক দেয়। হেই টুটুদা তোমার পায়ে পড়ি—ওই চাঁপা গাছের ডালটা একটু ধরো না! থোকা থোকা ফুল ফুটে রয়েছে গো।

টুটুদার মুখ রেখাহীন, কিন্তু চোখে সেই কৌতুকের ঝিলিক। এর জন্যে পায়ে পড়ার দরকারটা কী? তুচ্ছ কারণে পায়ে পড়ার অভ্যাসটা ছাড়ো, নয়না। সত্যিকার কারণ হলে তখন কী করবি?

ছবি তো অবশ্যই সব ফুল পাড়াপাড়ির সময় সঙ্গেই থাকে, সে হিহি করে বলে উঠে, তখন মাটিতে মুখ ঘষটে গড়াগড়ি খাবে।....তো এখন তো পায়ে পড়বেই। আমি তো আগেই তোকে ডাকতে যাচ্ছিলাম দাদা, মহারানীর বাহাদুরি করে বলা হল কী, সবসময় টুটুদাকে জ্বালাতন করা ঠিক নয়, ছবি।....টুটুদার কত কাজ।....আমি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ম্যানেজ করছি দ্যাখ না।....‘ম্যানেজ’ মানে এই যে তার নমুনা। ভেঙে পড়ে থাকা চাঁপাগাছের একটা বড়োসড় ডালকে আঙুল বাড়িয়ে দেখায় ছবি।

চাঁপাগাছের গুঁড়িটা তো খুব শক্ত, ডালগুলো যে এমন ‘মড়কা’ তা কে জানতো!

টুটুদা! আমি তোমার মতো লম্বা হলে কী মজাই হত।

ফুলের সম্ভার সামলাতে সামলাতে নয়না বলেছে একথা। সেও কিন্তু ওই স্বচ্ছন্দ হবার চেষ্টায়।

টুটুদা হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলেছে, মজার মধ্যে এই হত বিয়ে

হত না। একটা তালগাছের মতো বর কী আর জুট তো?

বিয়ে করতে আমার দায় পড়েছে। বলে নয়না অম্লানবদনে বলেছে, দেখলি তো ছবি। ভাগ্যিস টুটুদার পায়ে পড়লাম, তাই না এতো ফুল হল!

শুনিয়ে শুনিয়ে ঠাট্টার ভান করে বলত, কিন্তু মনটা তো সত্যিই সেই মগডালের ফুলের মতো মানুষটার পায়েই পড়ে থাকত।

হ্যাঁ, এই তুলনাটাও সেদিন আবিষ্কার করেছিল নয়না। টুটুদা নেতাজীর মতো, বিবেকানন্দের মতো। আবার এই মগডালের চাঁপাফুলের মতোও। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নাগাল পেতে গেলে, ডালটাকে ভেঙেই বসা হবে। টুটুদাকে বুঝতে দিয়ে কাজ নেই, টুটুদা! আমি তোমার ওই দেওয়ালে টাঙানো ছবির মানুষদের মতো উঁচু ভাবি। নাঃ, একদম না।

তার থেকে এই ভালো। হেই টুটুদা তোমার পায়ে পড়ি চারটি গল্পের বই এনে দাও।....টুটুদা, তুমি পেয়ারা খেতে চাও না কেন বলো তো? এই থেকে একটা খেয়েই দেখ না। একদম মিষ্টি গুড়।....নয় রে ছবি? আচ্ছা আমরা ক'টা করে খেলাম বল তো?

তা ছবির মধ্যেই কী 'দাদা' সম্পর্কে ভিতরে ভিতরে দারুণ একটা উঁচু ধারণা ছিল না? ছবিও কী ভাবত না, তার দাদা সাধারণদের থেকে আলাদা।

ভাবত বৈকি। তবে সেটা তার কথার মধ্যেই প্রকাশ পেত।....'বারোয়ারি পুজোর পাণ্ডাদের দলে দাদাকে ভিড়োতে চাইছে? পাগল আর কী! দাদা ওইসব হৈ-হুল্লোড়ে মাততে যাবে? দাদার দ্বারা ওসব হবে না রে। দাদা ওদের মতো ছ্যাবলা-মার্কা নয়।'

কিন্তু টুটুদা তো ছবির নিজের দাদা! শ্রদ্ধা সমীহ ভালোবাসা থাকতেই পারে। দাদা তার কাছে ভগবান তুল্যও হতে পারে।

নয়নার তো নিজের দাদা নয়।

পরবর্তীকালে কখনো একসময় নয়না নামের মেয়েটা যখন তার সেই বাল্যকৈশোরের স্মৃতিতে অবগাহন করেছে তার মনে হয়েছে নয়নার তো নিজের দাদা নয়। তবু সেই মানুষটা কেন নয়নার কাছে শুধুই শ্রদ্ধাস্পদ হয়ে থেকেছিল? প্রেমাস্পদ হয়ে ওঠেনি?

কিন্তু মানুষ বড়ো আশ্চর্য প্রাণী। তাই সেই ঝলমল স্মৃতি ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে এসেছে।....ফেলে-আসা হারিয়ে-যাওয়া সেই জীবনটার ওপর ধুলোর স্তর জমতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে সেই ধুলোর আস্তরণ 'নয়না' নামের মেয়েটাকে ঢেকে ফেলেছে। তারপর আর কী, 'সুনয়না রায়।' এক খ্যাতনামা কবির স্ত্রী। সমাজের বেশ চূড়োর কাছাকাছিই বসবাস। চন্দননগর নামক মফঃস্বল শহরটার

সেই ভাঙাভাঙা বাড়িটা প্রায় মুছেই গিয়েছিল।

অথচ আজ যখন ছবি হঠাৎ একটা আশ্চর্য কথা শোনালো, সেই মুহূর্তেই কে যেন সুনয়নাকে মুঠোয় চেপে ধরে সেইখানে নিয়ে গিয়ে ফেলে 'নয়না' করে দিল। আর সেই নয়না যেন বন্ধনয়ন মেলে দেখতে পেল। শুধু 'শ্রদ্ধাস্পদ' নয়। 'প্রেমাস্পদও'। শুধু নয়না এতোকালের মধ্যে সেই পরম কথাটি টের পায়নি। আশ্চর্য।

কিন্তু ছবি তো অন্য এক আশ্চর্য কথা শুনিয়ে গেল।

দাদার প্রাণের ভালোবাসার জিনিসটা—দাদার প্রাণের ভালোবাসার জনের কাছেই রেখে গেলাম।

ছবি জেনেছিল।

নয়না জানতে পারেনি। কারণ নয়না নিজেকে ওই উঁচু জগতের মানুষটার কাছে নেহাৎ 'তুচ্ছ' বলেই ভাবত।

সুনয়নার ভিতরের মূল শিকড়টা ধরে কে যেন মোচড় দিয়ে ঝাঁকুনি দিতে থাকে।....

আমি জানতাম না আমি তোমায় ভালোবাসতাম। আর এও আমি জানতাম না, আমি তোমার পরম ভালোবাসার জন ছিলাম।....কই কোনোদিন তো তোমার চশমা-ঢাকা চোখদুটোয় গভীর অর্থবহ কোনো দৃষ্টি দেখতে পাইনি। যে দৃষ্টিতে একমুহূর্তে বন্ধ দরজা খুলে পড়ে। নাঃ ভারি সংযমী আর সাবধানী ছিলে তুমি।

কিন্তু সংসার জায়গাটা এতো মমতাময় নয় যে, কাউকে স্মৃতির সাগরে তলিয়ে গিয়ে বসে থাকতে দেবে

নয়নার কাছে সব থেকে বিরক্তিকর অথচ সব থেকে অপরিহার্য ওই কাজের মেয়েটা এসে নয়নাকে যেন চুল ধরে সেই অতলতা থেকে উঠিয়ে এনে মাটিতে আছড়ে দেয়।

সুনয়না শুনতে পায়, কী বৌদিদি, এই অসময়ে খাওয়াদাওয়ার আগেই ঘুমাতে লেগেছ না কি? খাওয়াটা হবে না?

নাঃ। নিজেকে ওই হঠাৎ উথলে-ওঠা স্মৃতির জোয়ারে ভাসতে দিলে চলবে না। ছবি বড়ো ভয়ঙ্কর একটা দায়িত্ব দিয়ে গেছে সুনয়নাকে।

ছবি বলেছিল, দাদার অবস্থা দেখলে মনে হয়, যেন ওর এই 'আত্মনায়ক' উপন্যাসখানা ছেপে বেরোনো দেখতে পেলেই ওর সারাজীবনের সব পাওয়া পেয়ে যায়।

কিন্তু সেই 'দেখতে পাওয়াটা' দ্রুত দরকার। টুটুদার দৃষ্টিশক্তি যে জবাব দিতে চাইছে।

শক্ত কাজ। খুবই শক্ত কাজ।

টুটুদাকে ওই তার জীবনের সব পাওয়াটা পাইয়ে দেবার জন্যে নয়নাকে শরণ নিতে হবে, কবি পুরন্দরের কাছেই।

এর মতো শক্ত কাজ আর কিছু আছে জগতে?

অথচ এছাড়া আর কী? গহনাপত্র বিক্রি করে পুরন্দরকে না জানিয়ে অন্য কোনোখান থেকে ছাপিয়ে বার করবে?

অবাস্তব পরিকল্পনা।

বাস্তবতাকে স্বীকার করতেই হবে। স্বামীকে না-জানিয়ে কোনো কাজ কোনোদিনই করেনি সুনয়না। এখনো পারবে না।

'মুড' বুঝে বলতে হবে।

বলতে হবে নিজের সম্মান বাঁচিয়ে। টুটুদার সম্মান বাঁচিয়ে।

আর সেই বাঁচানোটার একমাত্র উপায় হচ্ছে আবেদনের ভাষাটিকে দোরস্ত করা।

পুরন্দরের মতো আত্মপ্রেমী এবং সাফল্যগর্বিত লোকটার তাচ্ছিল্য দৃষ্টির সামনে কি সসঙ্কোচ নিবেদনের সঙ্গে ধরে দেওয়া যায় টুটুদার ওই প্রাণের ভালোবাসার জিনিসটিকে?

সেই সঙ্গে তো তাহলে এও নিবেদন করতে হয়, অভাগা লেখকটি সুনয়নার চেনাজানা।

ছবিরে! তুই আমায় কী দুরূহ কাজটার ভার দিয়ে গেলি!

আচ্ছা, নিজেকে না হয় পাদপ্রদীপের সামনে নাই-ই আনলো সুনয়না? এও তো বলা যায়, তার এক বাল্যবান্ধবী হঠাৎ এসে এটা সুনয়নাকে গছিয়ে দিয়ে গেছে। সুনয়নার প্রতিপত্তিশালী বরের হস্তক্ষেপে যদি লেখাটার একটা গতি হয়।

লেখক সুনয়নার 'বান্ধবীর' চেনাজানা আপনজন।

হয়তো এইটাই বলতে পারে। তবে ভাষাটাকে নিক্তির ওজনে রাখতে হবে। যেন ভেস্তে না যায়। যেন প্রকাশ হয়ে না যায়।

কিন্তু সব আগে, ওটা সুনয়নার একবার পড়ে নেওয়া দরকার তো!

অনুরোধ মাত্রই যদি পুরন্দর হঠাৎ বলে বসে, 'কই দেখি? কী তোমার নবীন লেখকের অবদান। শ্যামলবাবুকে একবার পড়ে দেখতে বলি। নেহাৎ 'অচল' হলে তো আর অনুরোধ করা চলবে না।....যেখানে আমার অনুরোধ দাম আছে, সেখানে নিজেরও দায়িত্ব আছে সেই দামের মর্যাদা রাখবার।'

হ্যাঁ, এই ধরনেরই কথাবার্তা পুরন্দরের।

সুনয়নার যেন পড়া পুঁথির মতো মুখস্থ হয়ে গেছে পুরন্দরের বাক্‌ভঙ্গি।

চক্রবাল প্রকাশনীর বিভাগীয় অধিকর্তা শ্যামলবাবুকেও জানে সুনয়না। তিনিও একখানি উন্নাসিকের রাজা। ....নতুন লেখক শুনলেই তো অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাবেন। ....যেন বিখ্যাতরা কখনো কোনোদিন নতুন থাকেন না।

তা উন্নাসিক আর ওদের কে নয়? সুনয়না যাদের দেখেছে এবং যাদের দেখেওনি, তাদের সবাইকে যেন চিনে ফেলেছে।

ওরা যাকে বাড়াতে ইচ্ছে করবে, তাকে এতো বাড়াতে থাকবে যে, সেই বর্ধিত ব্যক্তিটি ক্রমে নিজেই ভাবতে আরম্ভ করে আমি হয়তো সত্যিই অতোখানি।

মনের অগোচর পাপ নেই। সুনয়নার মন বলে, যা আমার স্বামীটির হয়েছে।

তো সে যাক। যদিই ভাগ্যক্রমে পুরন্দর বলে বসে, 'কই দেখি?'

আর সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলবাবুর দপ্তরে দেন? তাহলে তো সুনয়নার জানাই হবে না কী লিখেছে টুটুদা ওই পাতার পর পাতা।

কে জানে কতোদিন অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকবে লেখাটা চক্রবাল প্রকাশনীর দপ্তরে। কতদিনে রায় বেরোবে প্রকাশযোগ্য কিনা। নাঃ, এক্ষুণি কথাটা তুলে কাজ নেই পুরন্দরের কাছে। পড়ে নেবার পর তুলবে। পড়তে আর কতক্ষণ? হাতের লেখা বলেই যা একটু সময় লাগার কথা কিন্তু টুটুদার হাতের লেখা তো ছাপার থেকে কিছু কম ভালো নয়। কী করে অতো অতো পাতা এমন সুন্দর করে লিখেছে টুটুদা!

আগে পড়ে নিই। কিন্তু সেই পড়ে নেওয়াটা কী এতোই সোজা?

তাড়াতাড়ি খাওয়াটা সেরে নিয়ে লেখাটা নিয়ে পড়তে বসে সুনয়না।....

কিন্তু পড়ে ফেলা যাচ্ছে কই?

বারেবারেই যে আবার স্মৃতির সমুদ্রে তলিয়ে যেতে হচ্ছে।....কথাগুলো যেন সেই একদা চেনা টুটুদার মুখ থেকেই উচ্চারিত হতে শুনছে, 'আত্মপ্রকাশের মতো আনন্দ আর কী আছে? আবার আত্মপ্রকাশের মতো যন্ত্রণা বা কী আছে?....প্রকাশের প্রেরণাই তো হচ্ছে আমার হৃদয় থেকে উথলে-ওঠা কথা অপরের হৃদয়ে পৌঁছে যাক। কিন্তু যদি ভাগ্যের নিষ্ঠুরতায় আমার সেই কথার বন্দী হয়ে পড়ে থাকে কেবলমাত্র আমারই খাতার পাতার মধ্যে? সেই কথারাও তো মুক্তির জন্যে ছটফট করে মরবে।'

এই ছোট্ট একটু ভূমিকার মতো লিখে রেখেছে টুটুদা।

কার জন্যে?

হয়তো নিজের জন্যে।

তবে এইরকম কথা তখন টুটুকে বলতে শুনেছে নয়না।

হয়তো ছবিকেই বলেছে, 'লেখবার জন্যে তো এতো অস্থিরতা, এতো খাটুনি। কিন্তু লিখে যে কী হবে তাই ভাবি। আমাদের মতো অজানা অচেনাদের লেখা কে ছাপতে আসছে?'

আশ্চর্য? এই এতগুলো বছর পার হয়ে গেল, তবু টুটুদা অজানা অচেনা রয়েই গেল।

অবশ্য এতগুলো বছরের মধ্যের অনেকগুলো বছর তো জেলখানার মধ্যে কেটেছে। কী জানি এখন কেমন দেখতে আছে টুটুদা।....ছবি বলে গেল, দেখলে চোখে জল আসে। সেই মশালের মতা চেহারার মানুষটা গুঁড়িয়ে গেছে। পুলিশী নৃশংসতা যে কী, তা তুই ভাবতেও পারবি না নয়না।....দাদা একটু খানি বলেই নিজেই বলেছে, 'নাঃ থাক। শুনতে বসে তোরা কাঁদতে শুরু করবি।'....মা-ও শিউরে উঠে বলে, 'থাক, বাবা থাক। আর বলিস নে।'

আচ্ছা, প্রতি পদে হারিয়ে যেতে যেতে কী পড়ে ফেলা যায়?

নাঃ। মনকে শক্ত করে ফেলে একদম নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পড়ে যেতে হবে। ....এ লেখা টুটুদার নয়। অন্য কারুর।

সুনয়না তার টুটুদার লেখাটা নিয়ে পড়তে বসার সময় সঙ্কল্পে স্থির হয়েছিল লেখাটা পড়বে সে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টি, আর নির্মোহ মন নিয়ে। যেন এর লেখক এই উতঙ্ক উপাধ্যায় তার একেবারে অজানা অচেনা কেউ। এর ডাকনাম জানবার কথা নয় সুনয়নার।

কিন্তু লাইন কয়েক পড়তে পড়তেই চমকাতে থাকে সুনয়না। চেষ্টা করে বা সঙ্কল্প করে তো 'অজানা অচেনা' ভাববার দরকার নেই। এই উতঙ্ক উপাধ্যায় তো সত্যিই সুনয়নার অজানা। সুনয়না এর ভাষা চেনে না, ভঙ্গি চেনে না। হয়তো 'বক্তব্য'ও সুনয়নার একদার ধারণার ধারেকাছেও যাবে না। সুনয়না একদা যে 'উতঙ্ক উপাধ্যায়' নামের 'লেখকটি'কে চিনতো, যে তখন লিটল ম্যাগাজিনে গল্প লিখে লিখে বন্ধুমহলে বাহবা কুড়োচ্ছে। আর বাড়ির ভেতরে এক সম্মোহিতা পাঠিকার মুগ্ধচিত্তের নৈবেদ্য গ্রহণ করছে, তার ভাষায় ছিল যেন সমুদ্রের গভীরতা। আর বক্তব্য? সেখানেইও তো তাই।

তাই নিয়ে সেদিন তার মুগ্ধ শ্রোতার ক্ষুব্ধ প্রশ্নের উত্তরে হেসে হেসে সে বলেছিল, 'কেবলই দুঃখের গল্প, যন্ত্রণার গল্প, কেন লিখি? আরে, তা নইলে কারো মনে দাগ কাটবে? সুখের গল্প জলের দাগের মতো বুঝলি? সময়ের হাওয়া লাগলেই মিলিয়ে যায়। দুঃখের, বেদনার, যন্ত্রণার, কথা হচ্ছে পাথরে খোদাইয়ের মতো। মিলিয়ে যেতে যুগযুগান্তর কেটে যায়।....তেমন লেখা হলে?

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের মনে আসন পেতে বসে থাকে। কী? বুঝতে পারছিস না?....আচ্ছা ধর, সেই বনবাসের সীতাদেবী। তিনি যদি দুঃখে বেদনায় পাতাল প্রবেশ না করে, রামচন্দ্রের সুখী মহিষী হয়ে সিংহাসনে বসে, আস্তে আস্তে বুড়ো হয়ে কোনোদিন মরতেন, কেউ তাঁকে মনে রাখত? ধর, শ্রীরাধা? তিনি যদি কেষ্টঠাকুরটির সঙ্গে চতুর্দোলায় চেপে দ্বারকায় গিয়ে মহারানী হয়ে বসতেন? কে তাঁকে নিয়ে চিরকাল ধরে কাব্য রচনা করে মরতো?....হাতের কাছে আমাদের নদের নিমাইয়ের বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখ? তিনিও যদি মহাপ্রভুর মহাশিষ্যা হয়ে খোলকর্তাল নিয়ে কেত্তন গাইতে গাইতে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন? তাহলে কী? হাসছিস যে? হাসির কথা নয়, এটাই ঠিক রে।....ইতিহাসে দেখিস। যেসব বীরপুরুষরা যুদ্ধজয় করে রাজ্যলাভ করে দাপটে রাজত্ব করে গেছেন, তাঁদের থেকে আমাদের কাছে অনেক প্রিয় সেইসব বীরেরা যাঁরা 'মরে অমর' হয়ে বসে আছেন। যাঁরা জীবনে 'ফেলিওর' হয়েও চিরজয়ী কালজয়ী। তাহলেও তবুও দুঃখের কাহিনী, হতাশার কাহিনী, যন্ত্রণা বেদনা বঞ্চনায় বিদীর্ণ মানুষদের কথা পড়তে গেলে তোর মনখারাপ হয়ে যায়? তো তুই তো গল্প লিখতে শুরু করেছিস। কষে সুখের গল্পটল্প লেখ। মন ভালো থাকবে।

আবার তারপর সেই লেখকই লিটল ম্যাগাজিনের পরিধি ছেড়ে গল্পকাহিনীর কলমকে সরিয়ে, লিখতে বসেছে, ভারি ভারি সব প্রবন্ধ।....যা দেখে তার মা বলেছে রাতদিন এত কী লিখিস বাবা? একেই চোখ খারাপ। কই ছাপা হতেও তো দেখি না! কেবল লিখে লিখে পাহাড় জমাচ্ছিস। আর সেই পাঠিকা চুরি করে সে-সব প্রবন্ধের পাতা উল্টোতে এসে নামটুকু পড়েই সভয়ে সরিয়ে রেখেছে। 'সভ্যতার আদিকথা', 'মানবজীবনে সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা', 'ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সন্ধানে', 'জীবধর্ম ও জীবন ধর্ম'—এইরকম সব নাম। দাঁত ফোটাতে চেষ্টাতেই ধৃষ্টতা। আর ভাষাই-বা কী ভারিক্কী।

কিন্তু এ উতঙ্ক উপাধ্যায়ের কলমের ভাষা যেন লিকলিকে বেতের ডগা। শুরুটাই-বা কী অদ্ভুত। এ-লোক কী সেই আগের উতঙ্ককে ব্যঙ্গ করতে আসরে নেমেছে না কি? তা নইলে লিখছে কেন....'কী হে উতঙ্ক উপাধ্যায়। হঠাৎ ব্যাপারটা কী তোমার? হঠাৎ কাস্তে ভেঙে কর্তাল গড়াতে বসার শখ যে? বলি বেশ তো ছিলে। যে মাঠখানা চেনাজানা ছিল, সেই মাঠেই খোঁটায় বাঁধা থেকে ঘুরপাক খেয়েছ, আর চোখ বুজে বুজে মুখের কাছের কচি ঘাস চিবিয়েছে। খামোকা এই মতিচ্ছন্ন কেন হে? দুম করে খোঁটা খুলে অন্য মাঠে ঘাস খেতে ঢোকবার সাহস কী জন্যে? অ্যাঁ?....আস্বা কত। উপন্যাস লিখব।....বলি

'উপন্যাস' লিখব ভাবলেই লেখা যায়? কাজটা এতো সোজা? কী বলছ হে? যায়। ইচ্ছে করলেই যায়। ঐ....যে আজকাল কী একখানা ফ্যাসন হয়েছে—'স্মৃতিচারণধর্মী উপন্যাস।'....'আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস' তাতে নাকি কোনো হাঙ্গামা নেই। কোনো কাঠখড় পোড়াতে হয় না। লিখে যাও। নিজের সেই 'নিকারবোকার পরা' চেহারাটাকে স্মরণ করে তার পিছনে কলমখানাকে ছুটিয়ে নিয়ে যাও। তাতেই হবে।....তবু বলি তোর স্মৃতিকথা শুনতে বসবে লোকে?....কী বলছিস? শুনবে। শুনবে। সেই যে কথায় আছে না খেলতে জানলে কানাকড়ি নিয়েও খেলা যায়।' তবে আর কী? অকুতোভয়ে খেলায় নেমে পড়।'....

এইটুকু পড়েই সুনয়না যেন অবাক হয়ে ভাবতে বসে। সেই 'টুটুদা' এই লিকলিকে বেতের ডগার ভাষাটা লিখল কবে, একী সত্যিই সে? তখনো তো লেখার নিচে নাম স্বাক্ষর করত— উতঙ্ক উপাধ্যায় বলেই। নয়না নামের মেয়েটা সেই লেখাগুলোয় দাঁত ফোটাতে পারত না, তবু যেন লেখকটিকে বুঝত। এ লেখককে বুঝতে পারছে না সুনয়না।....

পাতা উল্টে এক জায়গায় দেখল—'তো তাতেই-বা কী? মিথ্যে কেসে জেল খেটেছিস। পুলিশের প্রহার খেয়েছিস, তো হয়েছেটা কী? তাতে কার মাথাটা কিনে নিয়েছিস শুনি? আর পিটুনী? অমানুষিক অত্যাচার? ফুঃ। জেলের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে তো দেখলি, এসব কিছুই না। হরবখৎ চলছে এসব। আইনের কাছে এ হচ্ছে 'জলভাত'। একটা রক্তমাংসে-গড়া মনিষ্যির শরীরকে 'ইট কাঠ লোহা পাথর' ভেবে আছাড় দেওয়া, পিটুনি দেওয়া, কোনো ব্যাপারই নয়। বরং বলতে গেলে এ একটা শিল্পকলার পর্যায়েই পড়ে। ওই রক্তমাংসে গঠিত শরীরটার ঠিক কোন্ কোন্ পয়েন্টে আলপিন ফোটালে বা জলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দিলে, কিংবা উল্টো পাক মোচড় দিলে দাওয়াইটা মোক্ষম হয়, সেটি নিপুণভাবে জানা এবং মানা এ একটা শিল্পশিক্ষা নয়? অথবা 'আকুপাংচার'-এর মতো চিকিচ্ছে।

কী বলছিস?

বিনা অপরাধে?

অপরাধ করলেই সাজা পেতে হয়, আর নিরীহ নিরপরাধ হলে নিশ্চিন্তি থাকা যায়, পুলিশী আইন এমন কুসংস্কারে বিশ্বাসী না কি রে? কিছু দোষঘাট না করেও তুমি বছরের পর বছর জেলে পচতে পারো, আবার দু'পাঁচটা খুন জখম জালিয়াতি লুঠতরাজ করেও দিব্যি বুক ফুলিয়ে সমাজে ঘুরে বেড়াতে

পারো। —এটাই স্বাভাবিক। কারণ ওই নিরীহটা অত 'প্যাঁচপ্যোঁচ' জানে না বলে ফাঁদে পা দিয়ে মরেছে, আর দ্বিতীয় জন আইনের ফাঁকফোকরটি কোথায় কীরকম, সেটি জেনে বসে আছে বলে ফোকর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ব্যাপারটা স্রেফ এই।

তবে হ্যাঁ, জেলখানা মস্ত একখানা 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' একথা মানতেই হবে। কতরকমের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। তার কত স্বাদ। টক ঝাল ঝাঁজ তেতো কষা। তো কী রে শালা উতঙ্ক। সে-গল্প শোনাবি নাকি দু-একখানা বাবুমশাই বিবিমশাইদের?

অবিশ্যি 'নতুন' কিছু দিতে পারবি বলে মনে হয় না। আগের জমানা এসব অনেক শুনিয়ে গেছে রে। শুনে শুনে লোকের মুখস্থই হয়ে গেছে। 'থার্ড ডিগ্রি' কী, তা বোধহয় ইস্কুলের ছেলেটাও বলে দিতে পারবে...

তবে কিনা 'কালাকাল ভেদ' বলে একটা কথা আছে তো? সেটা ছিল 'অন্যকালের' কাহিনী। সে কাহিনী বিদেশী প্রভুদের লোহার কাঁটা লাগানো বুটের ঠোক্করের, লালমুখো সার্জেন্টের হাতের শঙ্করমাছের চাবুকের অভিজ্ঞতার কাহিনী। যাঁড় শুযোব খাওয়া মেজাজের গপ্পো।....তো সে গপ্পো তো ক্রমশই বাসি হয়ে যাচ্ছে।....এখানকার টাট্কা খবর সাপ্লাই করে দেখ না। তবে কিনা ট্র্যাডিশান বলে একটা কথা আছে না? যে পুজোর যে মন্তর, যে দেবতার যে স্বভাব। কালের বদল ঘটেছে বলে তো আর শনিঠাকুর 'শিবঠাকুর' হয়ে যেতে পারেন না? কাজেই....কিন্তু ওরে বেটা উতঙ্ক! এতোই যদি তুই তালেবর হয়ে থাকিস যে 'আত্মকথা ' শোনাতে বসেছিস, তো ওই খাঁখাঁ করা দুপুর রোদ্দুরের 'গপ্পোটাই 'বা প্রথমে কেন? তোর জীবনের কী একটা সকালবেলা ছিল না? নির্মল সুন্দর একটি সকাল? যে 'সকালটায়' হয়তো দারিদ্র ছিল, পরমুখাপেক্ষিতা ছিল, তবু তার মালিন্য ছিল না। কারণ সেখানে ছিল অগাধ ভালোবাসা। যদিও বাইরের সমাজ সংসার ওই 'পর'-এর ভালোবাসাটিকে তেমন সুচক্ষে দেখত না, কিন্তু তোর সকালটায় তো তাতে কোনো ছায়া পড়েনি।....তোর জীবনের সকালটা দিয়েই না-হয় একটু শুরু কর। সেই যে, একটা মফস্বল শহরর কোনো একখানে, একটা দেওয়ালের পলস্তারা-খসা পুরনো পুরনো বাড়ির ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে ছিল তোর অস্তিত্ব। সেখানের অন্তত একটা সোনালি সকালের ছবিটা ভাব।.... দেখতে পাচ্ছিস তোর মা উঠোনের কুমড়োলতার মাথা থেকে সোনাঢালা বঙা সিল্কের মতো মসৃণ আর উজ্জ্বল মস্ত মস্ত ফুলগুলো পটপট করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে আঁচল বোঝাই করছে দেখে তুই হায় হায় করে বলে উঠলি, 'ও মা। ও মা। ও কী হচ্ছে? ফুলগুলো ছিঁড়ছ

কেন? গাছটা কী সুন্দর দেখাচ্ছিল'—শুনে তোর দুঃখিনী মা সুখে আহ্লাদে হেসে হেসে বলে উঠল, 'তুলছি তোর ঘরের ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখব বলে! পাগল আর কাকে বলে? কুমড়ো ফুল কেন ছিঁড়ছি জানিস না? আচ্ছা, একটু পরেই জানিয়ে দিচ্ছি।'

একটু পরে সেই মা ডেকেছিল, 'টুটু আয়। ছবি, নয়না, কোথায় কী করছিস আয়। কুমড়ো ফুলের বড়া ভেজেছি গরম গরম খেয়ে যা।'

কে জানে কী দিয়ে মা ওই অতীব সুন্দর বড়াগুলো ভাজে। ফুলে ফুলো মচমচে মচমচে! তখন সেই উজ্জ্বল ঝকঝকে সোনারঙা ফুলগুলোর রূপান্তরটি দেখে কী আর ফুল ছেঁড়ার জন্যে আক্ষেপ আসে? সাধে কবি ওই কুমড়ো ফুলকে উদ্দেশ্য করে মনের খেদে বলেছিলেন, 'রান্নাঘর ওর জাত মেরেছে।'

ছবি বলল, 'উঃ দারুণ! মা দাদাকে আর দুটো দাও।'

দাদা রাগ দেখিয়ে বলল, 'তোর দারুণ লাগল, তো 'দাদা'কে আর দুটো দাও কেন?'

আর তার উত্তরে তোর বালিকা প্রিয়া হিহি করে হেসে বলে উঠল, 'ওই নিয়ম! সোনাকাকি ঠিকই বুঝবে 'দাদাকে দাও' মানেই আমার পাতেও দু'খানা দাও। কী রে ছবি? তাই না?'

'বালিকা প্রিয়া।'

এ কে? এ কার কথা? কী অভাবনীয় একটা কথা লিখেছে ওই 'টুটুদা'।

সুনয়নার সারা শরীর যেন অবশ হয়ে আসে।

টুটুদার সেই ভোর সকালের জীবনে 'নয়না'নামের একটা অবোধ বালিকার জন্যে ছিল এই পরম আশ্চর্য জায়গাটা? অথচ সে একদিনের জন্যেও টের পায়নি।....সে তার আপন মুগ্ধতা নিয়েই বিভোর থেকেছে? সে তাই আরো হেসে হেসে বলেছে, আমি বাবা অতো কান ঘুরিয়ে নাক দেখাই না। সোনাকাকি আমায় আর দুটো দাও না গো!....আর আছে তো? তোমার জন্যে রাখাটা দিয়ে দেবে না তো? তাহলে কিন্তু খাব না।

কিন্তু টুটুদা তখন যা বলেছিল, সে কী 'প্রিয়া' কে বলবার মতো কথা? অথচ অনায়াসেই বলেছিস। 'ইস! হ্যাংলার মতো চেয়ে আবার এখন ভদ্রতা দেখাতে বসছে।'

'হ্যাংলার মতো? টুটুদা! ভালো হবে না বলছি।'

'ভালো না হলে মন্দই হবে। তা বলে যা সত্যি তা তো বলতেই হবে।

ছবি বলে উঠল, 'আচ্ছা দাদা! তুমি সবসময় আমার বন্ধুকে এরকম ক্ষ্যাপাও কেন বল তো?'

'ক্ষ্যাপাই তো! কিন্তু ক্ষ্যাপে কই? ক্ষেপলে কেমন দেখায়, দেখাই যায় না।'

'ক্ষেপেই কী তোমায় আঁচড়ে কামড়ে দেবে? মনে মনে রেগে থাকবে।'

'তাহলে, মাকে বলগে যা। বেশি করে ভাত রাঁধতে।'

'হ্যাঁ, এইটুকুই। এই অতি সাধারণ অতি পরিচিত নেহাৎ 'মধ্যবিত্ত' সব কথা হাসি ঠাট্টা। এর বেশি কিছু না। তবু—'

'নয়নারে, তুই কী গবেটই ছিলি?'

মনে মনে নিজেকেই নিজে ধিক্কার দেয় সুনয়না।

আশ্চর্য। এই এতদিন পরে সুনয়নার এই 'সুখীসুখী' জীবনে সামান্য ওই ছোট্ট শব্দটুকু সুনয়নাকে এত উদ্বেল করে তুলছে কী বলে?

সুনয়না আর পরবর্তী কথাগুলো ভালো করে পড়তেই পারছে না। শুধু ঝাপসা চোখের সামনে ওই একটা শব্দই ভেসে উঠেছে 'আমার বালিকা প্রিয়া।' আমার—

কিন্তু হঠাৎই একসময় সুনয়না যেন ভিতরে ভিতরে ছিটকে ওঠে। বলে ওঠে, 'কক্ষনো না। মিছে কথা। ডাহা মিছে কথা!!'

এ হচ্ছে এখন একটা নতুন আরোপিত ব্যাপার।....স্রেফ কাল্পনিক! আমিও তাই তোমার ভাষাতেই বলে উঠছি—

'ওহে উতঙ্ক উপাধ্যায়। কস্মিনকালেও তোমার মধ্যে ওই সূক্ষ্ম অনুভূতিটি ছিল না। এখন 'আত্মকথা' লিখতে বসে নিজেকে একটু 'সুন্দর' দেখতে, একটু 'মধুর' দেখতে সাধ হচ্ছে, তাই নয়না নামের নেহাৎ অবোধ মেয়েটাকেই হাতে তুলে নিয়েছ....তোমার উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টির মধ্যে কবে আবার অমন 'শৌখিন' কথার সমর্থক দৃষ্টিটি ছিল? যা ছিল, সে তো শুধুই কৌতুকের দৃষ্টি। পুরু কাঁচের চশমার আড়ালে তোমার চোখদুটোয় তো সব সময়ই একটু কৌতুকের দৃষ্টি ঝিকঝিকিয়ে ওঠতো!....মেয়েটা ভাবত, ওটাই তোমার ধরন। আর সেই ধরনেই মুগ্ধ হত।....এখন বুঝতে পারছি, ওই বোকা অবোধ মেয়েটার বিভোর বিমুগ্ধ দৃষ্টিটিই ছিল তোমার কৌতুকের জোগানদার।....ওর সম্বন্ধে আর কোনো ভাবই ছিল না তোমার।

কিন্তু এখন?

এখন 'উপন্যাস' লিখতে বসে তাতে একটু রস সঞ্চার করতেই তোমার এইসব বানানো কথা। অথবা হয়তো নিজেকেই নিজে ছলনা করা। লিখতে বসে ভাবলে 'বাল্য' ছিল অথচ একটা 'বাল্যপ্রেম' ছিল না, এটা কেমন ন্যাড়া

ন্যাড়া লাগছে না? তাহলে না হয় সেই জায়গাটায়—'

সুনয়নার এই এক অনুপস্থিতির ওপর আছড়ে-পড়া তীব্র তীক্ষ্ণ অভিযোগের মুহূর্তটিতেই, তার ওপর আছড়ে এসে পড়ল একটা স্থূল কর্কশ অভিযোগ। 'এখনো আপনি বই খাতা নিয়ে বসে আছো, বৌদিদি? দাদাবাবু এসে ঘরে ঘুরে গেছে টের পাওনি?.......দেখেন গে, একগাদা বন্ধু নিয়ে এসে হাজির দাদাবাবু। হিহি, আমারে বলল, 'তোর বৌদি দেখলাম ধ্যানে বসেছে। চট করে পাঁচ কাপ চা আর তিন কাপ কফি বানিয়ে ফেল দিকি!........তো কফির কৌটোখানা কোথায়? দেখতে পাচ্ছিনে তো?'

জ্যোৎস্নার এতগুলো কথার মধ্যে একটা কথাই শুধু সুনয়নার কানে ঢোকে। দাদাবাবু এসে ঘরে ঘুরে গেছে।

কখন? সুনয়না টের পেল না এটা কী করে সম্ভব? বাইরে থেকে দেখেই বোধহয় ফিরে গিয়ে ওটা বাড়িয়ে বলছে।

তারপরই ওই কথাটা।

'তোর বৌদি ধ্যানে বসেছে।'

ওই কাজের মেয়েটার সঙ্গে পুরন্দরের এই ধরনের কথাবার্তা সুনয়নার পরম বিরক্তির। পুরন্দর হয়তো ভাবে এটা নেহাৎই মজা! কিন্তু সুনয়নার যেন এতে কোনোখানে প্রেস্টিজের হানি ঘটে।

কখনো কোনো সময় এ-নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলে, পুরন্দর হেসে বলে, 'তোমার উচিত ছিল স্কুলের দিদিমণি হওয়া। যারা কাজ করতে আসে, তাদেরকে সবসময় 'তুমি কাজ করবার লোক মাত্র'— এটাই মনে না-করিয়ে, 'বাড়ির লোক বাড়ির লোক' ভাব দেখালে একটু খুশি হয়। ওতে আর নিজেদের কী লোকসান?'

সুনয়না অবশ্য এই 'উদার' কথার প্রতিবাদ করতে বসে না।

কারণ জানে, বসলেও জিততে পারবে না। তবে মনে মনে বলে, 'ওদের খুশি করবার' দায়টাই বা কী? তার জন্যে কী ওরা যখন খুশি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার অভ্যাসটা ত্যাগ করবে?

কই গো, বলুন কফির কৌটো কোথায়?'

সুনয়না বলে, 'যাচ্ছি ওটা আমিই করে দিচ্ছি। তুই চা তৈরি করগে।'

এখন এই মুহূর্তে বলতে ইচ্ছে হয় না, তুই ওই কৌটোর ঢাকনি খুলে রেখে রেখে জিনিসটার বারোটা বাজিয়ে দিস। জমে বসে থাকে। তাই তুলে রেখেছি। এখন আর কোনো ছোটো কথা, তুচ্ছকথা কইতে ইচ্ছে করছে না।

একথাও বলতে ইচ্ছে করছে না, কতক্ষণ এসেছে তোর দাদাবাবু?

তাহলেই হয়তো ও একরাশ কথা বলতে বসবে। যেটা এই মুহূর্তে অসহ্য লাগবে।

তবু লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটার ধৃষ্ট কথা এড়ানো গেল না। অকারণেই আঁচল দুলিয়ে বলে চলে গেল, 'এনারা মনে হচ্ছে দাদাবাবুর সব 'ফ্যান' বন্ধু। তাতেই শুধু চা-কফিতেই সন্তোষ। অন্য সব লেখক বন্ধুটন্ধু হলেও মুশকিল। তাদের তো শুধু ওতেই শানাবে না। বোতল গেলাস লাগে!

উঃ! ঈশ্বর রক্ষা করেছেন, সুনয়নার হাতের সামনে ছুঁড়ে মারবার মতো কিছু ছিল না। তা অনেক সময়ই ঈশ্বর সুনয়নাকে এমন রক্ষা করেন। এখনো ভাগ্যিস করলেন!

ঠিক এই সময়ই পুরন্দর ভিতরে ঢুকে এল। বলে উঠল, কী? ধ্যানভঙ্গ হল? এত ডুবে গিয়ে কী পড়া হচ্ছিল। বই বলে তো মনে হল না।

সুনয়না একথার কোনো উত্তর না দিয়ে শান্তভাবে বলল, বাইরে চা-কফির সঙ্গে কী পাঠাতে হবে? একটু বলে গেলে ভালো হয়!....

এমন কথা সুনয়না কখনো বলে না। আজ বলল।

অথচ বলে গেলে তো ভালোই হয়। খুব ভালো হয়। কারণ পুরন্দরের কখন যে কী খেয়াল হয়। কখনো অভ্যাগতদের আপ্যায়নের ত্রুটি ধরে — পরে দারুণ খুঁৎ খুঁৎ করে, অথবা তাদের সামনেই বলে বসে। পরে কখনো তারা বিদায় নিলে, বলে, 'আঃ, ওদের জন্যে আবার এতো করার কী ছিল? একপাল হতভাগার দল।'

কখনো সুনয়না পুরন্দরের বন্ধুদের সামনে বেশিক্ষণ বসে থাকলে, যেন অস্বস্তি বোধ করে। পরে বলে, 'কাজকর্ম ফেলে এতোক্ষণ বসে থাকবার কী দরকার ছিল তোমার? একবার সৌজন্য দর্শন দিয়ে এলেই যথেষ্ট হত।'

আবার কখনো পরে ক্ষুব্ধ অভিযোগ করে, 'তুমি ওদের কাছে গিয়ে একটা ঝাঁকিদর্শন দিয়েই ব্যস চলে এলে, আর গেলে না। ওরা কী ভাবল বলতো?....ওদের বৌ টৌ তো আমার সঙ্গে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা আড্ডা দেয়।'

এ লোকের মেজাজের পারা যে কখন কোন্‌খানে ওঠে-নামে বোঝা দায়।

আচ্ছা, সুনয়না হঠাৎ এমন বোকার মতো একটা কাজ করতে বসল কেন? মানেহীন! কারণহীন বুদ্ধিহীন! অথচ কদিন ধরে করেও চলেছে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে।

উতঙ্ক উপাধ্যায়ের লেখা ওই 'জীবনীমূলক' উপন্যাসখানার পাণ্ডুলিপিটা সুনয়না 'কপি' করে চলেছে।

কেন? তা জানে না সুনয়না।

লেখাটা পড়ে শেষ করবার পর যখনি ভেবেছে, এইবার ওর কাছে কথাটা পাড়ি তখনই যেন ভয়ঙ্কর একটা দামি জিনিস হারিয়ে ফেলবার ভয় সুনয়নাকে পিছিয়ে দিয়েছে। মনে হয়েছে, যে-ই পুরন্দরের কাছে একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলে নিয়ে বলবে, 'বাল্যসখীটা তোমার নামের জোরের কাছে জিনিসটা সমর্পণ করে দিয়ে গেছে, এর একটা গতি করে দিতে হবে। নইলে কবিপত্নীর মুখ থাকবে না।' পুরন্দরের হাতে ধরে দেওয়া মাত্রই তো জিনিসটা চিরতরে সুনয়নার হাতছাড়া হয়ে যাবে। যাবে চোখছাড়া হয়ে।

চিরতরেই ভেবেছে! ভেবেছে ওই উন্নাসিক আর দায়িত্ববোধহীন মানুষটার কাছে সুনয়নার প্রাণতুল্য এই জিনিসটার আর মূল্য কী? হয়তো-বা চেষ্টাই করতে ভুলে যাবে। 'চক্রবাল' অফিসের কোনো একখানে ফেলে রেখে দেবে। সেখানের অসংখ্য কাগজপত্রের তলায় সমাধি ঘটে যাবে জিনিসটার।

সুনয়না কি সাহস করে ওই অসহিষ্ণু স্বভাবের মানুষটাকে বারবার তাগাদা দিতে পারবে? আর পুরন্দরও তখন সেটাকে খুঁজে দেখার ক্লেশ স্বীকার না-করেই বলে দেবে, 'আরে দুর্! ওটা কি আবার একটা লেখা? রাবিশ! ভূষিমাল।....এই ধরনেরই তো ভাষা ওর।'

হারিয়ে ফেললেও কুণ্ঠিত হবে না। অপ্রতিভ হবে না। হয়তো সুনয়নার ক্ষুব্ধ অভিযোগের উত্তরে অনায়াসেই ব্যঙ্গহাসি হেসে বলে উঠবে, 'ইস, ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্যের তো তাহলে দারুণ একটা ক্ষতি হয়ে গেল।'

সুনয়না যেন সেই ব্যঙ্গহাসিমাখা মুখটা দেখতেই পায়। অথচ সবটাই তার কল্পনা। সুনয়না তবু সেই কল্পনাটাকে নিয়েই মনে মনে একটা অধ্যায় রচনা করে বসেছিল। তারই ফলে বোকামি আর বেহিসেবি অসমসাহসিকতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছিল, ঠিক আছে, অরিজিন্যালটা ওর হাতে তুলে দেব না, একটা কপি করে ফেলি!'

এই কপিটা যে আজকের যুগে একটা জলভাত, সুনয়না ওটা অনায়াসেই কোনোখান থেকে জেরক্স কপি করিয়ে নিতে পারত—যেখানে সেখানেই তো ও ব্যবস্থা রয়েছে, সেটা খেয়ালে আসেনি। সুনয়না কাগজ কলম নিয়ে বসেছিল।

এই বসার পিছনে কি আরো একটি মনোভাব কাজ করেনি সুনয়নার? টুটুদার হাতের ওই মুক্তোর মতো অক্ষরগুলো কি আরো একবার চোখের সামনে মেলে ধরতে ইচ্ছে হয়নি?

পড়তে পড়তে তো বারে বারেই কোথায় হারিয়ে গেছে সুনয়না। হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে।....দেখেছে কেবলমাত্র সেই কৈশোরপর্বেই নয়, নয়না-র অস্তিত্ব ধরা দিয়েছে উতঙ্ক উপাধ্যায়ের প্রথম জীবনলিপিতে।

পড়তে পড়তে পড়া থামিয়ে সুনয়না অবাক হয়ে বসে ভেবেছে, আচ্ছা, আমি কি সত্যিই এত বোকা ছিলাম?....আমি কিছুতেই কেন টের পাইনি?

তারপর? তারপর অবাক হয়েছে এই ভেবে—

জেলখানার জীবনটার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ইতিহাসটি কী, সরস কৌতুকের সঙ্গে লিখেছে টুটুদা। নিজেকে নিয়ে, নিজের মর্মান্তিক লাঞ্ছনা যন্ত্রণা আর নির্লজ্জ অপমানের কাহিনী এমন সরসতার সঙ্গে লেখা যায়?

এই ভাষাটা টুটুদার আর একটা পরিচয় নয়নার সামনে ধরে দেয়। উজ্জ্বল আর জ্যোতির্ময় সেই পরিচয়। 'কিছুতেই ভাঙব না।' অথচ ওরা টুটুদার দেহটাকে একবারে ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়েছে।

কীরকম একটা হাহাকার আসে। আর সেই হাহাকারের শূন্যতা। একটা কিছু করবার প্রেরণাতেই এই বোকামি।

শুধু তো অনেকটা লেখা লিখে ফেলা নয়, পুরন্দরের অনুপস্থিতিতে লিখতে হচ্ছে। সবটা না-হলে ওর সামনে উদ্‌ঘাটিত হওয়া চলবে না। মনে হয়েছে, পুরন্দর একবার দেখতে পেলেই যেন সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

দেখলেই হয়তো বলে বসবে, আরে শুধু শুধু এত খাটতে যাবে কেন? যদি এই আশ্চর্য-মহান ম্যানাসক্রিপটি ভবিষ্যতে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে সুরক্ষিত রাখবার প্রশ্ন আসে, তো দাও জেরক্স করিয়ে এনে দিচ্ছি। আমাদের অফিসে দু-দুটো মেশিন রয়েছে।....

তারপর কী হবে না-হবে, সুনয়নার অজানা।

কারণ সুনয়নার এই মানুষটির আচার-আচরণ জানা। বিবাহোত্তরকালে প্রথম জীবনের সেই বেদনাময় স্মৃতিটি কি কোনোদিনই ভোলবার?

বিয়ের আগে চন্দননগর থেকে প্রকাশিত 'মুকুলিকা' নামের যে পত্রিকার তিনটে সংখ্যায় সুনয়নার লেখা তিনটে গল্প ছাপা হয়েছিল তার একটামাত্র করেই তো কপি ছিল তার কাছে।

সেই দুর্লভ বস্তুটি হঠাৎ কেমন করে তার ট্রাঙ্কের তলায় লুকোনো ঠাঁই থেকেও আবিষ্কার করে বসেছিল সুনয়নার ননদ।....তখন তো শাশুড়ি-ননদ-জা-ভাসুর-সম্বলিত সংসারেই এসে পড়েছিল সুনয়না।

মুকুলিকা-র সেই কপি তিনটে নিয়ে হৈচৈ তুলে দিল ননদ! ও বাবা, তোমারও এসব বিদ্যে আছে? ও ছোড়দা, তাহলে একখানি লেখিকার সঙ্গেই গাঁটছড়া বেঁধে বসেছ....জানতে না? বলো কী গো? তাহলে পড়ে দেখো গিন্নির কলমের কারিকুরি।

পুরন্দর অগ্রাহ্যভরে সেগুলো হাতে নিয়ে হেসে-হেসে বলেছিল, 'কী ম্যাডাম?

আমার অন্নটি মারবেন না তো, দুটো পদ্যটদ্য লিখে করে খাচ্ছি, হঠাৎ গদ্যের গদা হাতে নিয়ে রণভূমিতে এসে হাজির হবে?' তারপর বোনকে বলল, 'আচ্ছা বাসে যেতে যেতে পড়ে দেখা যাবে। তো ডবল রুমাল রাখতে হবে না কী পকেটে? কী ম্যাডাম? মহিলা-রচিত কাহিনী বলে কথা!'

তখন তো পুরন্দরের বাসেই ঘোরাফেরা, অফিস যাওয়া।

বোন একটু শঙ্কিত হয়ে বলেছিল, 'বাসে কেন ছোড়দা? তুমি যা ভুলো। যদি বাসে ফেলে আসো?'

ছোড়দা উদাত্ত গলায় বলেছিল, 'আরে বলিস কী? এই জিনিস ভুলে ফেলে আসব? গিন্নির মহিমা। বন্ধুবান্ধবদের দেখিয়ে বেড়াতে হবে না?'

তারপর?

তারপর কতদিন পরে যেন বোন বোধহয় বিবেকের বশেই বলেছিল, 'গিন্নির লেখা পড়েছিস ছোড়দা?'

ছোড়দা বলল, আর বলিস না, এক বন্ধু ফস্ করে টেনে নিয়ে গেল পড়বে বলে। বলল, 'তুই তো দেখছি খুব লাকি। বউ একে সুন্দরী, তায় আবার লেখিকা।'

ব্যস। ওই পর্যন্তই।

মুকুলিকার সেই কপি তিনটি আর কোনোদিন হাতে আসেনি সুনয়নার। কী করে আসবে? দায়িত্বজ্ঞানহীন বন্ধুটা যদি হারিয়ে ফেলে 'হ্যা-হ্যা' করে হাসে।

তুচ্ছ সেই গল্প তিনটের সাহিত্যমূল্য অবশ্যই ছিল না কিছু। যে গল্পদের দেখে টুটুদা হেসে-হেসে বলেছিল, 'তুই তো বেশ সুখের গল্প লিখছিস। তাহলেই হবে।'....কিন্তু সুনয়নার কাছে তো তার একটা পরম মূল্য ছিল। জীবনে প্রথম ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার রোমাঞ্চ! তার মূল্য যে কী বলে বোঝানো যায়?

পুরন্দর অবশ্য তখন নবপরিণীতার কাছে মান রাখতে বলেছিল, কোন বছরের কোন সংখ্যার আর কোথা থেকে প্রকাশ হয়েছিল আমায় একটু লিখে দিও তো। জোগাড় করা শক্ত হবে না।

কিন্তু সুনয়না বলেছিল, ঠিকানা মনে নেই।

মনে কেন থাকবে না? সে তো হৃদয়পটে খোদাই করা ছিল। তবু বলেছিল। হয়তো আরো বানানো অসার কথা শোনাবার ভয়েই তার ওই মিথ্যাভাষণ।

সুনয়না এখন অতএব-মূল্যবান জিনিসটিকে হাতছাড়া করবে না।

হঠাৎ টের পেল, পুরন্দর ফিরেছে। বেশ জোরে জোরে কার সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলছে। তার মানে একা ফেরেনি।

তাড়াতাড়ি খাতাপত্র গুটিয়ে তুলে ফেলে অবহিত হয়ে বসল। কারো কোনো কথার উত্তরে পুরন্দর বলছে, মাথা খারাপ ও আমার দ্বারা হবে না।....সবাইকে দিয়ে কী সব হয়? আমি কি আপনাদের গাঙ্গুলির মতো সব্যসাচী?....ওকথা ছাড়ুন।....কি? বাড়িতে চলে আসছেন? এসে বাড়তি কোনো লাভ হবে না, ভাই? আচ্ছা....

সুনয়না থমকাল। সঙ্গে কেউ আসেনি। আসামাত্রই ফোন এসেছে।....ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সঙ্গে কাউকে নিয়ে আসা মানেই সবকিছুর ছন্দপতন। হাতমুখ ধোয়া হবে না পুরন্দরের। ঘরে বসে গুছিয়ে চা খাওয়া হবে না, বিশ্রাম হবে না। হয়তো রাত দশটা পর্যন্তই একইভাবে আড্ডা চলবে। আর চা চলবে। অনেক সময় একাধিকজনও তো আসে।

সুনয়না বলল, 'কী হল? এসেই ফোন?'

'আর বোলো না। এতক্ষণ অফিসে জপিয়েছে, আবার বাড়িতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে খোদ মালিকের পুত্তুরকে দিয়ে বলাচ্ছে।'

সুনয়না জানে, এ-সময় নির্লিপ্ত ভাব দেখালে পুরন্দর আহত হবে। তাই আগ্রহ দেখাতেই হয়, 'কী ব্যাপার? কী নিয়ে এত জল্পনা?'

'তোমার কবিবরকে এখন থেকে সব্যসাচী হতে হবে। বুঝলে? পুজো সংখ্যায় উপন্যাস লিখতে হবে। সেটা নাকি দারুণ একখানা স্টান্ট হবে ''চক্রবাল''-এর। কবি পুরন্দর এবার গদ্যের কলম নিয়ে অবতীর্ণ হচ্ছেন। বলে এসেছি ওসব গদ্যটদ্য আমার আসে না, তাছাড়া উপন্যাস! অসম্ভব। অত ধৈর্য নেই। তবু আবার—'

সুনয়নার বুকটা যেন হিমহিম হয়ে যায়।

সাফল্য কারো পিছনে ধাওয়া করে বেড়ায়, আর কারো দিকে ফিরেও তাকায় না!

টুটুদা বলেছে, 'চোখের দৃষ্টিটা সামান্য থাকতে থাকতেও যদি বইটা ছাপা হয়—'

অথচ এই লোক সেই জিনিসকে ঠেলে দরজার বাইরে বার করে দিতে চাইছে।

পৃথিবী বড়ো অকরুণ।

তবু কষ্টে হেসে বলল, 'তা আপত্তিটা কিসের? সাধা কলম, ওকে যেদিকে চালাতে চাইবে সেইদিকেই চলবে। আমার তো বাবা মনে হয় পদ্যই শক্ত জিনিস। গদ্যটা বরং সোজা।'

তাই নাকি?

পুরন্দর তার সুন্দরী স্ত্রীর ওই হাসি-হাসি মুখটার দিকে তাকিয়ে তার গালে একটি সোহাগের টোকা মারে। আজ খুব আহ্লাদের মেজাজ। অফিসে তাকে ওই 'উপন্যাস উপন্যাস' করে দারুণ ঝুলোঝুলি করেছে। এবং রীতিমতো একটি মোটা অঙ্কের দক্ষিণারও আভাস দিয়েছে। বলেছে, পুরন্দরের হাত থেকে যা বেরোবে তা-ই অসাধারণ হবে।

স্তুতিবাক্যের মতো শ্রুতিসুখকর আর কী আছে? অন্তত পুরন্দরের মতো প্রকৃতির লোকের কাছে।

আজ একটু সমে রয়েছে, তাই শুধুই সোহাগের টোকা। তা নইলে বাড়িতে একটা চোখকান-খোলা প্রাণীর উপস্থিতি বিস্মরণ হয়ে হয়তো আদরের বন্যা বইয়ে দিত। হঠাৎ-হঠাৎ এরকমে লজ্জায় ফেলে পুরন্দর সুনয়নাকে।

এখন সুনয়না স্বস্তির গলায় বলল, 'আমার তো তাই মনে হয়। গল্প উপন্যাস এরা তো চোখের সামনে ঝাঁক ঝাঁক ছড়ানো রয়েছে। বুঝেসুঝে কোনো একটাকে ধরে ফেলে কলম নিয়ে বসে পড়লেই হল। সর্বদা শোনা-শোনা কথা, দেখা-দেখা চরিত্র—এরাই সাহায্য করবে। আর তোমার এই কবিতা। উঃ! তার প্রতীক, তার ভাবভাবনা আকাশ-বাতাস থেকে আহরণ করতে হয়। চেষ্টা থাকবে যাতে কিছুতেই না আমাদের মতো ভেতো লোকেদের সেই প্রতীকটতীকগুলো মগজে ঢুকে পড়ে। আমার তো মাঝে-মাঝে তোমার কবিতাদের বোঝবার চেষ্টায় মগজে গজাল ঠুকতে হয়।....গদ্যকে কি আর ততটা দুর্বোধ্য করে তোলা যাবে?

হেসে ওঠে পুরন্দর। বলে, 'আপনার বিনয়টি খুবই প্রশংসনীয়, ম্যাডাম।....তো তুমি তো সেই একসময় গপপো-টপপো লিখতে না? অভিজ্ঞতা আছে এখন আর লেখ না কেন? লিখলেই পারো, অত যখন সোজা ব্যাপার।'

এও অবশ্যই লীলাচ্ছলে তোয়াজ মাত্র।

তবু এটা শোনামাত্রই সুনয়নার মধ্যে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে যায়।....

আচ্ছা, এই তো একটা পথ রয়েছে।

পুরন্দরের কাছে কুণ্ঠিত প্রার্থনায় নিচু হবার জন্যে তার 'মুড' বোঝবার চেষ্টা করতে মাহেন্দ্রক্ষণ খুঁজতে হবে না।....মন্দ কী? দোষই-বা কী? ম্যানেজ করে নেবার জন্যে না-হয় আর-একটা পথ আবিষ্কার করা যাবে।

হঠাৎ মুখে একটু রহস্যময়তা এঁকে বলে, 'ভাবচি আবার লিখব। আর এখন তো ছাপানোর কোনো প্রশ্নই নেই। বরের অফিসে ধরে দিলেই তারা 'কবিপত্নীর' রচিত সাপব্যাঙ যাই হোক ঠিক ছেপে দেবে।'

'এত আস্থা?'

'নয়তো কী? তোমায় চটালে ওদের চলবে? ঠিক আছে। এই আজ থেকেই ধরছি কলম।'

'সেরেছে। তার আগে আমায় কিছু খেতেটেতে দেবে তো? নাকি?'

সুনয়না তেমনি কৌতুকোজ্জ্বল মুখে বলে, 'অত ভয় পেও না। গদ্যর গদা নিয়ে যারা রণভূমিতে নামে, তারা অতটা বাস্তববোধশূন্য হয় না। চলো।'

ওই 'গদ্যের গদা' কথাটা একদা পুরন্দরেরই আবিষ্কার। তবে সে কী আর ওর মনে আছে? না শুনে মনে পড়ল?

ওই কপি করাটা নিয়ে সুনয়না কদিন রান্নাঘরে তেমন সময় দিতে পারছিল না। তবু মুখরক্ষে, আজ পুরন্দরের প্রিয় চিংড়ির কাটলেট বানিয়ে রেখেছে। অবশ্য জ্যোৎস্না আজকাল অনেক কিছুই শিখে ফেলেছে। সুনয়নাকে সময় দিতে হয় কমই।

আজ অবশ্য দুদিকেই মুখরক্ষা।

পুরন্দর তার প্রিয় খাদ্যবস্তুটি দেখে উৎফুল্ল হয়ে খেল। এমন তো অনেকদিন হয়, সুনয়নার অনেক যত্নে তৈরি খাবারটাবার অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকে। পুরন্দর অন্য হয়তো কোথাও 'দারুণ' খেয়ে আসে।

সুনয়না রাগ দেখিয়ে বলে, রাজ্যজুড়ে তোমার ভক্ত। সব সময় তোমার 'দারুণ' খাইয়ে দেবার তাল করে বসে থাকে। আমি বেচারি ক্রমেই ফালতু হয়ে যেতে বসেছি।

তবে সবদিনই কি রাগ দেখাবার ভরসা পায়? সেও তো মুড্ বুঝে।

অপমানিত হবার বড়ো ভয় সুনয়নার।

তার রাগ অভিমান কৌতুক—এগুলো যদি অপরপক্ষের ভ্রূকুটির সামনে পড়ে মূল্যহীন হয়ে যায়, তার থেকে অপমান আর কী আছ?

নেহাতই অদ্ভুত একটা খেয়ালের বশে যে অর্থহীন কাজটা করে চলেছিল সুনয়না, হঠাৎই আরো অদ্ভুত আর দুঃসাহসিক একটা পরিকল্পনায় ঝড়ের বেগে সেটা শেষ করে ফেলছে সে! অদ্ভুত তো বটেই, দুঃসাহসিকও। তবু সেই পরিকল্পনাটাকে ঘিরে একটা মায়াজাল রচনা করে চলেছে সুনয়না। দোষ কী? ক্ষতি কী? সুনয়না তো আর নিজের নামে উপস্থাপিত করতে বসবে না! অথচ 'নিজেকে' তার মধ্যে উপস্থাপিত করার ভানে—

পুরন্দর এসে ঘরে ঢুকল।

তার ভক্তবৃন্দরা বিদায় নিয়েছে তাহলে। খুব তো হৈহৈ চলছিল।

সুনয়না তাড়াতাড়ি কাগজ-কলমদের চাপা দিল।

পুরন্দর বলে উঠল, ব্যাপার কী বলো তো? কোনো থিসিস-টিসিস করছ নাকি? শুনলাম সারাক্ষণ নাকি 'পাতা-পাতা' লিখে চলেছ।

'শুনলে? কার কাছে শুনলে?'

শোনাবার লোকের অভাব? ঘরেই তো মজুত। সংবাদে প্রকাশ, 'বৌদিদির যে ঘাড়ে কী ভূত চেপেছে, রাতদিন খালি পাতা-পাতা লিখছে আর লিখছে।'

সুনয়না বলল, ওকে তোমাদের 'চক্রবাল' অফিসে একটা রিপোর্টারের চাকরি জুটিয়ে দাও না! ওরও ভবিষ্যৎ খুলে যাবে, আমারও হাড়ে বাতাস লাগবে।

পুরন্দর বলল, 'তখন হয়তো আবার দেখবে হাড়ে হলুদ হয়ে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নাবিহনে তোমার ভুবন অন্ধকার। তো এত কী লিখছ?'

সুনয়না তো এসব প্রশ্নের জন্যে তৈরিই আছে। অতএব উত্তরও তৈরি। হার মানতে তো রাজি নয়। বলে ওঠে, 'কেন, উপন্যাস! প্রায় শেষের মুখে টেনে নিয়ে এসেছি।'

'উপন্যাস! উপন্যাস লিখছ!'

পুরন্দর যেন আকাশ থেকে পড়ে।

সুনয়না অবশ্য অনায়াস ভঙ্গিতে বলে, 'হ্যাঁ। সেটাই ধরে ফেললাম। ভেবে দেখলাম, ছোটোগল্পের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকেই হারিয়ে যেতে পারে। তার থেকে জম্পেশ একখানা উপন্যাসই ভূমিষ্ঠ করানো যাক। যেই তুমি নির্দেশ দিলে, 'পুরনো বাতিকটা ছাড়লে কেন? আবার একটু লেখালেখি করলেই পারো। সময় কাটানোর মহৌষধ,' সেইমাত্রই ঝুলে পড়লাম। তারপর আর কি, সেই যে বলে না, ধর তক্তা মার পেরেক! সেই নীতিতে এই কদিনেই প্রায় আস্ত একখানা উপন্যাস লেখা হয়ে গেল।'

হ্যাঁ, এইসব সংলাপ মজুতই ছিল। সুনয়না ঠিক করে ফেলেছিল সেদিন, এই 'কলার ভেলাতেই' পার হবার চেষ্টা করতে হবে তাকে।

পুরন্দর চোখ কপালে তুলে বলে, মাই গড! সেদিনের সেই কথাকে তুমি সত্যি ভেবেছিলে নাকি?

সুনয়না পুরন্দরের ভঙ্গি নকল করে বলে, 'মাই গড। পতিদেবতার কথা মিথ্যা ভাবব নাকি? তোমার কি মনে হয়? পতি পরম গুরুর কালটা আমরা পার হয়ে এসেছি? উঁহু! ও আমাদের হাড়ে-হাড়েই রয়ে গেছে এখনো। তো যাক, আদেশমাত্রই একখানা মারকাটারি উপন্যাস লিখে ফেলা গেছে। এইবার তুমি সেটি বগলদাবা করে নিয়ে গিয়ে তোমার শ্যামলবাবুর অফিসে জমা দিয়ে দেবে। বলবে, 'গিন্নির লেখা!' অবিলম্বে এর প্রকাশ প্রয়োজন! নচেৎ কবির প্রেস্টিজ খতম।

'আমি ওই লেখাটি নিয়ে গিয়ে ছাপতে বলব?'

'নিশ্চয়ই। কেন নয়? তুমি ছাড়া আবার কে? এ-যুগের নিয়মই তো নিজের

ঢাক নিজে পেটানো। ওই পেটানোর জোরেই তুমি অনায়াসেই তোমার গিন্নিকে একখানা উচ্চমানের লেখিকা বানিয়ে ফেলতে পারো। একটু চৌকস সমালোচকের হাতে পড়াতে পারলেই আর সুনয়না রায়ের অন্ন মারে কে?'

'চমৎকার। কী সাপ-ব্যাঙ লিখে রেখেছ তার ঠিক নেই। পাঁচদিনে একখানি সুবৃহৎ উপন্যাস! উঃ।'

সুনয়না আহত হবার ধার দিয়েও গেল না। বরং অবাধ গলায় বলে উঠল, 'সাপ-ব্যাঙই বা ভাবা হচ্ছে কেন মশাই? 'মেয়ে লেখক' বলে? তোমরা তো দেখি কথা বলার সময় ওই শব্দটিই ব্যবহার করো। 'সাহিত্যিক' তো দূরস্থান, 'লেখিকা' বলতেও নারাজ। মেয়ে লেখক। আর আমি যদি বলি সত্যিই একখানা মারকাটারি সৃষ্টি হয়েছে! বলতে আর কি? তা দেখো....হয়েছে কি না।'

'তা যাচাইটা করল কে?'

'কে আবার? নিজেই! সুনয়না এখন হেসে গড়িয়ে পড়ে বলে, ঠাট্টা রাখছি বাবু। আসলে নিশ্চিত জানি, তোমার গিন্নির লেখা শুনলে তোমার শ্যামলবাবু 'না' করতে পারবে না। চক্ষুলজ্জার দায়ে ছাপবেই। নিজের পয়সা খরচা করে গিন্নির বই ছাপাচ্ছ। এটাও তো হতে দেওয়া যায় না। মান থাকবে না। পাবলিশার একটা আবশ্যক। তো একবার তোমার ওই 'চক্রবাল' প্রকাশনী থেকে একখানা বইকে ঝকঝকে মূর্তিতে বার করতে পারলে আমার ভবিষ্যৎও ঝকঝকে হয়ে যাবে।'

'নাঃ। তোমার খিদমৎগারটি দেখছি ঠিকই বলেছে, 'বৌদিদির ঘাড়ে হঠাৎ ভূত চেপেছে।'....হায়। কে ভেবেছিল সেই একদিনের অসতর্ক উক্তিতে এমন একখানা বিপজ্জনক অবস্থা ঘটে বসবে। ছোটোগল্পটল্প দু-একটা হলে না-হয় 'চক্রবাল'-এর কোনো রবিবারের পাতায় চালান করে দেওয়া যেত।'

সুনয়না বলে ওঠে, 'উঁহু। বলেছি তো, আর ওসব পাতায়-ফাতায় নয়। বই একখানা চাই। এবং চটপট। উঃ। যার জন্যে এইরকম ঝড়ের বেগে কলম চালিয়ে মরেছি।'

কিন্তু সুনয়না কি মিছিমিছি বানানো কথা বলছে? বই একখানাই যে চাই তার। এবং চটপট। আর তার জন্যেই ঝড়ের বেগে কলম চালিয়ে চলেছে। টুটুদার বইটা যে খুব তাড়াতাড়ি ছেপে বার করা দরকার। কেবলমাত্র নিজের হৃদয়ের কাছেই তো দায়বদ্ধ নয়, ছবির কাছেও যে দায়বদ্ধতা।

সেই দায়বদ্ধতার দায়েই-না সেদিনকার সেই হঠাৎ মাথায়-খেলে-যাওয়া প্ল্যানটাকে আঁকড়ে ধরেছে।

যখনি ভেবেছে পুরন্দরের সামনে আবেদনের ভিক্ষাপাত্রটি ধরতে কোন্ ভাষা রচনা করবে, তখনই যে সমস্ত হৃদয় বিমুখ হয়ে উঠেছে। তার থেকে এই ভালো। এই পথেই চলা যাক।

পুরন্দর হতাশের ভান করে বলল, 'নিজে মরেছ এবং এই হতভাগাকেও মেরেছ।....কই দেখি তোমাব সেই মারকাটারি! আমার গলায় কোপ বসানোর জন্যে যেটিতে শান-পালিশ দেওয়া হয়েছে বসে বসে!'

নাঃ। মুড খুব খারাপ নেই এখন মনে হচ্ছে। না-হলে এতক্ষণ এ-প্রসঙ্গ চালিয়ে যাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। বাচালতা করবার মতো পরিস্থিতিও থাকে না সব সময়।

এখন পুরন্দর বলামাত্রই শুভস্য শীঘ্রম্ নীতিতে সুনয়না নিজের বহু পরিশ্রমের ফল সেই কপি-করা কাগজের গোছাটি কাছে টেনে নিয়ে তার আবরণ মুক্ত করে। বহু যত্নে, বহু পরিপাটি করে গুছিয়ে রেখে চলেছে সুনয়না। পুরন্দরের হাতে তুলে দিতে হবে তো? এলোমেলো রাখলে চলবে না।

খোলামাত্রই সুনয়নার গোটা-গোটা পরিষ্কার অক্ষরগুলো যেন ঝলসে ওঠে। পুরন্দর একনজর দেখেই আঁৎকে উঠে বলে, 'আরেব্বাস, এই এত লিখে ফেলেছ? আমার ঘরের মধ্যে যে এমন একখানা প্রতিভা লুকনো ছিল, তা তো জানতাম না!'

সুনয়না একটু হেসে বলে, 'জানবার চেষ্টা থাকলে তো?'....

তারপর বলে, 'লেখাটায় কিন্তু আমি একটা ছদ্মনাম ব্যবহার করেছি।'

'ছদ্মনাম!'

পুরন্দর ভুরু কুঁচকে বলে, 'ছদ্মনাম কেন? নামের জন্যেই তো এত কাণ্ড!'

সুনয়না বলল, 'সে তো ঠিকই। নামই তো সব। তবে ভেবে দেখলাম, এই প্রথম উপন্যাসখানি যদি নেহাতই ভদ্রলোকের খাদ্যযোগ্য না হয়, তাহলেই তো ভবিষ্যতে 'লেখিকা' হওয়ার স্বপ্নের সমাধি। দ্বিতীয়বার তো আর সেই নামটি নিয়ে আবার হাটে এসে উঁকি মারা চলবে না। এতে লেখাটা জলে গেলেও, নামটা জলাঞ্জলি দেওয়া হবে না।'

'অদ্ভুত ভাবনা তো।'

'বাঃ, অদ্ভুত কেন? সাহিত্যে ছদ্মনাম কী নতুন ব্যাপার?'

'সে আলাদা।'

'আলাদা কিছুই নয়, ওই একই ব্যাপার। ছদ্মনামের আড়ালে থেকে প্রথম প্রতিক্রিয়াটা দেখে নেওয়া। হেনস্থা যদি কিছু হয় তো ওই ছদ্মটারই হোক।....তবে যদি এমন ঘটে,—'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম'— তাহলে হয়তো ওই ছদ্মনামটাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে যায়।'

'হুঁ। এ-নিয়ে অনেক গবেষণা করেছ দেখছি।'

বলে পুরন্দর আবরণ-উন্মুক্ত প্রথম পাতাটায় গোটা গোটা আর বড়ো-বড়ো অক্ষরে লেখাটায় চোখ ফেলে।

'পথ জনহীন! এটাই তোমার মারকাটারির নাম নাকি?'

'হুঁ তো।'

'নামটা তো বিশেষ ক্যাচি নয়। হঠাৎ এ-ধরনের একটা নাম। মানেটা কী হচ্ছে?'

'কি আর হচ্ছে? ধরে নাও নিঃসঙ্গ পথিক। তা ও নামের বই তো আগেই লেখা হয়ে বসে আছে। ভালো ভালো লেখকেরা ভালো ভালো সব নামগুলো আগে থেকেই দখল করে রেখেছেন। ....ধরো এখন কোনো নতুন লেখক তার নতুন বইয়ের নাম রাখতে পারবে 'নষ্টনীড়', কিম্বা 'চরিত্রহীন'? কী দারুণ নামগুলো!'

কথা যেন একটু বেশিই বলছে সুনয়না। হয়তো নার্ভাসনেসটা ঢাকতে। এখন ভিতরে ভিতরে ঘামছে। শেষরক্ষা করে উঠতে পারবে তো? শেষরক্ষা মানে মানরক্ষা। অসহিষ্ণু-স্বভাব লোকটা যদি হঠাৎ রেগে ওঠে। যদি বলে, আমার দ্বারা ওসব বলাটলা হবে না। বই ছাপার এত শখ হয়ে থাকে তো টাকা দিচ্ছি ছাপিয়ে নাও। তেমন কথা বলে ওঠা পুরন্দরের পক্ষে খুব অসম্ভব নয়ও। তাহলে? তাহলে কি আর এইরকম-লীলাকৌতুকের ভঙ্গিটাই চালিয়ে চলতে পারা যাবে? যদিও এই ভঙ্গিটাই সুনয়নাকে সব সময় বাঁচিয়ে চলে। নচেৎ পুরন্দর হঠাৎ-হঠাৎ এমন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি অথবা বিরক্তির ভঙ্গিতে কথা বলে, সে-সবদের সিরিয়াসভাবে নিয়ে বসে মান-অভিমানে ভেঙে পড়লে আর সংসার করা হত না সুনয়নার।

অথচ সেটা না হলে যে কী হতে পারে, তা জানা নেই সুনয়নার। ভাববার সাহসও নেই। পায়ের তলার মাটি কোথায় তার?

....তেমন কিছু বিদ্যের সম্বল নেই। আর নেই মেয়েদের জীবনের শেষ আশ্রয় বাপের বাড়ি নামক জায়গাটা।

সুনয়না তাই তার গা-টাকে পদ্মপাতায় ঢেকে রেখেছে। পদ্মপাতায় জল বসে না।

পুরন্দর কভারের মোড়কটা ওল্টাল।

তারপরেই আবার থমকাল। ভুরুটা একটু কোঁচকাল। তারপর বলল, 'এটা কার নাম?'

'বাঃ ওই তো, ওইটা তো ছদ্মনাম।'

'এইটা ছদ্মনাম। উতঙ্ক উপাধ্যায়। এ আবার কী ধরনের নাম?'

'কেন, বেশ তো একখানা অন্য ধরনের নাম।'

'একজন মহিলার গ্রহণযোগ্য ছদ্মনাম?'

'বাঃ, মহিলা বলে ধরা পড়তে চাই না বলেই তো এই পুরুষ নামের আড়াল। কালের বদল ঘটেছে তো। একদা লেখাটা সহজে ছাপা হবে বলে পুরুষেরা মেয়েদের নাম নিয়ে সম্পাদকদের মন গলাতে চেষ্টা করত। স্বয়ং অচিন্ত্যকুমারই তো 'নীহারিকা' নাম নিয়ে—। এখন উল্টোপুরাণ।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে খুব জানা আছে।'

এবার একটু অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায় পুরন্দরের কণ্ঠস্বরে। বলে, 'তাহলেও এটা কীরকম? এ কি একটা নাম? নামের একটা মাধুর্য থাকবে না?'

মাধুর্য! মাধুর্য নিয়ে কী হবে? নতুনত্ব হলেই হল। এখন সেটাই প্রধান।'

মনে-মনে ভাবল, 'এখন' বলে নয়, ওদের বংশেই এই নতুনত্বের চাষ ছিল। ওর ঠাকুরদার নাম ছিল আদ্যন্ত উপাধ্যায়, বাবার নাম ছিল অশঙ্ক উপাধ্যায়, আর ওর নাম তো এই। মাধুর্যের বালাই নেই।

কিন্তু এসব তো মনে-মনে ভাবল।

পুরন্দর তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, 'উপাধ্যায় পদবিটা কোন্ বিভাগে পড়ে? সিডিউল্ কাস্টে?'

'এ-মা! বলছ কী গো?.... উপাধ্যায়! মহামহোপাধ্যায়। মুখোপাধ্যায়। বন্দ্যোপাধ্যায়। চট্টোপাধ্যায়। গঙ্গো—

'হয়েছে, হয়েছে! বুঝেছি। তবে তোমার চয়েসটার প্রশংসা করতে পারলাম না।....এইরকম একটা নাম-সমেত একখানা ম্যানাস্ক্রিপ্ট নিয়ে গিয়ে বলতে হবে আমার গিন্নির লেখা! হোপলেস।'

সুনয়না চট করে অন্য-এক সিদ্ধান্তে এসে যায়, বলে ওঠে, 'তবে না-হয় বাবু গিন্নির নামে ধরনা দিয়ে কাজ নেই। বোলো, একটা অভাগা হতভাগা নতুন লেখক অগাধ আশা নিয়ে তোমার কাছে গছিয়ে গেছে। ক্ষ্যামাঘেন্না করে ওর একটা গতি করে ফেলুন, ভাই। বলবে, একটু পড়ে দেখেছি, নেহাত মন্দ নয়। আচ্ছা একটু পড়ো, আমি ততক্ষণ তোমার খাবারটা ঠিক করি গে।'

আসলে এখন যেন আর সামনে বসে থাকতে সাহস হচ্ছে না। যদি পুরন্দর চোখ তুলে বলে ওঠে, এ ভাষা তোমার? এরকম ভাষা কবে শিখলে?....

কিন্তু এই মহামুহূর্তে আপাতত সুনয়নাকে সুনয়নার ভগবান রক্ষা করলেন। ফোনটা বেজে উঠল। ওটা ফ্ল্যাটের ড্রইংরুমেই থাকে।....সবকিছু তো মাত্র কয়েকশো স্কোয়ার ফিটের মধ্যেই।....এ তো আর মফস্বলের, কি গ্রামগঞ্জের

বাড়ি নয় যে, হেলায়-ফেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাঁচ-সাত-দশ কাঠার বিস্তর থাকবে।

তাড়াতাড়ি এ ঘর থেকে চলে গেল পুরন্দর।

আর তারপরই তার জোর-জোর গলার কথা শুনতে পাওয়া গেল।....'আরে বাবা! এ তো আচ্ছা মুশকিলে ফেলেছ ভাই। আমি তো হাতজোড় করেছি। ও আমার দ্বারা হবে না। এবারে এমন উঠেপড়ে লাগছ কেন বলো তো ?...বলেছি তো আমার অতো ধৈর্য নেই।....নাঃ। আমার রাতের ঘুমটা কেড়ে নিচ্ছ দেখছি।'

চলল আরো কিছুক্ষণ। বলতে গেলে কথার ধস্তাধস্তি।

তারপর পুরন্দরের শেষকথা শোনা গেল—'আচ্ছা, কাল অফিসে কথা হবে। কী? এখন সিক্রেট রাখতে হবে? সে তো তোমাদের হাতে।....তবে আমি কিন্তু এখনো কথা দিয়ে উঠতে পারছি না।'

চলে এলো এ ঘরে।

বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে।

অথচ বিরক্তির ভঙ্গি নয়।

ব্যাপারটা অনুমান করছে সুনয়না। তবু খুব ভালোমানুষের মতো গলায় বলল, 'কী হল? বাইরে কোথাও সভা করতে যেতে বলছে বুঝি?'

'আরে, না না।'

পুরন্দর উথলে ওঠে, 'সেই ব্যাপার। এবারের পুজো সংখ্যায় 'কবির কলমে'র উপন্যাস চাই! কী এক খেয়াল চেপেছে ওদের।'

সুনয়না বলে, তা অত আপত্তিই বা কিসের মশাই? বললাম তো সেদিন, তোমার হচ্ছে সাধা কলম। যেদিকে চালাতে চাইবে, সেদিকেই চলবে!'

'আরে দূর্।....এ তো আর তোমার মতো দেবী সরস্বতীর বরপুত্রী নই যে, কলম ধরলাম আর ঝড়াঝড় একখানা উপন্যাস ভূমিষ্ঠ হয়ে পড়ল।'

সুনয়না বলে, 'আচ্ছা, নিজের ওপর অত অনাস্থা কেন? কবিরা কি চিরকাল শুধুই কবি থেকে যান? হয়তো দৈবাৎ দু-চারজন। বাকি সকলেই সাহিত্যের সকল শাখায় বিচরণ করেন না? আমি বলছি, তোমার হবে।'

ওর বলার ভঙ্গিতে অবশ্য পুরন্দর হেসে ওঠে। তারপর বলে, 'কই, খেতে দেওয়া হয়েছে নাকি?'

উতঙ্ক উপাধ্যায় তখন মন থেকে নিশ্চিহ্ন।

কিন্তু শুধুই কি তখন?

তারপর?

পুরন্দ[illegible] তের ঘুম' সত্যিই বিদূরিত।

প্রথম দিকে সুনয়না হালকাভাবে বলেছিল, 'একবার গোড়াটা বেঁধে ফেললেই দেখবে তরতরিয়ে এগিয়ে যাবে।'

আবার একটু হেসে বলেছে, 'আসলে তোমাদের কবিতাও তো একরকম গদ্যই বাপু।.... মনের কথাগুলো টপাটপ বলে ফেলা। নয় কি?'

পুরন্দর একটু বিদ্রূপ আর অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছিল। কিছু বলেনি।

অতএব সুনয়নাও আর কিছু বলতে সাহস করেনি।

দেখে, রাত অবধি ড্রইংরুমে আলো জ্বলছে।

আর সকালে দেখে, সারা ঘরে কার্পেটের ওপর দামি প্যাডের পাতারা দু'চার লাইন লেখা বুকে ধরে দলামোচড়া হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে।....

এই পরিস্থিতির মাঝখানে সুনয়না কখন বলে উঠবে, 'কী গো? আমার লেখাটার কী হল? সে তো বাপু তোমাদের পুজো সংখ্যায় গিয়ে উঠতে চাইছে না। প্রেসে একবার ধরিয়ে দিলেই—তোমাদের তো অফসেট! হতে কতক্ষণ?'

না, বলে ফেলতে পারা এত সহজ নয়।

পুরন্দরের এখন সত্যিই অসহিষ্ণুতা।

এখন কোনো সাহিত্যসভায় সভাপতি হতে বা কোথাও কবি-সম্মেলনে প্রধান অতিথি হতে রাজি হচ্ছে না পুরন্দর।

সুনয়না শুধু ক্যালেণ্ডারের পুরনো পাতা উল্টে-উল্টে দেখে, হিসেব করতে থাকে, কতদিন আগে লেখাটা দিয়ে গিয়েছিল ছবি।

কতদিন ভেবেছে, ছবিকে কি একটা চিঠি দেব?

কিন্তু দিয়ে উঠতে পারেনি। কী লিখবে সেই চিঠিতে? কোনো আশার বার্তা? একটা কিছুও কি আছে বলবার মতো?

এইরকম সময়ে হঠাৎ ছবিরই একটা চিঠি এল। যদিও এসেছে ডাকের খামে। তবু সংক্ষিপ্ততম পোস্টকার্ডে লিখবে না বলেই হয়তো এই বাহুল্য ব্যয়।

লিখেছে :

নয়না,

আমি হয়তো তোকে খুব একটু বিব্রতই করে বসেছি। তবে এটা তাগাদা ভাবিস না। শুধু জানতে চাইছি, আদৌ সম্ভব কি?

—তোর ছবি।

না, আর কিছু না। কোন কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের প্রশ্নমাত্রও নেই।.... শীতল উত্তাপহীন এই নির্লিপ্ত নিরাসক্ত কটি লাইন হঠাৎ যেন সুনয়নাকে একটা বিদ্যুতের চাবুক বসিয়ে দিয়ে সারা শরীরে-মনে ভয়ঙ্কর একটা জ্বালা ধরিয়ে দেয়....সূক্ষ্ম আর তীব্র একটা অপমানবোধের জ্বালা।

মনে হচ্ছে ছবি যেন সুনয়নার চেষ্টার বিশ্বস্ততার প্রতি হতাশা নয়, অনাস্থাই পোষণ করছে।....আর ছবি সেটা গোপন করতেও চায়নি।

এটা ইচ্ছাকৃত। না হলে এটুকুও কি অন্তত জানতে পারত না, তার দাদা কেমন আছে। কিম্বা অন্তত, 'নয়না, আশা করি ভালো আছিস?'

নয়নার কিছু হতে পারত না এই সময়ের মধ্যে? বেশ হতো, যদি জানতে পারত নয়না এর মধ্যে মরে গেছে।

জ্বালাটা মাথার মধ্যে পাক খেতে থাকে।

হয়তো আসলে কিছুই নয়। হয়তো সবটাই সুনয়নার কাল্পনিক। ছবির চিঠির ভাষাই হয়তো ওইরকম। অথবা হয়তো চিঠিটা লিখতে ছবি নিজেই লজ্জিত আর দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল, তাই তার কুণ্ঠিত কলম থেকে ওই ক'টা অক্ষরই বেরোতে পেরেছিল। কিন্তু ওই 'হয়তো' গুলো নিয়ে এখন ভাবতে পারল না সুনয়না। কারণ, আগুন তার ধর্ম পালন করে ছাড়বেই।

অকস্মাৎ একটা অপমানের অনুভূতিতে মাথার মধ্যে দপ্ করে যে-আগুনটা জ্বলে উঠল, তার দাহ সুনয়নাকে স্বভাববহির্ভূত ধৈর্যহারা করে বসল। তা, এরও হয়তো একটা 'হয়তো' আছে। এ অপমানটা তার বড়ো ভালোবাসার জায়গা থেকে এসেছে ভেবেই।

ধৈর্যহারা সুনয়নার মনে হল, এক্ষুণি কিছু-একটা করতে হবে। সুনয়না তাই তার নিজস্ব আত্মসম্মানবোধের বোধটাকে আপাতত ঠেলে সরিয়ে রেখে সেই উন্নাসিক জনটির দরবারেই আবেদন নিয়ে দাঁড়াতে এল। এল, তবে নিজস্ব 'ঠাট'টা বিসর্জন দিয়ে নয় অবশ্যই।

তাছাড়া কিছু করা কি সম্ভব? প্রার্থনা পেশ করবার কুণ্ঠিত ভঙ্গি নিয়ে, ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ানোর মতো দাঁড়াবে না কি?

পুরন্দর ব্যালকনিতে রাখা সরু ডিভানটায় বালিশে ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে সিগারেট ধ্বংস করে চলেছিল। এটাই তার অলস মুহূর্তের ভঙ্গি।

সুনয়নাকে আসতে দেখে সিগারেটের প্যাকেটটা বালিশের তলায় চালান করে দিল। কারণ স্বভাবতই সুনয়না এসে পড়লেই ওই প্যাকেটটা সরিয়ে নিয়ে বলে উঠবে, ক'টা হল? চালিয়েই চলেছ যে দেখছি।

এ-রকম সময় অবশ্য পুরন্দর ভুরু কোঁচকায় না। হয়তো বলে ওঠে, 'এই মাস্টারনীকে তালাক দিয়ে আর-একটা বিয়ে করা দরকার!'

মাস্টারনীও সঙ্গে-সঙ্গে বলে—'এক্ষুণি করতে পারো, স্বচ্ছন্দে। বলো তো কনে খুঁজি।

আজ অবশ্য সুনয়না সিগারেট সম্পর্কে কোনো কথা তুলল না। কোণের দিকে এক পাশে বসে পড়ে বলে উঠল, সাধে কি আর সেই অভাগা কবিটি

লিখে বসেছিলেন, 'চেরাপুঞ্জির থেকে, একখানা মেঘ ধার দিতে পারো গোবি-সাহারার বুকে?' অনেক দুঃখেই লিখেছিলেন।

পুরন্দর একটু নড়েচড়ে বসল। বলল, 'হঠাৎ কোথায় বৃষ্টির অভাব ঘটল?'

সুনয়না বলল, 'নিজেই ভেবে বোঝো। নাঃ, অতটা খাটতে চাইবে না বোধহয়। বলছি, যে উপন্যাসখানা লেখাই হয়নি, তার জন্যে লোকে টাকার থলি নিয়ে সেধে মরছে। অথচ যে-অভাগাব লেখা উপন্যাসখানা পড়ে থেকে ঘুণ ধরে যাচ্ছে, সেটাকে একবার পাবলিশারের দরজায় ছুঁড়ে ফেলে দেবারও গা হচ্ছে না।'

পুরন্দর অবশ্যই বক্তব্যটা বুঝে ফেলল; তবু না-বোঝার ভান করে বলল, 'এর মধ্যে আবার একটা অভাগা লেখক এল কোথা থেকে?'

'কেন, হতভাগ্য নতুন লেখক উতঙ্ক উপাধ্যায়। যে তোমার কাছে আছড়ে এসে পড়ে তার লেখাটা গছিয়ে দিয়ে গেছে।'

পুরন্দর বলল, 'এ হে-হে। তোমার সেই লেখাটার কথা বলেছিলে না? একদম ভুলে গেছি।'

অবশ্য এই ভুলটা বানানো নয়। একদা পুরন্দর তার মা'র জন্য খুব দরকারি ওষুধ কিনতে গিয়ে শুধু যে ওষুধটা কিনে আনতেই ভুলে গিয়েছিল তা নয়, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনটাও হারিয়ে এসেছিল।

'একদম ভুলে গেছ? তা যাবে বৈকি। মনে-মনে বোধহয় ভাঁজছ, মাস্টারনীকে তালাক দিয়ে কাকে ধরা যায়?'

পুরন্দর খানিকটা ধোঁয়া উড়িয়ে একটু মধুর হাসি হেসে বলে, 'ধরতে যেতে হবে? পুরন্দর রায়কে? তাকে ধরবার জন্যেই বলে ডজন-ডজন সুন্দরী মেয়ে ঘুরঘুর করে মরছে।'

'ইস্। আহা। যদি সেকালের নবাব-বাদশার কাল থাকত গো! তাহলে সব ক'টাকে এনে হারেমে পুরে ফেলতে পাবতে। তো যাক, লেখাটা প্রেসে যাবে, না আগুনে যাবে? আজকেই সেটার ফয়সালা হয়ে যাক।'

'এই—আরে, রাগ তো কম নয় দেখছি। তো ভাবছি, ওই ছদ্মনামটামের কি কিছু দরকার আছে?'

সুনয়না বেশ দৃঢ় গলায় বলে, 'নিশ্চয়ই। ভেবে দেখেছি তুমি একখানা ম্যানাস্ক্রিপ্ট বুকে করে নিয়ে গিয়ে আবেদন করছ, 'ওহে ভাই, আমার গিন্নির শখের খেয়াল। বইটা ক্ষ্যামা-ঘেন্না করে যদি একটু ছাপিয়ে দাও।' এটা তোমাকে একেবারে মানাবে না। ওই 'নতুন লেখকের' গল্পটাই ভালো।'

ধোঁয়া আড়ালে পুরন্দরের মুখটা বেশ উজ্জল দেখাল। তাকে যে অমন

যা-তা কাজে মানায় না, এটা যে সুনয়না বুঝতে পারে—সেটা গৌরবের।

একটা ভারি মজার ব্যাপারও আছে। যদিও পুরন্দর নিজেকে অনেক দামি আর অনেক উচ্চমানের বলেই মনে করে, তবু ওই ঘরসংসার-করা মাস্টারনীকে যেন ভিতর থেকে তেমন অগ্রাহ্য করতে পারে না। যেন ওই নেহাত সাধারণ জীবটির গায়ে-চড়ানো একটা বর্মে ঠেক খায়।

পুরন্দর এখন উঠে বসল।

নির্ভয়ে বালিশের তলা থেকে প্যাকেটটা টেনে বার করে একটা নতুন সিগারেটে আগুন ধরাল, তারপর বলল—'ঠিক আছে, ওটা আমার ব্রিফকেসে পুরে রেখে দিয়ো। কালকে গিয়ে দেখলে মনে পড়বে।'

'থ্যাঙ্কিয়ু।'

বলে হেসে ওঠে সুনয়না। তারপর বলে, 'কিন্তু কিছুতেই যেন ওই বানানো গল্পটা থেকে সরে আসা না হয়, বুঝলে তো? গিন্নির নামটি যেন কদাপি ফাঁস না হয়। মনে থাকবে তো?'

'আশা করছি।'

সুনয়নার ভিতরের সেই চিঠিটার দাহটা যেন জুড়িয়ে আসে। যাক, কালই ছবির চিঠিটার উত্তর দেওয়া যাবে।

তবু অভিমানের রেশটা মিলোয় না। চিঠির উত্তরটা দেবে সুনয়না ওই ছবির মতোই মেদবর্জিত ভাষায়।

* * * *

টুটু বিছানায় শুয়ে তার পারিপার্শ্বিকতাটির দিকে তাকিয়ে দেখছিল। আপাতদৃষ্টিতে এই ঘরখানা ঠিক একইরকম রয়েছে। তার আবাল্যের দেখা চেহারাটাই। তবু ভালো করে দেখলেই চোখে পড়ে, দেওয়ালগুলো আরো অনেক বেশি নোনা ধরে গেছে। মাঝে মাঝে বালির আস্তরণগুলোয় যে দাঁতখিঁচোনা ভাবটা ফুটত, সেটা আরো অনেক বেশি দাঁত খিঁচিয়ে যেন ব্যাঙ্গহাসি হাসছে। কাঠের কড়ি-বরগাওলা ছাদ। দু-তিনখানা বরগা ঝুলে এসে খসে পড়বার ভঙ্গিতে উদ্যত।....বিবেকানন্দ আর নেতাজীর যে-বৃহৎ ছবি দু'খানা একদা সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করে সুন্দর করে বাঁধিয়ে এনে দেওয়ালে টাঙিয়েছিল, দেওয়ালে স্যাঁতা ধরবার দরুন সেই ছবিগুলো যেন শাদাটে হয়ে আসছে।...টুটুর ক্ষীণ-হয়ে আসা দৃষ্টিতেও ধরা পড়ছে। ধরা পড়ছে হয়তো মলিনতর হয়ে। তুচ্ছ প্যাকিং-কাঠে বানানো একদা শাদা রঙলাগানো বইয়ের র‍্যাকটা যেন বেচারির মতো করুণ

দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে, আমার গায়ে আরেকবার অন্তত রঙের তুলিটা বুলোও না! তোমার বড়ো সাধের বইগুলো যে যেতে বসেছে।....

হ্যাঁ, এরা সবাই যেন কথা বলছে। যে-কথাগুলো একত্র করলে সরব একটা ধ্বনি শোনা যাবে, 'টুটু! তুমি কী অক্ষম, কী অক্ষম! কী ব্যর্থ, কী ব্যর্থ।....'

'দাদা, ওষুধটা খেয়ে নাও।'

ছবি ডাক দিয়ে হুঁশ ফেরায়। সব সময় সে আর ঘুমোয় না। কিন্তু শুয়ে থাকলে চোখটা বুজেই থাকে! আর বোজা চোখের অন্তরালে অসংখ্য যেসব ছবি ছায়াছবির মতো নড়াচড়া করতে থাকে, কথা বলতে থাকে, তারা ওই শয্যাগত মানুষটাকে যেন হুঁশের জগৎ থেকে কোথাও সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে।

'ওষুধ।'...চোখটা খুলে যায়।

টুটু আস্তে একটু হেসে বলে, 'খেতেই হবে!'

ছবি আকাশ থেকে পড়ে, 'খেতে হবে না? ওষুধটা খেতে হবে না?'

'হবেই বুঝি? তো দে!'

ট্যাবলেট। শিশি থেকে ঢালাঢালির প্রশ্ন নেই। শুধু একটু জলের দরকার।....

জলের গ্লাসটা হাতে নিয়ে ছবি বলে, 'আরেকটু জল খাবে?'

'ও, আচ্ছা! দে একটু।'

হাত বাড়িয়ে জলটা নেবার জন্যে উঠেই বসে। গ্লাসটা খালি করে ছবির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'খুব তেষ্টা পেয়েছিল তো! টের পাইনি।'

'কবে আর তুই এসব টের পাস দাদা? চিরকালই তো তোকে খিদে তেষ্টা ঘুম নাওয়া—সব মনে করিয়ে দিতে হয়।....হিহি—মা মাঝে মাঝে বলে, শুনিস না? ছেলেবেলায় তোকে নাকি নাইতে ডাকলে হঠাৎ মাথায় একটা হাত বুলিয়ে বলে উঠতিস, 'কই? নাওয়া পায়নি তো?....'

টুটু ভাবে, এ-কথাটা কতবারই শুনেছে মায়ের কাছ থেকে। বেচারির কথার স্টক বড় কম।....ছবির অবশ্য অতটা কম নয়। তবে তেমন বেশিও কিছু নয়।....হ্যাঁ, কথার স্টক ছিল বটে, সেই আর-একজনের।....অনর্গল কথা বলে যেতে পারত। এবং সে-সব কথা কখনোই পুনরুক্তি-দোষে দুষ্ট হত না।

একটু চুপ করে থেকে বলল, 'মা কী করছেন রে?'

'কী আবার? এই সকালবেলার সময় মা'র যা কাজ। সাধের কিচেন গার্ডেন ঠেঙিয়ে রান্নাঘরের রসদ জোগাড় করছেন!...ঝুড়িটা ভরে উঠল বোধহয় এতক্ষণে।....কতরকমই যে ফলিয়েছেন মা। না-দেখলে বিশ্বাস হয় না।....লাউ, কুমড়ো, শিম, উচ্ছে, সজনেডাঁটা—কত কী। তুই তাদের নামও জানিস না। বললেও বুঝবি না। আজ দেখিস, মেথি শাকের বড়া আর ধনেপাতার চাটনি খাবি। খেয়ে মোহিত হয়ে যাবি।'

কথাগুলো যে দাদাকে একটু ঠাট্টা করতে, তাতে সন্দেহ নেই। দাদা সেটা বোঝে।....আস্তে একটু হাসে। তারপর বলে, 'ওই নিয়ে মা'র খাটুনি তো কম নয়।'

'তাতে কী? ওটা মার একটা আহ্লাদের উৎস। নতুন কিছু ফললেই যেন আহ্লাদের সাগরে ভাসেন। আর কেবলই ডেকে ডেকে বলবেন— ছবি, দ্যাখ দ্যাখ, কী চমৎকার টম্যাটো ফলেছে। লাল টুকটুক করছে। ছবি, দ্যাখ কত কাঁচালঙ্কা হয়েছে। গাছ ভরে গেছে। ছবি, এইটুকু গাছে, কতো ঝিঙে! আজ ঝিঙে-পোস্ত রাঁধব। ওইটুকু জমির মধ্যে কত কী-ই যে করে ফেলেছেন! বলতে গেলে আলু ছাড়া আর কিছুই কিনতে হয় না মাকে রান্নার জন্য।'

টুটু একটা নিঃশ্বাস ফেলে মনে-মনেই বলে, অপদার্থ ছেলের সংসারে ওই-টিই মার প্রেরণার উৎস। কিনতে হয়না! তবু মুখে বলে, 'এতর মধ্যে এত পারেন। কিসের শক্তিতে? বল তো? ওই তো শরীর!'

ছবিও আস্তে বলে, 'দেখে-দেখে বুঝতে পারি দাদা, শুধু ভালোবাসার শক্তিতে।.... মার মধ্যে যে কী অফুরন্ত ভালোবাসার সঞ্চয়।.... আমি তো তার একশোভাগের একভাগও পাইনি। মা ওই গাছপালাগুলোকেও ছেলেমেয়ে দুটোর মতোই ভালোবাসেন। এই ইঁট-বারকরা ভাঙাচোরা বাড়িখানাকে ভগবানের মতো ভালোবাসেন। পাড়াসুদ্ধ লোককে মা আপনজনের মতো দেখেন। অত কষ্টের বাগানের সবকিছুই কি নিজে কাজে লাগান? পাড়ায় বিলোতে ছোটেন।'

টুটু বলে, অথচ আমরা বরাবর মাকে বোকাসোকা ছেলেমানুষ তুল্যই ভেবে এসেছি রে, ছবি। ওই অগাধ ভালোবাসার সঞ্চয় যার মধ্যে, তার মাপকাঠি আলাদা।

ছবি গভীর গলায় বলে, তা সত্যি! না হলে বাবা মারা যাওয়ার পর মা সেই দুঃখের সময় একটা পরের মেয়েকে নিজের সন্তানের সমান ভালোবেসে মানুষ করতে পেরেছেন!

সেই পরের মেয়েটার কথার সঙ্গে সঙ্গেই ছবি হঠাৎ চুপ করে যায়। আর সে প্রসঙ্গে কাজ নেই। হঠাৎ যদি প্রকাশ পেয়ে যায় ছবি তার সঙ্গে যোগাযোগ করে বসেছে। আর সে যোগাযোগের কারণটা কী!....

ছবি যেন এখন একটা চোরের মনোভাব নিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

টুটু আবার শুয়ে পড়ে হঠাৎ একটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে ওঠে। বলে— 'ছবি, জানলার ধারের দেওয়ালে ওই যে লম্বা রেখাটা উঁচু পর্যন্ত চলে গেছে, ওটা কি উইয়ের ব্যাপার?'

ছবি তাকিয়ে দেখে বলে — 'না তো কী, দেওয়ালে আলপনা দিয়েছি?

বাড়িটা যেন ক্রমেই উইয়ের রাজ্যপাট হয়ে উঠেছে, সর্বত্র উই।....'

বলেই উঠে পড়ে পাখার বাঁটটা দিয়ে ভেঙে দেয় সেই লাইনটা। ঝুরঝুরিয়ে ঝরে পড়ে ওই আততায়ীদের বিচিত্র মাটির বাসা।

টুটু বলে ওঠে— 'আহা! আহা! হঠাৎ অমন নিষ্ঠুরের মতো ভেঙে দিলি? এটা ওদের বাসা, ছবি।'

ছবি পাখাটা নামিয়ে রেখে কপালে দুহাত জোড় করে বলে ওঠে, 'ধন্য ধন্য! দাদা রে! মহত্ত্বের যে সীমা পরিসীমা দেখছি না। বাড়িটা উইয়ে ভরে যাচ্ছে, তাদের বাসা ভাঙব না? ওটাই তো এখন আমার কাজ হয়েছে। নিষ্ঠুর না হলে বাড়ির কিছু রাখবে?'

টুটু একটু বিষণ্ন হাসি হেসে বলে— 'আছেই বা কী? তারপর সঙ্কোচে আস্তে বলে, হ্যাঁ রে, আমার সেই জঞ্জালগুলো কোথায় আছে রে? উই বাবাজীদের খাদ্য হবে নাতো? হলে অবশ্য খুব বেশি লোকসান নেই। তবে জঞ্জালের ওজনটা একটু বেড়ে যাবে, এই যা!'

ছবির বুকটা কেঁপে ওঠে।

ছবির মনে হয়, এই বুঝি তার চুরি ধরা পড়ে গেল।

ইদানীং আর দাদা ওই লেখাগুলোর কথা তেমন বলে না। তাই একটু স্বস্তিতে রয়েছে।

বুক কাঁপুক, তবু ছবি রাগের গলায় বলে, 'সেইগুলো আমি উইদের ভোজের জায়গায় রেখে দিয়েছি? কী যে বলিস দাদা।.... তারা সেলোফেন পেপারের প্যাকেটে গা মুড়ে লোহার ট্রাঙ্কের মধ্যে ভরা আছে, বুঝলি? লোহার ট্রাঙ্কের মধ্যে চট করে উই ধরে না। আর সেলোফেনের মধ্যেও! দেখতে চাস?'

ছবি মনে মনে বলে, নেহাত মিছে কথা তো বলছি না। তেমন দোষ হবে কি? ওইভাবেই তো তোমার লেখার বস্তাটি সযত্নে রেখে দিয়েছি । শুধু তার থেকে তার মধ্যমণিটি চুরি করে ফেলে পাচার করে মরেছি। ভয়ঙ্কর এই দুঃসাহস। আর ভয়ঙ্কর রিস্কও।.... তবু করে বসেছি। জানি না, কী হবে। তবু ছবি জোরের গলায় বলতে ছাড়ে না, 'দেখতে চাস?'

জানে, এখনই অন্তত চাইবে না।

টুটু হাসল।

বলল, 'পাগল।'

তারপর বলল, 'দেখার বাহাদুরি আর দেখাতে যাব কোন মুখে রে, ছবি।'

ছবির চোখ উপচে জল এসে পড়ছিল। ছবিকে রক্ষা করলেন তার মা।

এসে বলে উঠলেন, 'ওমা। এখনো দুই ভাইবোনে বসে আড্ডা দিচ্ছিস?

ও ছবি, তোকে যে একবার গগনদের বাড়ি যেতে হবে— ওদের মতি মিস্তিরিকে একবার পাঠিয়ে দেবার জন্যে বলতে।’

এমনভাবে বলেন, যেন ওই ভাইটা রোগশয্যাশায়ী নয়। যেন সহজ স্বাভাবিক দুই ভাইবোনের আড্ডা দিতে বসে সময়ক্ষেপ।

টুটু আরেকবার ভাবে, কী আশ্চর্য। সেই ছেলেবেলা থেকে এই মাকে আমি বোকাসোকা ছেলেমানুষ ভেবে এসেছি।

ছবি বেঁচে যায়।

ছবি তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখে ফেলে।

ওই গগনদের বাড়িতে যাবার সময় পোস্ট করে দেওয়া যাবে। তাহলে ছবির চুরিটা ধরা পড়বে না।

চিঠি দেখলেই হয়তো মা জিজ্ঞেস করতে বসবেন, কাকে চিঠি লিখছিস রে ছবি?

চোরের প্রাণে যদি উৎকণ্ঠার মাপ সেকালের ভাষায় ‘ষোলো আনা’, তো চোরাই মাল রক্ষকের উৎকণ্ঠা আঠারো আনা। প্রথমজন তো তবু বিপাকে পড়লে তাহা অস্বীকার করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে পারে। দ্বিতীয়জনের সে পথ বন্ধ। সুনয়না আজ কতদিন ধরে যেন ওই আঠারো আনার ভার বয়ে চলেছে।

তাও নিজের হাতের লেখা কপির কাগজপত্রের গোছাগুলো তবু যেন আবরণের কাজ করছিল। হঠাৎ কেউ বাঁধন খুলে পাতা ওল্টাতে বসে সুনয়নার হাতের লেখাটাই পাবে। কতক্ষণ আর পাতা ওল্টাবে? কিন্তু নিজের হাতের লেখা কাগজের ভারি গোছাটা যেই পুরন্দরের ব্রিফ কেসে ভরে চালান করে দিল তখনই যেন ওই উৎকণ্ঠাটা বেড়ে গেল।.... যদি হঠাৎ পুরন্দরের চোখে পড়ে? অথবা বাড়িতে বেড়াতে আসা আর কারুর!

পুরন্দরের সেই বন্ধুর বোনটি তো আসে হুটহাট মাঝে মাঝে। আর তার স্বভাবই হচ্ছে প্রথমেই বইপত্তর হাঁটকানো। পুরন্দরকে উৎসর্গ করা, পুরন্দরকে উপহার দেওয়া অনেক বই-ই তো আছে বাড়িতে। এসেই অতএব বলবে, দেখি আর কী নতুন বইটই এসেছে?

টুটুদার হাতের লেখা পাণ্ডুলিপিখানা কি সুনয়না আলমারিতে ভরে রাখবে?.... ও বাবা! সেটা কি একটা নিরাপদ জায়গা? হঠাৎ যদি পুরন্দরের কিছু হারায়, কোনো চিঠি কোনো কার্ড হয়তো বা কোনো ক্যাশমেমো, বাড়ির তিন-তিনটে আলমারিই তছনছ করে ছাড়বে না সে?

কী খুঁজছ বলো না, আমি দেখছি বললে আবার দারুণ চটে যায়। যেন

এটা তার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপন। তুমি দেখতে পাচ্ছ না? আমি দেখছি। পুরন্দরের মতে, এটা অবমাননাকর। কাজেই আলমারি সেফ নয়।

বিছানার তলা?

সেখানে তো জ্যোৎস্নার হাতের অবাধ বিচরণ।

চাদরটা ঠিক করে দিই বলে পুরো বিছানাটা ওল্টায়। সুনয়নার তাই সদাই চিন্তা কী করে ওই বোমাতুল্য বিপদটাকে বাড়ি থেকে বার করে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া যায়। গতকাল থেকে আরো চিন্তা।

ছবির সেই সংক্ষিপ্ততম চিঠিটা পড়ে হঠাৎ যতটা ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল সুনয়না, এবার পাণ্ডুলিপিটার অন্তত একটা গতি হবে ভাবনায় সেই রাগ উত্তেজনাটা থিতিয়ে গেছে।

সেদিন তো তখনই ভেবেছিল, সুনয়নাও ওই রকম কাটা-কাটা সংক্ষিপ্ত ভাষায় তক্ষুণি একটা চিঠি লিখে ফেলে ছবিকে।... মনে মনে অবিরত খসড়া করেও চলেছিল। ছবি তোমার চিঠিটা পেলাম। তোমার মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়— তোমার মধ্যে নয়নার অবস্থাটা বোঝবার খেয়াল নেই দেখলাম।

....এই পর্যন্ত ভাবা হয়ে চলেছিল। 'তুই' করে নয়, 'তুমি' করে। শেষ লাইনটাও ভাবা হয়ে গিয়েছিল, টুটুদা কেমন আছেন— এটুকু জানালে কি খুব মানের হানি হত?... ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। এলিয়ে যাচ্ছে। টানটান হচ্ছে না। ছবির মতো 'চাবুক হেন' লাগছে না।

কিন্তু লেখার সময়?....

তখন মন সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে। তখন আর মনের মধ্যে সেই 'প্রতিশোধ'-চিন্তাটি নেই।

পুরন্দর অফিস থেকে ফোন করল একটু আগে। 'এই শোনো, আজ ফিরতে একটু দেরী হতে পারে।'

যেন দেরি হওয়াটা নতুন বাণী। যেন খবর দেওয়া দেরিটা 'একটু' পর্যায়েই থেকে যাবে।.... তা এ তো গা সওয়া। তারপরই যে অমৃতময় বাণীটি শোনাল পুরন্দর।....

'আরো শোনো। তোমার উপন্যাস শ্যামলবাবুর দপ্তরে জমা পড়ে গেছে!'

'জমা পড়ে গেছে!'

এরপর আবার ছবিকে টানটান ভাষায় চিঠি লিখতে যাবে কেন সুনয়না? যার জন্যে অনেকখানি ভালোবাসার সঞ্চয়।

অতএব কলম চটপট এগোল।

ছবি রে!

তোর চিঠি পেয়েছি। তার আগে তো আমারই দেবার কথা। কিন্তু আসলে *কি জানিস? একটা কিছু সলিড খবর হাতে না নিয়ে চিঠি লিখতে বসি কি* করে?.... কী যে অস্বস্তিতে ছিলাম। যাক, খবরটা জানাই, ওটা প্রেসে চলে গেছে। তবে প্রেস থেকে মুক্তি পাবে কবে, তা জানি না। এখন তো ওদের সবকিছুই অফসেটে ছাপার ব্যবস্থা, দেরি না হওয়াই উচিত। তবে সামনে পূজো সংখ্যার ভিড়। কাজেই হয়তো, যাক এখন কর্তাকে তাগাদা দিয়ে চলব।

আর শোন, টুটুদার হাতের অমন মুক্তো অক্ষরে লেখা ম্যানাস্ক্রিপটা আমার প্রেস-এর হাতে তুলে দিতে ইচ্ছে হয়নি বলে পুরোটা কপি করে ফেলে সেটাই দিয়েছি। এখন ইচ্ছে করছে, আসল জিনিসটা আবার আসল জায়গায় রেখে দিই গে।

কিন্তু খাঁচার পাখির আবার ইচ্ছা। তার শুধু লোহার শিকের ফাঁক থেকে চোখ তুলে আকাশ দেখা। তুই-ই বরং সুবিধে করে যদি একদিন আসতে পারিস।

তোর চিঠিতে তোরা কে কেমন আছিস, সেটি না লেখায় দারুণ রেগে গিয়েছিলাম কিন্তু। বলতে পারিস অবশ্য, 'আমাদের খবরের জন্যে তো তুই মরে যাচ্ছিলি।' বলার রাইট আছে। তবু বলিস না। খবরটা দিস। সোনাকাকীমাকে আমার প্রণাম দিস। আর টুটুদাকেও! তোর জন্যে যা দেবার তাই দিচ্ছি.... তবে দিন গুনব তোর জন্যে।

তোর
নয়না

লিখে আবার পড়ল।

ভালোই হয়েছে! এখন ছবি তাড়াতাড়ি এসে যায় একদিন। তাহলে চোরাই মাল জমা রাখার উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি ঘটে।

মনে মনে শুধু বলল, লিখলাম বটে, কর্তাকে খুব কষে তাগাদা দেব। সেটা তো আর সম্ভব নয়। তবু লিখলাম, চিঠিটায় একটা বাঁধুনি এল।

ছবি এলেও, মাঝখানের জটিল অংশটুকু ওকে বলা যাবে না। দরকারটা কি? বইটা বেরোলেই হল। তাকে বার করাবার চেষ্টায় নয়না মুখপুড়ি যে একখানা গল্প ফেঁদে বসেছিল, বলে লাভ কী?

উঃ, কবে যে সেই দিনটা আসবে।....

তারপর ভাবতে থাকে— আচ্ছা, বইটা বেরোলে কোনো ছুতোয় নিজেই একবার চলে যাওয়া যায় না? ধরো পুরন্দরকে বললাম, সেই ছেলেবেলায়

যে একজনের কাছে 'মানুষ' হয়েছিলাম। জীবনের প্রথম বইটা তাঁকে একখানা দিয়ে আসি।

একরকম দু'রকম নানারকম ভাবতে থাকে সুনয়না। প্রায় ছেলেমানুষের মতো।

একবার নেমে চিঠিটা পোস্ট করে আসি।

জ্যোৎস্নার হাতে দেবার ইচ্ছে হয় না। হয়তো ওই ছুতোয় নেমে পড়ে চিঠিটা হাতে নিয়েই সাতবাড়ি বেড়িয়ে নেবে। আর সবাই একবার করে ঠিকানাটা দেখে বলে উঠবে 'চন্দননগরে ওনার কে.... ?'

কাছেই পোস্টবক্স।

গেট থেকে বেরিয়েই।

নিজের হাতে চিঠিটা পোস্ট করে শান্তিতে ফিরে গেটে ঢুকছে, পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস ভট্টাচার্যির সঙ্গে মুখোমুখি। সেরেছে! যাকে বলে আকাশ মাথায় ভেঙে পড়া।

এই মহিলার কবলে একবার পড়ে গেলে রক্ষে নেই। রাস্তায় দাঁড়িয়েই ভদ্রমহিলা ঘণ্টাখানেক আটকে রাখতে সক্ষম। শুধু রাস্তায় কেন, যে কোনো জায়গায় পুজো প্যাণ্ডেলে অঞ্জলি দিতে গিয়ে ওঁর সামনে পড়ে গেলে ওনার কথার জাল মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে তিন দফা অঞ্জলি হয়ে যায়। বেশি কথা কি সিঁড়িতে মুখোমুখি হলেও, তা ফ্ল্যাটবাড়ির সিঁড়িতে তো মুখোমুখি হওয়াটা যখন তখনই।

হয়তো বাজার করেই ফিরছেন মহিলা, সেই বাজারের ব্যাগটি হাতে নিয়েই চালিয়ে যাবেন গল্পের স্রোত।

সুনয়নাকে দেখেই আকর্ণ হেসে বলে উঠলেন, 'কী ব্যাপার ? আপনি গেটের বাইরে ?'

সুনয়না হেসে ফেলে বলে, 'কেন ? আমার কি গেটের বাইরে আসা বারণ ?'

'বারণ কিনা তা তো জানি না, ভাই। তবে দেখি না তো বিশেষ। বাজারেও তো কোনোদিন....

সুনয়না কুণ্ঠিত হাসির সঙ্গে বলে, 'বাজার ? ও বাবা। ওতে আমার ভীষণ অ্যালার্জি।'

'তাই বুঝি ? তা হবে। কবির গিন্নি তো। আমাদের তো বাবা মনে হয়, সবথেকে আহ্লাদের কাজ হচ্ছে বাজার করা। তা সব রকমই। শাড়ি, গয়না থেকে মাছ তরকারি পর্যন্ত। আহা, বাজার করার মতো আনন্দ আর আছে!'

হিসেব করলে মিসেস ভট্টাচার্য সুনয়নার মায়ের বয়সীই। তবে আচার-আচরণে সাজে-সজ্জায় এবং বাগ্‌বিন্যাসে কোনোমতেই বয়সকে প্রকাশ করতে রাজি

হন না মহিলা। সুনয়না অনেকবার বলা সত্ত্বেও তাকে 'আপনি' করে ছাড়া 'তুমি' করে বলেন না এবং কেউ তাকে 'মাসিমা' ডেকে ফেললে দারুণ আহত হন।.... তিনি নিজে অবশ্য তার থেকে দু'চার বছরের সিনিয়রকেও 'মাসিমা' ডাকতে ভালোবাসেন। তা বাসুন, কিন্তু ওনার এই যে কোনো জায়গায় হাতে পেয়ে গেলেই আটকে ফেলা সুনয়নার অন্তত বন্ধনযন্ত্রণাতুল্য লাগে।

কিন্তু উপায় কী?

মহিলা বলে ওঠেন— 'আহা দাঁড়ান না, দাঁড়ান না, এত ব্যস্ততার কী আছে? আপনাকে তো দেখতেই পাওয়া যায় না। ডুমুরের ফুল। তো শুনলাম নাকি আপনার কবি কর্তা এবার গদ্যলেখকদের অন্ন মারবার তালে আছেন?'

সুনয়না অবাক না হয়ে পারে না। 'ঘটনা' কোথায় তার ঠিক নেই, অথচ রটনাটি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছে বসেছে। তবে অবাকটা সে অন্যভাবে প্রকাশ করে। 'তাই নাকি? কী করে?'

'কেন, উপন্যাস লিখে। এবারে তো 'চক্রবালে'র পুজোসংখ্যায় এক নতুন আকর্ষণ কবি পুরন্দর রায়ের উপন্যাস! জানেন না নাকি?'

সুনয়না একটু হেসে বলে, 'এইমাত্র জানলাম।'

'তার মানে? ও, আমার কাছেই প্রথম শুনলেন? আহা আপনিই তো প্রেরণা। নয় কি না?'

সুনয়না বলল, 'তা হবে। তো কোথায় শুনলেন খবরটা?'

আর বলবেন না। আমার একটি ভাইঝি আছে, দেখেননি বোধহয়, আসে মাঝে মাঝে। তবে দৈনিক দুঘণ্টা করে ফোনে কথা বলে। সাহিত্যজগতে আর সিনেমা জগতে কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে, ওর নখদর্পণে। বম্বের কোন আর্টিস্টটির কখন বিয়ে হচ্ছে, কখন বিয়ে ভাঙছে, কে কবার বিয়ে ভেঙেছে — সব ওর জানা।.... আবার লেখকরাও কে কী লিখছেন, কে বিদেশ বেড়িয়ে আসছেন— সব খবর গুলে খেয়ে বসে থাকে। তো ও-ই আমায় ফোনে ডেকে বলল, পিসি, তোমাদের কবি পুরন্দর রায় যে এবার উপন্যাস লিখছেন। কোথায় কোন ম্যাগাজিনে যেন লিখেছে, 'এবার কবির কলমে উপন্যাস।' তা সত্যি বলতে ভাই, যদি ওই সব ধোঁয়াধোঁয়া কাব্যটাব্য ছেড়ে মানুষের জীবনের সুখদুঃখ আশাভালোবাসা নিয়ে লেখেন, ভালোই হয়। আমাদের পাড়ার আরো জেল্লা বাড়ে। আহা, মোটাসোটা থান ইঁটের মতো একখানা শারদীয় সংখ্যা বুকে নিয়ে দুপুরে বিছানায় গা গড়িয়ে পড়ার মতন সুখ আর আছে? বলুন?'

সুনয়না আর কী বলবে?

সুনয়না শুধু ভাবতে থাকে বাড়িতে তো লিখতে টিখতে দেখি না। অফিসে

বসেই এগোচ্ছে বোধহয়, না হলে আর বিজ্ঞাপন বেরোয়? আমার কাছে কেবলই বলে, 'নীরদবাবু তো আমায় খেয়ে ফেলছেন, অথচ আমার দু'লাইনও লেখা হয়নি। কী মুশকিলেই পড়া গেছে।'

তার মানে ওটা চালাকি।

সুনয়নাকে হঠাৎ চমকে দেবার ইচ্ছে।

কী জানি, কী নিয়ে লিখছে। নিশ্চয়ই প্রেমের গল্পই। ভদ্রলোক তো নিজে এখনো পুরোদস্তুর একখানি রোম্যান্টিক নায়ক।

হাসল মনে মনে সুনয়না।

তা লিখতে ধরলে চুটিয়ে একখানা প্রেমকাহিনী লিখে ফেলতে দেরি হবে না। নিজেরই তো বিস্তর অভিজ্ঞতা। যখন যেখানে যায়, সেখানেই তো ওর একখানা 'প্রেমিকা' জুটে যায়। হেসে হেসে নিজেই গল্প করে। বলে, 'আমার কী দোষ, বলো? আমি তো আর তাদের দিকে হাত বাড়াতে যাই না। তবে তারাই যদি আমার কাছে লটকে এসে পড়ে, কী উপায়?'

সুনয়না হেসে হেসে বলে, 'তো আমি তো আর তোমায় তার জন্যে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে যাচ্ছি না। এত কৈফিয়ত কিসের? ভালোই তো। জানবে, আমার ঘরে কী একখানা দামি মাল মজুত।'

হঠাৎ হঠাৎ আবার এই হাসিতে বেশ চটেও যায় পুরন্দর। বলে, 'আচ্ছা, তুমি একটুও জেলাসি অনুভব করো না কেন বলো তো? নিরূপের বৌ, অমিতাভর বৌ, বিজনের বৌ— সকলেই শুনি বর অন্য মেয়ের সঙ্গে একটু লটকেছে দেখলেই বেদম বিগড়ে যায়।'

সুনয়না ওর বরের দুর্বলতাটুকু ভালোই জানে। তাই হেসে বলে, 'দুটোর মধ্যে তফাত আছে।'

'তফাতটা কী?'

'বাঃ, নেই? এক্ষেত্রে তারাই লটকাচ্ছেন। একজন আর এক বন্ধুর স্ত্রীর কিংবা আর সব মহিলা দেখে মুগ্ধ হয়ে লটকে পড়ছেন, আর অন্যক্ষেত্রে প্রেমিকারাই আলোর দিকে পোকার মতো ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে। এতে আলোর মালিকের ঈর্ষা হতে যাবে কী দুঃখে?'

পুরন্দর অবশ্যই প্রীত হয়। এবং তখন যথেষ্ট পরিমাণে বিগলিত হয়ে বলে— 'ও, নিজেকে 'আলোর মালিক' বলে মনে করা হয়?'

'নিশ্চয়ই। একশোবার।'

পুরন্দর তখন খুব মনপ্রাণ খুলে সুনয়নার কাছে গল্প করে, কবে কখন কোন ভক্ত তরুণীকে পুরন্দর একটু নেকনজরের অভাব দেখিয়েছিল বলে সে

অভিমানে খানখান হয়ে গিয়েছিল। কবে কোথায় সভা করতে গিয়ে এক বয়স্কা ভক্ত পুরন্দরের কাছে আত্মনিবেদন করে বসে পুরন্দরকে কী দারুণ বিপন্ন করে বসেছিলেন।

মোটকথা, পুরন্দরের স্টকে অনেক 'প্রেমিকা'। ওদের কাউকে নিয়ে এগোলেই হয়ে যাবে। আসলে 'সাধা কলম' তো নিশ্চয়ই।

দেখা যাক। কী উপহার দেয় এবার পুরন্দর পাঠক পাঠিকাকে। তবে বেশি ন্যাকা প্রেমিকার কাহিনী না হলেই হল।

মিসেস ভট্টাচার্য বলে ওঠেন, 'কী হল মিসেস রায়? আপনি হঠাৎ চুপ মেরে গেলেন যে? সত্যিই খবরটা জানতেন না নাকি?'

সুনয়না নিজেকে সামলে নেয়।

মৃদু হেসে বলে, 'তা অবশ্য নয়। তবে বলেছিল খবরটা নাকি এখন চাপা থাকবে। একেবারে শেষ মুহূর্তে সবাইকে একটু চমকে দেবে। অথচ আপনার ওই ভাইঝি না কে—'

মিসেস ভট্চায সঙ্গে সঙ্গেই বলে ওঠেন, 'তা এতে আর চমকের কী আছে ভাই, কোন্ কবিটিই বা শেষ পর্যন্ত গদ্যের কলমে মাথা না মুড়োন? বলুন? দেখলাম তো অনেক? সাহিত্যে সব্যসাচী তো অনেকেই। তো কর্তাকে বলবেন, শুনে খুব খুশি হয়েছি। আমি ওঁর দারুণ ফ্যান তো।'

নিতান্ত কাঁচা বয়সের ফ্যানের মতোই মধুর একটু হাসেন মিসেস ভটচার্য।

আরো কতক্ষণের জন্যে বন্ধযন্ত্রণা ভোগ করতে হত সুনয়নাকে কে জানে। হঠাৎ জ্যোৎস্না প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে এসে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে গালে হাত দিল।

'হায় কপাল, আপনি এখানে? আর আমি আপনাকে দেখতে না পেয়ে— ওরে বাবা রে বুকটা যা ধড়ফড় করছে। বেডরুমে নেই, বাথরুমে নেই। এমনকি ছাদে পর্যন্ত উঠে গেছিলাম। কোথাও নেই দেখে— কখনো তো না বলে কোথাও বেরোন না! চলুন, চলুন।

বলে মিসেস ভটচার্যের দিকে অলক্ষ্যে একটি কুটিল কটাক্ষ হেনে বলতে গেলে প্রায় টেনেই নিয়ে যায় সুনয়নাকে।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বলে, 'ওনার কবলে পড়ে গেছলেন? ও বাবা।'

'তোর আবার 'ও বাবা' কী। তুই তো সব সময় ওনার কবলে ইচ্ছে করে পড়তে চাস।'

জ্যোৎস্না অনায়াস মহিমায় বলে, 'তা মোটেই না। ওনার যা বোকাবোকা, কথা শুনলে হাসি পায়।'

সুনয়না ঘরে এসে বসে পড়ে ভাবে, এ একটা বরং ভালোই হল। পুরন্দরের উপন্যাস নিয়ে হৈহৈ হলে.... হবেই কারণ ওই হৈহৈ-টা তোলবার জন্যে এবং পুরন্দরকেও আরো তোলবার জন্যেই তো 'চক্রবাল' গোষ্ঠীর এই নতুন স্টান্ট। না-হলে উপন্যাসের অভাব নাকি ওদের।

তো সুনয়নার পক্ষে ভালো এই, নিজের গৌরবের উল্লাসে হয়তো পুরন্দর সুনয়নার আবেদনটুকুর মর্যাদা রাখবে। উতঙ্ক উপাধ্যায়ের উপন্যাসটা হয়তো একটু তাড়াতাড়ি আলোর মুখ দেখতে পাবে।

হঠাৎ বেশ একটু কৌতুক অনুভব করে সুনয়না।

পুরন্দর জানে লেখাটা সুনয়নার। শ্যামলবাবুদের জানানো হয়েছে লেখাটা একজন নেহাত নতুন অভাগা লেখকের। অথচ নাঃ। সুনয়না বেশ একটা ভালো বুদ্ধিই খেলেছে।

ছবি যে এত তাড়াতাড়ি এসে হাজির হবে, ভাবতেই পারেনি সুনয়না। তাই ছবিকে দেখে যেন হাতে স্বর্গ পেল। আসলে এটা তার ভাবনার মধ্যে ছিল না, নয়নার চিঠিখানা ছবির কাছেও হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতোই হয়েছিল।

ছবি তো স্বপ্নেও ভাবেনি, ছাপাখানার গহ্বরে ফেলে দেবার পরে পাণ্ডুলিপিটা ফেরত পাওয়া সম্ভব। সেই অসম্ভব প্রাপ্তির বাণীটি বহন করে নিয়ে গেল নয়নার চিঠি।

দাদার প্রাণতুল্য বস্তুটাকে দাদাকে না জানিয়ে বাড়িছাড়া করে ফেলা পর্যন্ত তো প্রাণের মধ্যে অবিরত অনুশোচনার যন্ত্রণা। কেন মরতে দিতে গেলাম!.... যদি ছাপাও না হয়, অথচ জিনিসটা চিরতরে হাতছাড়া হয়ে যায়। এমন তো হতেও পারে। নতুন লেখকদের লেখা পাণ্ডুলিপিকে কোন্ প্রকাশক, কোন্ সম্পাদক 'মূল্য' দিতে বসে?

ভয়ঙ্কর একটা অনুতাপ এবং শূন্যতার যন্ত্রণা নিয়ে দিন কাটছিল ছবির। 'ছাপা' হবে এ আশাটা আর মনের মধ্যে দানা বাঁধছিল না। তাই কেবলই মনে হচ্ছিল, তার থেকে না হয় আবার গিয়ে ফেরতই নিয়ে আসি। বলি গে, নয়না রে, কিছু মনে করিস না। তোকে শুধু-শুধু বিব্রত করে রেখেছি। ওটা দিয়েই দে, দাদা খোঁজ করছিল।

এমনি এক টানাপোড়নের মানসিকতার সময় নয়নার ওই চিঠি স্বর্গলোকের বার্তা বয়ে নিয়ে যাবে না? চিঠিটা পড়ার পর মুঠোয় চেপে ধরে নিরুচ্চারে বলেছে, নয়না রে, দাদাকে তুই কতো ভালোবাসিস! দাদার হাতের লেখাটা ছাপাখানার কালিঝুলি মেখে নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কায় তুই সেই একগাদা লেখা

'কপি' করেছিস বসে বসে? ভাবা যায় না নয়না, তুই আমায় বাঁচালি।

ছবি তাই তক্ষুণি আবার একটা গল্প বানিয়ে ফেলল। গল্প বানাবার সম্বল তো বেশি নেই। ছবির জীবনটা যে তার মা আর দাদার কাছে পড়া বইয়ের খোলাপাতার মতো পড়ে আছে।.... ছবির কে কোথায় এমন আছে যে ওদের অজানা? ছবির সম্বল বলতে সেই 'ছাত্রী''ই।

ছবির চশমাটা কিছুদিন ধরে যেন গড়বড় করছে। হয়তো পাওয়ার বদলানোর দরকার। তো ছবির এক ছাত্রীর বাবা বেশ নামকরা চোখের ডাক্তার। তার কাছে গিয়ে একবার দেখিয়ে নিলে হয়। 'চোখের ডাক্তার বাবা'টি অবশ্য বানানো নয়, তবে চশমার গড়বড়টা বানানো।

মা বলল, 'তো যা বাপু, চোখ বলে কথা। তোর দাদার তো—'

দাদা অবশ্য বলল, 'বেছে বেছে ছাত্রীর বাবার চেম্বারে ধরনা দিতে যাওয়া মানেই তো অভিসন্ধিমূলক?'

ছবি একগাল হেসে বলল, 'তা আর বলতে? তা এসব একটু-আধটু করতেই হয়, দাদা। চেনাজানা না হলে অতবড়ো একখানা ডাক্তারের নাগাল পেতাম আমি? শুনি নাকি, একমাস, দু'মাসের আগে কেউ ডেট পায় না। (এটাও অবশ্য বানানো নয়। ... শুনেছে তেমন খবর।)

মনে মনে কান মুলে বলে, 'বাবাঃ। আর নয়। এই প্রথম, এই শেষ। উঃ 'লুকোচুরি' ব্যাপারটা যে পুরো চুরির-ধাক্কা ধরে, তা কে জানত।

তো ওই একই সুর তো অবিরত ধ্বনিত হয়ে চলছিল ছবির বান্ধবীর মধ্যেও। তাই সেও ছবিকে দেখে হাতে স্বর্গ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে উচ্চারণ করেছে, বাবাঃ, বাঁচলাম। লুকোচুরি তো না, পুরো চুরিই। এইবার একবার তার প্রমাণটা লোপ করে ফেলে, শান্তি পাই।

ঈশ্বরের অশেষ দয়া, ছবি যখন এল, তখন পুরন্দর অনুপস্থিত। অবশ্য পুরন্দরের বাড়িতে উপস্থিতির সময়টি যে খুব বেশি তা নয়। তবে এক-একদিন অফিসের গাড়িটাকে ছেড়ে দেয়, বলে, একটু পরে যাচ্ছি।

আলস্য করে গড়ায়। যত পারে সিগারেট খায়। অতঃপর হয়তো একাধিক কবিতাকে চিন্তার জাল থেকে মুক্ত করে কাগজের গায়ে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে। তারপর ধীরে-সুস্থে ট্যাক্সি করে বেরোয়।

তবে এ দুর্ভোগ বেশিদিন নয়। সেটা প্রায় প্রায়ই শুনতে পায় সুনয়না। পুরন্দরের জন্য নিজস্ব গাড়ির ব্যবস্থা করছে 'চক্রবাল।'

তো আজ পুরন্দরের কবিতারা তাকে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে বাড়িতে আটকে রাখেনি এই ভালো।

ছবি! বলে তার কাঁধদুটো চেপে ধরে সুনয়না বলে উঠল, এখন একটি কথা নয়। আগে তোকে একটু ঠাণ্ডা খাওয়াব, তবে আর কথা।

'কী মুশকিল। কেন রে বাবা।'

ইস্, মনে নেই সেদিনের কথা? কখন বেরিয়েছিস তার ঠিক নেই।

তারপরই লক্ষ্য পড়ে ধ্যাবড়া করে কাজলপরা একজোড়া চোখ, প্রায় গোল হয়ে গিয়ে তাকিয়ে আছে।

এটাকে কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত বাড়িছাড়া করা দরকার।

সুনয়নার নিভৃত স্থানে লুকিয়ে রাখা সেই মুক্তোর মতো অক্ষরে লেখার সম্ভারটি বার করে ছবির ব্যাগে চালান দেওয়ার দৃশ্যটির যেন সাক্ষী না থাকে কোনো চোখ।

তারপর? বুক থেকে পাথর নামা।

অনাবিল শান্তি!

ব্যস্ত গলায় বলল, 'এই জ্যোৎস্না, এই দিদি রেলগাড়ি থেকে এলো। চট করে এক গ্লাস রসনা বানিয়ে দিয়ে, ছুটে দোকানে চলে যা। এই হচ্ছে আমার সেই ছেলেবেলার বন্ধু। সেদিনকে যে এসেছিল তুই দেখিসনি। মফস্বলের লোক। কলকাতার মিষ্টি খেতে দারুণ ভালোবাসে। যা, গাঙ্গুরামের দোকান থেকে দেখেশুনে ভালো ভালো কিছু মিষ্টি নিয়ে আয়।....'

ছবি ব্যস্ত গলায় বলে, 'কী পাগলামি করছিস? কবে আবার আমি—'

'তুই থাম তো। আমার কাছে আর লজ্জা দেখাতে হবে না। একটা কথা বলবি না।....'

জ্যোৎস্না শরবত বানিয়ে এনে বলে, 'গাঙ্গুরাম থেকে? সে তো অনেক দূর।'

'দূর তো কী? তোকে কি আর হেঁটে যেতে বলছি? এই নে বাসভাড়ার পয়সা নে। আর এই কুড়ি টাকার মিষ্টি।'

'পুরো কুড়ি টাকার?'

'হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ। যা তো চটপট। কুড়ি টাকায় আর কটা মিষ্টি হবে।'

'তো কী আনব, সেটা বলবেন তো?'

সুনয়না বলে, 'যেটা ভালো দেখবি, বুদ্ধি করে নিয়ে নিবি।'

'বেশ। তবে বলছি কি, ছেলেবেলার বন্ধু। রেলগাড়ি চেপে এসেছে। তো এই বেলা দুপুরে গুচ্ছের মিষ্টি খাইয়ে বিদেয় দেবেন? দুটো ভাত বসাবেন না?'

'আচ্ছা, বসাই তো বসাবো। পরে দেখছি। বিদেয় দেবো— একথা কে বলেছে তোকে?'

জ্যোৎস্না হেসে হেসে বলতে বলতে যায়, 'বাবাঃ। ছোটকালের বন্ধু বলেই এতো টান। তো সাতজন্মে তো আসতে দেখি না গো দিদি আপনাকে। পেরায় পেরায় এলেই পারেন।'

'এইবার আসবে। তুই বুদ্ধি দিলি তো? এখন যা তো। দরজাটা ভালো করে চেপে দিয়ে যাস।'

খালি গেলাসটা নামিয়ে রেখে ছবি বলে, 'এটা কী হল?'

'কী আর হল? মহিয়সী মহিলাটিকে কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত বিদেয় করা গেল। .... অসম্ভব কৌতূহল, অসম্ভব দৃষ্টিশক্তি এবং অসম্ভব 'ঘ্রাণশক্তি'ও। তাছাড়া বাড়িতে ঘটিত ঘটনাবলীসমূহ শুধু দাদাবাবুকেই নয়, সমগ্র পড়শীজনকেও নিবেদন করার প্রবণতা বড়ো বেশি।'

'সেরেছে। একে নিয়ে ঘর করতে হয়?'

'উপায় কী? এরা ভিন্ন তো গতি নেই। যাক— আগে তো তোর জিনিসটা দিয়ে দিই।'

ছবি দেখল, যেমন প্যাকেটটি দিয়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমনটিই রয়েছে। বড়ো মমতায় একবার তার ওপর হাত বুলিয়ে আস্তে বলে, এই এতবড়োটা তুই কপি করেছিস, নয়না?

প্রায় চোখে জল আসে আসে।

তা নয়নারই কী অবস্থা তেমন ঘোরালো নয়?

তবু সহজভাবে বলে, 'কাজকর্ম তো নেই। সময় তো অগাধ।'

'শুধু সময় পাওয়াটাই কী সব রে?'

সুনয়না আস্তে ওর হাতের ওপর একটা হাত রাখে। একটু চাপ দেয়।

তারপর একটু পরে বলে, 'তোর চিঠি পেয়ে কিন্তু সত্যিই ভীষণ রেগে গেছলাম, ছবি। তোরা কেমন আছিস, সেটুকু পর্যন্ত লিখিসনি।'

'আর বলিস না। লুকিয়ে একটা কাজ করে বসে, তার ট্যাক্স দিতে দিতে প্রাণান্ত। চিঠিই কি সহজে লেখা হয়েছে?'

একটু বিষণ্ণ হাসি হাসল, 'আমরা কেমন আছি', সেটা লেখবারই বা কী আছে বলো? যেমন ছিলাম, ঠিক তেমনিই আছি। শুধু দাদার চোখটাই ক্রমশ—'

তারপর খুব সন্তর্পণে বলে, 'ওটা তো প্রেসে গেছে লিখেছিলি?'

'হ্যাঁ, গেছে তো। তবে কবে যে দেবে কে জানে। এখন নাকি পুজোসংখ্যার মরসুম, প্রেস দারুণ ব্যস্ত।'

একটু এ রকম বলে রাখা ভালো। চটপট না আশা করে।

তারপর বলে সুনয়না, 'এত ইচ্ছে হয়, একবার যাই!'

'ইচ্ছেটা পূরণ করা কি খুব অসম্ভব?'

'খুব অসম্ভব হয়তো নয়। কিন্তু কী জানিস? ইচ্ছেপূরণ বাবদ যে এনার্জি প্রকাশ করতে হবে, সেটাকে খুঁজে পাই না। কৈফিয়ত দেওয়া ব্যাপারটা বোধকরি সব থেকে কষ্টকর। .... প্রথম তো আদি-অন্ত সমস্ত ইতিহাস দাখিল করতে হবে। তারপর হঠাৎ এমন ইচ্ছেটি হল কেন, সে হিসেবও দাখিল করতে হবে। সে বড়ো করুণ অবস্থা। হঠাৎ কী ভেবে হেসে উঠে বলে, 'তুই বাবা বেশ আছিস। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম নয়!'

প্রসঙ্গে পালটে বলে, 'তো বল, সোনাকাকীমা কেমন আছেন?'

ছবি একটু হাসল। বলল, 'এককথায় বলতে হলে বলতে হয়, আশ্চর্য রকম ভালো আছেন। সেরকম ভালো থাকা, আমি তো কল্পনা করতেই পারব না। তুই ও পারবি না বোধহয়। কবির গিন্নি বড়োলোকের গিন্নি।'

নয়না হাসল। হ্যাঁ, ভালো থাকার পক্ষে ওগুলো বেশ জোরালো ব্যাপার বটে। কিন্তু কাকীমার ব্যাপারটা যেন ধোঁয়া-ধোঁয়া লাগছে যে।

'ধোঁয়া নয়, একদম সকালের আলোর মত পরিষ্কার। মা এখন প্রবল উৎসাহে বাগান তৈরির কাজ করে চলেছেন। ভাবতে পারিস, মার বাগানে শুধু পূজোর ফুল কি দাদার ঘরের ফুলদানিতে সাজাবার দুটো ফুলই ফুটছে না, মার বাগানের ফসলে আমাদের রান্নাঘর সমৃদ্ধ। বলতে গেলে আলু ছাড়া আর কিছুই না কিনে, মা নিত্য দুবেলা পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে ভাতের থালা ধরে দেন ছেলেমেয়েদুটোকে।.... কী উৎসাহ যদি দেখিস।.... ওইটুকু জমির মধ্যে নেই এমন জিনিস নেই।'

সুনয়না বলল, 'বাগান তৈরির তো খাটুনি ঢের রে।'

দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথমটা হয়তো শুরু করেছিলেন অভাব মেটাতেই। এখন হয়ে গেছে নেশা। আশ্চর্য রকমের চাপা। জানিস, আগে আগে ভাবতুম, মা বুঝি একটি বোকাসোকা ভালোমানুষ মেয়ে।....এখন দেখছি, ভালোমানুষ অবশ্যই, তবে বোকাসোকা আদৌ নয়।.... দাদা যে শেষ হয়ে চলেছে, একথাটা মা বুঝতে পেরেছে, তা দাদাকে একটুর জন্যেও জানতে দেয় না।...

দাদা। দাদা।

যতবারই শব্দটা উচ্চারণ করছে ছবি, নয়নার মধ্যে যেন একটা ঝাঁকুনি লাগছে। টুটুদার লেখা ওই বইয়ের পাণ্ডুলিপিটা ছবি অবশ্যই পড়েছে। ওর মধ্যে, সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী একটি প্রবাহিত ধারার মধ্যে কেমন অন্তঃসলিলাভাবে বয়ে চলেছে আর একটি ধারা। যার মধ্যে বারে বারেই অনুচ্চারে উচ্চারিত হয়ে চলেছে একটি নাম। যে নাম উতঙ্ক উপাধ্যায়ের হৃদয়কে ভরাট করে রেখেছে।

না, নাম নেই কোথাও।

তবু ছবি কি ধরতে পারেনি?

ছবির কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ার এই লজ্জাটিকে সামলাবে কী দিয়ে সুনয়না? কোন্ আবোলতাবোল কোথায়?

কিন্তু বেশিক্ষণ কি আর বসবার সময় আছে ছবির?

ছবি তো শুধু চোখ দেখাতে ডাক্তারের চেম্বারে এসেছে।

সুনয়না একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আমরা মেয়েরা সারাজীবন শুধু গল্প বানিয়েই চলি। ওই বানিয়ে চলা গল্পের মাটির ওপরই আমাদের জীবন প্রতিষ্ঠিত।'

বেল বেজে উঠল জোরালোভাবে।

সুনয়না বলল, 'এলেন তিনি। মহীয়সী মহিলাটি। দ্যাখ এখন কত হাঁপায়, কত লাফায়, কত কথা বলে। এমন ভাব করবে, যেন কী ভয়ঙ্কর একটা দুরূহ কাজ করে এল।'

'বেশ মজার একটি প্রাণী নিয়ে কাটাতে হয় তো দেখছি।'

'তা হয়।'

দরজা খোলামাত্রই ঠিক তাই। ঢুকেই জ্যোৎস্নার বাক্যধারা প্রায় ভাসিয়ে দেয় পরিস্থিতিটিকে।

'আপনি তো বললে বৌদিদি, জ্যোছনা, তোর যামন লাগে তাই নিয়ে আয়। তো একটার কী দাম গো। চার টাকা পাঁচ টাকা একএকখানা মিষ্টি।'

'সে তো জানিই। তুই-ই আকাশ থেকে পড়ছিলি। এত টাকার? নে, এখন একটা প্লেট নিয়ে আয় আর এক গেলাস জল নিয়ে আয়। দিদি এক্ষুণি চলে যাবে।

জ্যোৎস্না গালে হাত দেয়। 'ওমা, সেকী। তালে দুটো ভাত খাবেননি?'

সুনয়না অবলীলায় বলে, 'ভাত খাবে কী? কলকাতায় এসেছে তো একটা নেমন্তন্ন খেতে। মিষ্টিও অত খাবে না।'

ছবির দিকে তাকায়।

যার মানে দাঁড়ায়, দ্যাখ, আবার কেমন একটা গল্প বানালাম।

ছবি বলে, 'ভীষণ খারাপ লাগে রে, নয়না। তোর কাছে এলাম, কথা বললাম, খেলাম, তোর ঘরসংসার দেখলাম— এসব গল্প করতে পারব না মা-র কাছে, দাদার কাছে। যতদিন না বইটা বেরোচ্ছে, এটা অব্যক্তই থাকবে।'

সুনয়না হঠাৎ দৃঢ়স্বরে বলে ওঠে, 'বইটা বেরোনোমাত্রই আমি নিজে নিয়ে চলে যাব।'

জ্যোৎস্না বলল, 'ওমা। বন্ধু চলে গেছে তবু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যে? মন কেমন করছে, না?'

সুনয়নার কানে কথাটা পৌঁছয় কিনা কে জানে।

তবু আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে আসে।

জ্যোৎস্না মনে মনে হেসে মনে মনেই বলে, 'বাবাঃ মেয়েবন্ধুতেই এই। ছেলেবন্ধু হলে যে কী হত।'

তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, 'বিধবা?'

সুনয়না চমকে ওঠে, 'কী বলছিস?'

'বলছি, আপনার বন্ধুর মাথায় তো সিঁদুর দেখলুম না। বিধবা?'

'চমৎকার? মাথায় সিঁদুর নেই, তাই বিধবা! তোর মাথাতেও তো সিঁদুর নেই।'

এধরনের কথা ওর সঙ্গে কয় না সুনয়না, আজ হঠাৎ মেজাজটা চড়ে উঠল।

জ্যোৎস্না অবশ্য এই চড়ে ওঠাটা বুঝল না। ফিক করে একটু হেসে বলল, 'আমার তো বে-ই হয়নি।'

'ওরও তাই।'

'ওমা। অতবড়ো মেয়ে। আর কবে হবে?'

'হবে না। বিয়ে করবে না।'

'তাই বলুন। ইস্কুলের দিদিমণি বুঝি? দিদিমণিরাই তো দেখি অনেকে বে করে না।'

সুনয়না হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, 'তুই আর কী কী দেখেছিস জ্যোৎস্না? মনে হয় কোনোকিছুই তোর অজানা নয়। এবার একটা জিনিসই তোর দেখবার বাকি আছে। সেটা হচ্ছে— পথ। সেটাই এইবার দেখতে চেষ্টা করো।'

'পথ। পথ দেখব?'

মুহূর্তখানেক স্তব্ধ হয়ে থেকেই জ্যোৎস্না হঠাৎ হিহি করে হেসে ওঠে, 'বাবাঃ বৌদিদি। এমন ঠাট্টা করেন, পেটের পিলে চমকে যায়।'

কিন্তু ওই গ্রাম্য মন্তব্যটি তক্ষুণিই সুনয়নার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে, তা কি ভেবেছিল সুনয়না।

শুধু পেটের পিলেটাই কেন, হৃৎপিণ্ডটিও যে চমকে উঠল সুনয়নার।

আর চোখের সামনে একটা ঘন অন্ধকারের ওপর যে হলুদরঙা ফুটকিগুলো ফুটে উঠল। তাকেই কি বলে সর্ষেফুল?

টেলিফোনটা বেজে উঠলো ঝনঝনিয়ে।

ছুটে গিয়ে ধরল সুনয়না।

আর ওপাবে পুরন্দরের কণ্ঠ উচ্চকিত হয়ে উঠল, 'রীতিমতো উত্তেজিত। এই সুনয়না, কী একখানা কাণ্ড করে বসেছ তুমি? আমায় একেবারে ডুবিয়ে বসলে।'

সুনয়না তার লাফাতে থাকা হৃৎপিণ্ডটাকে কষ্টে থামিয়ে শুধু বলতে পারে, কী হয়েছে?

যা হয়েছে, সে ফোনে বোঝানো সম্ভব নয়। তবে আমার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ। বাড়ি গেলে শুনো। এখন এখানে দস্তুরমতো হৈ-হৈ রৈ-রৈ। সবাই মিলে খেয়ে ফেলছে আমায়। আচ্ছা ছাড়ছি।'

হতভম্ব সুনয়নার চোখের সামনের সেই হলুদ ফুটকিগুলো এখন নাচানাচি করতে শুরু করে।

'কী করেছে সুনয়না।'

সুনয়নার ওই ভয়ঙ্কর চুরিটা কি ধরা পড়ে গেছে?

যার প্রমাণটি নিশ্চিহ্ন হয়ে লোপ করা গেল ভেবে একটু আগেই স্বস্তির সাগরে ডুবে যাচ্ছিল সুনয়না!

কিন্তু পুরন্দরের কণ্ঠস্বরে তো ভয়াবহ কোনো রুক্ষ ক্রুদ্ধ গর্জনের সুর আছে বলে মনে হল না। যেটা ভাষায় বয়েছে। উত্তেজনা রয়েছে। তবু যেন তার সঙ্গে একটা উল্লসিত ভাবও রয়েছে।

কী হতে পারে? কী হতে পারে?...

'ভয়' জিনিসটা কী ভয়ঙ্কর!

কী হতে পারে! কী হতে পারে! ভাবতে ভাবতে ক্রমশই যেন একটা অবয়বহীন আতঙ্ক সুনয়নাকে গ্রাস করতে থাকে।....আর সেই আতঙ্ক থেকে জন্ম নিতে থাকে সম্ভব-অসম্ভবহীন আরো আতঙ্কবাহী চিন্তা।

তুমি আমায় ডোবালে!

এ কথার অর্থ কী?

তবে কি এত সাবধানতা সত্ত্বেও সবকিছু প্রকাশ হয়ে গেছে পুরন্দরের কাছে? 'উতঙ্ক উপাধ্যায়' নামের উৎসটি জানা হয়ে গেছে তার? কী করে হতে পারে তা খেয়াল হয় না, শুধু আতঙ্কটাই পাক খেতে থাকে।....

এক-একবার ভাবতে চেষ্টা করে, কী বোকার মতো ভাবছি। হয়তো ওইসব লেখাটেখার ব্যাপারই নয়। হয়তো সম্পূর্ণ আলাদা কিছু! অথবা এটা পুরন্দরের একটা অদ্ভুত কৌতুক। সুনয়নাকে আচমকা ঘাবড়ে দিয়ে একটু মজা করা....কিন্তু সে ভাবনা ভাবতে চেষ্টা করলে কী হবে, ঘুরেফিরে ওই একই কথা মনে এসে

হাত-পা অবশ করে দেয়।....আচ্ছা, আমার তৈরী কপিটার মধ্যে টুটুদার হাতের লেখা কোনো একখানা পাতা চলে যায়নি তো? আর সেইটাই ওদের কারো চোখে পড়ে গিয়ে সন্দেহ জাগায়নি তো?

হঠাৎ একটা কথা ভেবে যেন সীমাহীন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায় সুনয়না। আচ্ছা, কী করে কোনো মেয়ে লুকিয়ে বৈধতাবিহীন 'প্রেম' করে। 'বর' নামক পুরুষটার ঘর করতে করতে পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম চালায়! এবং অনায়াস অবলীলায় সংসারটাকেও চালিয়ে চলে!

উঃ, তাদের নার্ভ কী শক্ত!

হঠাৎ এ-রকম একটা তুলনা মাথায় আসায় চমকে গেল সুনয়না। আর তখনই ভারি একটা রাগই এসে গেল ছবির ওপর।...বেশ তো ছিলাম রে আমি। যে জীবনটাকে পেয়েছি তাকেই 'পরমপ্রাপ্তি' হিসেবে ধরে নিয়ে। এইভাবেই চালিয়ে চলতাম। তা 'পরম পাওয়াই' তো ভেবে আসছি। জীবনের বনেদে কী-বা ছিল আমার যে, এই পাওয়াটাকে মূল্যহীন ভাবতে বসব? পূর্ণতা জিনিসটা যে কী, তা যার জানা নেই; সে আবার শূন্যতার দৈন্যটা বুঝবেই-বা কী করে? সে তো ধরেই নেয় জীবন ওইরকমই।

কিন্তু তুই কেন তোর নয়নার সেই নিস্তরঙ্গ জীবনটার সামনে সহসা ধূমকেতুর মতো এসে উদয় হয়ে, ভয়ানক একটা তরঙ্গ তুলে তাকে বিপর্যস্ত করে বসলি? তুই কেন জানিয়ে দিয়ে গেলি, 'নয়না, তোর জন্যে অনেক ঐশ্বর্য জমা ছিল।'

....রাগ হল। ভয়ানক রাগ হল সেই নিষ্ঠুর লোকটার ওপরও।....টুটুদা! একেই কি বলে 'সাংখ্যের পুরুষ'! নির্বিকার, অচঞ্চল।....মস্ত একটা সম্পত্তি একজনের নামে দানপত্র করে রেখে,.... সেই দানপত্রের দলিলখানা তার হাতে দিলে না কোনোদিন! মানে হয় এর? কোনো মানে হয়? শুধু সেই অভাগ্যকে বঞ্চিত করে রাখা ছাড়া?....

এখন আবার সুনয়নার প্রায়-মুছে-যাওয়া অতীত এমন করে কথা কয়ে উঠতে চায় কেন? সুনয়নাকে দিশেহারা করতে চায় কেন? সুনয়নাকে একটা জটিল জালে ফেলে এমন ভয়ের মুখোশ পরে এসে সামনে দাঁড়ায় কেন?

পুরন্দরের ওই টেলিফোনের মধ্যেকার কথাগুলো আছড়ে এসে পড়ার পর ব্যাপারটা কী হতে পারে, তা নিয়ে সুনয়না সম্ভব-অসম্ভব অনেক কিছুই ভেবে মরেছে; কিন্তু এটা যে হতে পারে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল? দুঃস্বপ্নেও না।

অথচ সেই 'অভাবিত'টি দুরন্ত এক উল্লাস আর উচ্ছ্বাসের মূর্তিতে এসে

হাজির হল। সে উল্লাস এল সুনয়নার জন্য বৃহৎ এক বাক্স সন্দেশ হাতে নিয়ে।....দিশেহারা হবার মতোই অবস্থা।

এমনিতে সুনয়না খুবই বেজার হয় যদি দেখে পুরন্দর তার খবরের কাগজের অফিস থেকে ফেরার সময় দু-পাঁচটা 'কাগুজে বন্ধু' অথবা 'অকারণের স্তাবক'কে ল্যাংবোট করে নিয়ে আসে। এমন অনেক দিনই আসে তো!

সুনয়না বেজার হয়, বিরক্ত হয় সারাদিনের পর কর্মক্লান্ত ঘরে-ফেরা লোকটার স্বস্তি-শান্তির ছন্দটি বিঘ্নিত হয় দেখে।....সারাদিনের কাজ-করা শরীরটাকে স্নান করে ফ্রেশ করে নিয়ে সারাদিন প্রতীক্ষারত একটি নারীহৃদয়ের সেবাযত্ন মমতার স্পর্শলাভে সুস্থির হয়ে ওঠার বদলে রাত অবধি চলে সেই অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় হৈ-হুল্লোড়। আহার্যের থেকে পানীয়ের কারবারই চলে রমরমা। আর সে পানীয় সব সময় চা, কফি-র মতো শিশুপাচ্যর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না।

অতএব আড্ডাধারীরা বিদায় নেবার পর সেই আড্ডা-অধ্যুষিত শূন্য ঘরখানাকে দেখে এবং সিগারেটের ধ্বংসাবশিষ্টে উপচে-পড়া অ্যাশট্রেটার দিকে তাকিয়ে সুনয়নার বিতৃষ্ণ মনটার কাছে পুরন্দরকেও যেন ওইরকম একটা দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেটের টুকরোর মতোই লাগে। তখন তো নিজেকে জ্বেলে-জ্বেলে নিঃশেষ করে ফেলে প্রায় ওই একটা পোড়া সিগারেটের তলানির মতোই নিজেকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সোফায় গুঁজে ফেলে পড়ে থাকে পুরন্দর।

দেখে চোখ জ্বালা করে ওঠে সুনয়নার। ভাবে, নিজেকে নিয়ে কী অপচয়! কী ছিনিমিনি খেলা!

তবু আজ কিন্তু সুনয়না প্রার্থনা করছিল, পুরন্দর একান্ত একা না এসে দলবল জুটিয়েই আসুক বরং। তাহলে সুনয়না নিজেকে থিতিয়ে নেবার সময় পাবে।

প্রার্থনা জিনিসটা যে সব সময় পূরণ হয়, তা নয়, তবে আজ সুনয়নার ভাগ্যে তা হল।

পুরন্দরের সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে এল 'চক্রবাল'-এর শান্তনু সোম আর সুদীপ সরকার। কিন্তু এসেই যে 'বৌদি বৌদি' ডাক পেড়ে একেবারে তার হাতে মস্ত একটা সন্দেশের বাক্স ধরিয়ে দিয়ে বলে উঠবে, 'ওঃ, কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব বৌদি!'....একথা কি ভেবেছিল সুনয়না?

সুদীপ প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠল, 'ধন্যবাদ কি রে? বল অভিনন্দন। সত্যি বৌদি, আপনার অবদান ব্যতীত বোধহয় পুরন্দরদাকে এভাবে আবিষ্কার করা সম্ভবই হত না। তার জন্যে অসীম অভিনন্দন।'

সুনয়না পুরন্দরের দিকে তাকাল। কিন্তু চোখে চোখ ফেলতে পেরে উঠল

না। পুরন্দর যেন বিভোর হয়ে ওই দুজনের মুখের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।....সুনয়নার অবাক লাগল। এমনটা কি হবার কথা? ....আচমকা অভিনন্দন পাওয়া সুনয়নার মুখের দিকেই তো তাকাবার কথা পুরন্দরের।

হঠাৎ মনে হলো, এই না-তাকানোটা যেন ইচ্ছাকৃত।

কেন যে মাঝে-মাঝেই পুরন্দরের ওপর এমন সন্দেহ আসে সুনয়নার। হঠাৎ-হঠাৎ পুরন্দরের অনেক কিছু আচরণই সুনয়ার মনে হয়, এটা তার সহজাত নয়, ইচ্ছাকৃত।

সুনয়না অবশ্য অপ্রতিভ হয়ে বোকাটে হয়ে পড়ার মেয়ে নয়। সুনয়না ভিতরের বিস্ময়-বিপর্যস্ত অবস্থাকে সামলে নিয়ে শান্ত হাসি হেসে বলল, 'আমি কিন্তু ঘোর অন্ধকারে আছি।'

শান্তনু হেসে ওঠে বলল, 'তা আর নয়। কর্তা-গিন্নি দু'জনে মিলে আমাদের জন্যেই একটি অন্ধকার জাল রচনা করে খুব একখানা ধাপ্পা দেওয়া হচ্ছিল। ধোপে টিকল না। ....উঃ, পুরন্দরদা যে এমন একখানি বর্ণচোরা আম, তা কে জানত। ভাগ্যিস, এবার শশাঙ্কবাবু একদম ঝুলে পড়েছিলেন। তাই না এই আশ্চর্য আবিষ্কার।....'

সুনয়না বলল, 'সত্যি বলছি, তবুও কিন্তু অন্ধকারেই আছি। ....কী ব্যাপার বলো তো?'

এ প্রশ্নটি অবশ্য পুরন্দরকে।

পুরন্দর এখন অপ্রতিভ-অপ্রতিভ গলায় বলে, 'আমি কিছু জানি না বাবা! এরা সবাই মিলে এমন সব কাণ্ড করছে....যাকে বলে দিনকে রাত করা। কিছুতেই সত্যি কথাটা বিশ্বাস করতে চাইছে না। শশাঙ্কবাবু তো স্রেফ আমায় আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে একেবারে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে ফেলে ছাড়লেন!

এ-ও অন্ধকার। এ-ও যেন হেঁয়ালি।

সুনয়না বুঝতে পারে না মূলত প্রসঙ্গটা কী নিয়ে।

যদিও শান্তনু নামের টাকমাথা তরুণটি পুরন্দরের থেকে বয়েসে ছোটো কিনা যথেষ্ট সন্দেহ, তবু পুরন্দরকে সে দাদা এবং সুনয়নাকে বৌদি না বলে ছাড়ে না।

পুরন্দরের কথায় তাই হো-হো করে হেসে উঠে বলে শান্তনু—যাই বলুন পুরন্দরদা, আপনার 'লাক'-কে হিংসে না করে পারা যায় না।

লাককে হিংসে!

হঠাৎ সারা শরীরে রোমাঞ্চ ঘটিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে যায় সুনয়নার মধ্যে।

তবে কি? তবে কি পুরন্দর ওদের কাছে সত্যিকথাটাই বলে ফেলেছে? ...যদিও সেই সত্যিটা আসলে আদৌ সত্যি নয়। তবু পুরন্দরের কাছে তো সেটাকেই সত্যি বলে উপস্থাপিত করেছিল সুনয়না। ...বলেছিল তো, 'যাও, আমার এই মারকাটারি উপন্যাসখানি তোমাদের শ্যামলবাবুর দপ্তরে জমা দিয়ে বলে ফেল গে, গিন্নির লেখা! তাড়াতাড়ি ছাপা চাই। না-হলে গিন্নির কাছে মুখ থাকবে না।'

পরে অবশ্য পুরন্দর সে প্রস্তাব একেবারে উড়িয়ে দেওয়ায়, বলেছিল, 'তবে না-হয় বাবু বানিয়ে-টানিয়ে একটা অভাগা দুঃস্থ নতুন লেখককে খাড়া করো গে। বলো গে, এত করে ধরল—।

তবে কি গোড়ার সেই বানানো সত্যিটাই ওদের কাছে ফাঁস করে ফেলেছে পুরন্দর?....

বুকটা একবার কেঁপে উঠল সুনয়নার। ছবির মুখটা মনে পড়ল। তারপর ভাবল, তাতে কী? আমি তো ভেবেচিন্তে ছদ্মনামই ব্যবহার করেছি।....যাতে সেই যে বলে, শ্যামও থাকে কূলও থাকে।

নিশ্চয়ই লেখাটা ওদের কাছে প্রশংসনীয় হয়েছে। হতেই হবে। লেখাটা আশ্চর্য রকমের ভালো তো। বিশেষ করে ভাষা। অতি আধুনিক বলতে হয়। অতএব এমন অভিনন্দন। এবং পুরন্দরের 'লাক'কে হিংসে!

মুহূর্তেই এসব চিন্তা খেলে যায়। ওই রোমাঞ্চ-ঘটানো বিদ্যুৎপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই।

তবু সুনয়না নিজেকে সংযত রেখে একটু মধুর হাসি হেসে বলল, 'সেটা কি আজ নতুন জানলেন?'

দু'জনেই অবশ্য হৈহৈ করে উঠল, 'তা অবশ্য নয়। আমরা তো সব সময় পুরন্দরদার লাকের জয়গান করি। দেখি তো অনেককে আপনার মতো এমন—'

সুনয়না তেমনিভাবেই বলল, 'এতদিন 'লাক'-এর জয়গান করতেন। এখন হঠাৎ হিংসে শুরু করলেন যে? এখন হঠাৎ নতুন কী ঘটল?'

শান্তনু বলল, 'দেখছিস সুদীপ? দু'জনের মধ্যে কি গভীর আঁতাত? বৌদি এমন ভাব করছেন যেন কিছুই জানেন না।.... পুরন্দরদা দিব্যি একখানা গল্প ফেঁদে কী একটা চাল দিচ্ছিলেন! ....যাক, সত্য হচ্ছে সূর্যের মতো। সে প্রকাশিত হবেই।...তবে যা-ই বলুন, পুরন্দরদা, শশাঙ্কবাবুকে সেলাম ঠুকতেই হয়। জিনিয়াস চেনবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে ওঁর। কার মধ্যে কী আছে, ঠিক ধরে ফেলেন। এক হিসেবে উনিই আপনার আবিষ্কর্তা।....আচ্ছা চলি।'

এদের কথাবার্তায় আবার অন্ধকারে গড়িয়ে পড়ছিল সুনয়না। কিছুক্ষণ আগে

যে-সম্ভাবনায় রোমাঞ্চিত হচ্ছিল, সেটাও যেন কেমন ঝুলে পড়ে গিয়ে পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছে না!

তবে সেই শূন্যে-ভাসা অবস্থা থেকে নিজেকেও উঠিয়ে নিয়ে বলে উঠল সুনয়না, 'চলি মানে? চা-টা না-খেয়েই?'

'নাঃ। আজ আর নয়। শশাঙ্কবাবু প্রাণের খুশিতে খুব খাইয়ে দিলেন সবাইকে।.... আর এক্ষুণি কিছু চলবে না।

'বাঃ একটু বসবেনও না?'

'নাঃ আজ থাক। অফিসের গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। চলি পুরন্দরদা। বৌদি নমস্কার। আজকের অফারটা খাতায় জমা থাকল। আবার আসছি শিগ্‌গির আপনার হাতের চা খেতে—এবং জ্বালাতন করতে।'

তরতরিয়ে নেমে গেল ওরা সিঁড়ি দিয়ে। দরজাটা খোলা রেখেই। সুনয়না এগিয়ে গিয়ে সেটা চেপে আটকে দিয়ে ঘরে এসে ঘুরে দাঁড়িয়েই পুরন্দরের দিকে যেই চোখ ফেলল, ওর হঠাৎ সেই তুলনা মনে পড়ে গেল।

আড্ডায় বিধ্বস্ত হয়নি, তবু মনে হল যেন অ্যাশট্রেতে গুঁজে রাখা একটা পোড়া সিগারেটের তলানি অংশটুকু।....

দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল। এইটুকু সময়ের মধ্যেই সোফার মধ্যে গুঁজে বসে পড়েছে পুরন্দর।

সুনয়নাও বসল। সামনের সোফাটায়। ওর দিকে একটু তাকিয়ে দেখে আস্তে বলল, 'ব্যাপারটা কী বলো তো?'

কিন্তু ব্যাপারটা যে কি, সে কী আর দু এক কথায় বলার? তার আদ্যোপান্ত বলতে হবে না? সে তো একটা ইতিহাস!

জিনিয়াস চেনা-চোখ 'চক্রবাল'-এর প্রধান সম্পাদক শশাঙ্ক ঘোষাল যে এবারে ভীষণ নির্বেদের সঙ্গে পুরন্দরকে 'চক্রবাল'-এর পূজো-সংখ্যার জন্যে একটা উপন্যাস লিখতে অনুরোধ করছিলেন, সেটা অবশ্য সুনয়নার অবিদিত নয়। এবং পুরন্দর যে কেবলই বলে চলেছিল 'আমার দ্বারা হবে না, আমার অত ধৈর্য নেই, সবাইকে দিয়ে কি সব হয়? আমি আপনাদের গাঙ্গুলির মতো সব্যসাচী নই' ইত্যাদি ইত্যাদি—এটাও অবশ্য সুনয়নার জানা। এবং আরো জানার চেষ্টা করে করেও ফেলিওর হচ্ছিল পুরন্দর। কিছুতেই লেখাটায় দানা বাঁধাতে পারছিল না।...তারপর?

তারপরটাই অবশ্য অজানা। হয়তো আর-একটু জানা।

শশাঙ্কবাবুর জেদ আর প্রবল ইচ্ছাশক্তিই যে 'চক্রবাল'কে-এতখানিটা করে তুলেছে, সে-কথা শুনেছে সুনয়না। তবে প্রবীণ মালিক এবং মালিকের নবীন

পুত্ররা শশাঙ্ক ঘোষালের কাছে কী পরিমাণ কৃতজ্ঞ, অতটা জানত না! তো ক্রমশ জানল ঘোষাল যখন বলেছেন, 'চক্রবাল'-এর পুজো-সংখ্যার নতুন চমক 'কবির কলমে গদ্য', তখন মালিক বেপরোয়া স্বীকৃতি দিয়েছেন, ঠিক আছে। করুন আপনি। যত দক্ষিণা লাগে।'.....

অতএব ঘোষণা—পনেরো হাজার টাকা দক্ষিণা, এবং লেখবার জন্যে ইচ্ছেমতো ছুটি। এমনকি চাইলে মালিকদের পানিহাটির বাগানবাড়িতে গিয়ে ছুটিটা কাটিয়ে উসুল করে আনা। কিন্তু সেটা আর চায়নি পুরন্দর।

কৌতুকপ্রিয় কবি পুরন্দর রায় সেইসব চালাক ছাত্রদের মতো একটি কৌতুক করে বসলেন। তিনি ওইসব হৈহৈ-এর মধ্যে না গিয়ে চালাক ছাত্ররা যেমন লোকসমাজের অসাক্ষাতে পরীক্ষার পড়া তৈরী করে নেয় আর বলে বেড়ায়—'এবার ডাহা ফেল, কিস্যু পড়িনি', আর পরে রেজাল্ট দেখিয়ে সবাইকে চমকে দেয়, তেমনি কবি পুরো উপন্যাসটিকে ঘরে বসে তৈরী করে ফেলে অন্যের লেখা বলে দপ্তরে জমা দিয়ে গেলেন।..কিন্তু গেলেই কি মিটে গেল? চালাকি ধরা পড়ল না?

ধরা পড়িয়ে দিল হাতের লেখা!

কার হাতের?

কেন ভয়ানক 'লাকি' কবির পতিগতপ্রাণা পত্নীর !

প্রথম তো অখ্যাত এক নবীন লেখকের লেখায় অগ্রাহ্যভরে একটু চোখ বুলিয়েছিলেন প্রকাশনা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শ্যামলবাবু। কিন্তু চোখ বুলিয়েই চোখ কুঁচকেছিলেন।

প্রথম চোখ-কোঁচকানোটি হচ্ছে লেখকের নাম যা-ই হোক, হাতের লেখাটা যেন মেয়েলি-মেয়েলি। তো সে যাক, নতুন লেখক হয়তো ধরে-ধরে গোটা গোটা অক্ষর দিয়ে লিখেছে।....

দ্বিতীয়বার চোখ কোঁচকালেন লেখার স্টাইল দেখে! আরে ব্বাস্! এ তো দস্তুরমতো পাকা কলমের কারিগরি!...এ লেখা এক অভাগা হতভাগা নতুন লেখকের?

অসম্ভব! তাছাড়া 'অভাগা হতভাগা' সম্পর্কে পুরন্দর রায়ের সনির্বন্ধ আবেদন! কিছু-একটা রহস্য আছে।

তারপর রহস্য আবিষ্কার করে বসল সুদীপ। বলে উঠল, 'এ হাতের লেখা তো পুরন্দরদার বৌয়ের!'

'অ্যাঁ? তাই নাকি? তুমি চেনো?'

‘চিনি। প্রমাণও দেখাতে পারি।’

আশ্চর্য! এনে দেখাল প্রমাণ। কোনোকালের কী তুচ্ছ দুটো চিরকুট। সে দুটোকে যে সুদীপ এমন সযত্নে তুলে রেখেছিল কেন, সেটাই আশ্চর্য!

একটা তো বেশ কিছুকাল আগের। ছোটো ছেলেমেয়েদের রাফখাতা থেকে একটুকরো ছিঁড়ে-নেওয়া লাইনটানা একটু কাগজে। লেখা রয়েছে—‘তোমার মার হঠাৎ খুব অসুখ শুনে আমি বীরেশের সঙ্গে তালতলায় চলে এসেছি। পারো তো শীঘ্র চলে এসো!’

সম্বোধনবিহীন এবং সাল-তারিখ-বিহীন চিঠি। তবে খামের ওপর পুরন্দরের নাম ও ‘চক্রবাল’ অফিসে ঠিকানা লেখা ছিল। খোলা সাদা খাম।

দিয়ে গিয়েছিল একটা আধবুড়ো রাঁধুনী ঠাকুরটাকুর গোছের লোক। ...বোধহয় পুরন্দরদের তালতলার বাড়ির রাঁধুনীই হবে।

আর একটা চিরকুট-জাতীয় চিঠি। তাতে অবশ্য সাল-তারিখ রয়েছে। এবং তারিখের নিচে একটা লাল পেন্সিলের দাগ টানা।

এটা একটু বিশদ, ‘টেলিফোনটা এই মুহূর্তে হঠাৎ মারা পড়ল। তাই শুভ্রকে দিয়ে লিখে পাঠাচ্ছি—আজ তোমার রাঙাদির মেয়ের বিয়ে, মনে আছে তো? ভুলে গিয়ে দেরি করে বোসো না।....আমার পক্ষে একা উত্তরপাড়ায় যাওয়া সম্ভব নয়। না-গেলে কী হবে খেয়াল রেখো।’

শুভ্র পাড়ার একটি কবিযশপ্রার্থী সদ্য কিশোর। কবি পুরন্দরের নামে বার্তা নিয়ে ‘চক্রবাল’ অফিসে মাথা গলাবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সুবীরের হাতে এল কী করে এ জিনিস?

সুবীর মধুময় হাসি হেসে বলেছিল, ‘পুরন্দরদার টেবিল থেকে!’ চিঠির মর্মগ্রহণ করার পর উনি তো ওটাকে দরকারি মনে করে তুলে রাখবেন না? ইয়ে প্রেমপত্র তো নয়। আমি কিন্তু বাবা চোখ পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহ করে ফেলেছিলাম। কে বলতে পারে কবির নামে কবিপত্নীর এই টুকরো চিঠিদুটোই ভবিষ্যতে নিলামে তুলে চড়া দাম পেয়ে যাব কিনা!

সুবীর ওইরকমই ইয়ার-মার্কা ছেলে। ওইরকমই কথাবার্তা ওর। তবে আপাতত তো চড়া দাম একটা পেয়ে গেল।

দু-দুটো প্রমাণপত্র দাখিল করে ফেলল যখন, তখন আর কারো সন্দেহ রইল না!

হিসেব মিলে গেল। দুই আর দুইয়ে চার। কবি পুরন্দরের অত লেখার ধৈর্য নেই, তাই তিনি ডিকটেশন দিয়েছেন এবং ‘পতিপ্রাণা সতী’ তাকে মুক্তো-হেন অক্ষরে লিখে-লিখে খাতা ভরিয়ে তুলেছেন।

এই অঙ্কটি মিলে যাবার পরই 'চক্রবাল' অফিসের কেষ্টবিষ্টুদের টেবিলে হৈহৈ রৈরৈ।

অতঃপর এরকম ক্ষেত্রে যা হয়। যতসব গ্রাম্য প্রবাদগুলোই সকলের মুখে এসে যায়। কী পুরন্দরদা? এ যে একেবারে ডুবে-ডুবে জল খাওয়া? শ্যামলবাবু বলছেন দারুণ ভাষা।... 'আমার দ্বারা হবে না, আমার দ্বারা হবে না?' বলে বলে, 'উঃ। ...আচ্ছা পুরন্দরদা? এত চালাকি খেলে, বেচারি শশাঙ্ক বাবুকে এত ভুগিয়ে এভাবে লেখাটা সাপ্লাই করলেন কেন? দর বাড়াতে নিশ্চয়ই।...কী পুরন্দরবাবু। তবে নাকি আপনার কলমে গদ্য গাঁথে না?....'

'...পুরন্দরদা আমাদের হচ্ছেন গভীর জলের রুই।....'

'বঁড়শিটি গিলেও অনেকখানি খেলিয়ে তবে ধরা দিলেন।...'

শশাঙ্ক ঘোষাল বয়েসে অনেক বড়ো, তাই বাবুটাবু বলেন না, বলেন 'কবি পুরন্দর'।

তিনি পুলক গোপন করে গম্ভীর-গম্ভীর গলায় বললেন, 'এই বুড়ো ভদ্দরলোকটাকে এমন খেলিয়ে মজা দেখে কী লাভ হল, হে কবি পুরন্দর? যাক, শেষপর্যন্ত বাঁচালে বাবা! আমি তো ইতিমধ্যে এখানে-ওখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ছেড়ে বসে আছি। ...আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতাদের মারফত মফঃস্বলের কিছু কাগজে-টাগজেও! আর এই দ্যাখো—সামনের মাসের 'চক্রবাল'-এ দেবার জন্যে লেখা হয়ে রয়েছে। ফাইল হাঁটকে একটু নমুনা দেখালেন এবারের 'চক্রবাল'-এর নতুন আকর্ষণ কবির কলমের প্রথম উপন্যাস ....কী নাম সেই কবির?...কী নাম সেই উপন্যাসের? ক্রমশ প্রকাশ্য।...'

পুরন্দর রায় বলেছিল, 'এইভাবে বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলেন?'

'দিচ্ছিলাম কী হে? দিয়ে দিয়েছি তো।'

'কী মুশকিল! যদি বলি ও-লেখা সত্যিই আমার নয়?'

'বললে শুনছে কে? যখনই শুনেছি, তুমি নাকি কোনো-নো-কোনো এক নতুন লেখকের লেখা ম্যানাস্ক্রিপ্ট নিজে বয়ে এনে শ্যামলকে বিশেষ অনুরোধ করে গেছ একটু চোখ বুলিয়ে দেখতে। আর তাড়াতাড়ি যদি গতি হয়, তার ব্যবস্থা করতে—, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, শ্যামলবাবুরও তখনই সন্দেহ হয়েছিল। এবং সংশ্লিষ্ট আরো কারো-কারো। ব্যাপারটা কী? পুরন্দর রায় নামের লোকটা হঠাৎ এমন দয়ার অবতার হয়ে উঠল কেন?'

...কথার চাষ চলে।

এমনকি পিওন মুকুল দাসটা পর্যন্ত ঘাড় চুলকে বলেছে, 'আপনি যে, স্যার,

দেখছি সেই যাকে বলে কানপুর ঘুরিয়ে নাগপুর দেখানো—তাই করলেন।

সবাই কিছু-না-কিছু বলেছে।

এবং নিশ্চিত বলে ধরে নিয়েছে, কবি পুরন্দর শশাঙ্কবাবুর অনুরোধ ঠেলতে না পেরে লিখেই ফেলেছেন একখানা মোটাসোটা উপন্যাস। তবে আগে খুব 'না না' করেছিলেন বলেই লজ্জার বশে একটু কৌশল করে জিনিসটা ছাড়লেন!'

কিন্তু ভাগ্যিস ছাড়লেন!

একেই বলে, হাত ছোঁয়ালেই সোনা।

আর মানতেই হবে শশাঙ্ক ঘোষাল সত্যিই প্রতিভা আবিষ্কারের ক্ষমতা ধরেন।

তাঁকেও তো স্তাবকের দল বিগলিতকণ্ঠে ধন্য ধন্য করে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

তাই-না আজ তিনি খুশি হয়ে দারুণ খাইয়ে দিলেন কিছুজনকে।

আর সেই সময়ই পুরন্দর সুনয়নাকে ফোন করে বলে উঠেছিল, 'তুমি আমায় ডোবালে।'

ভেবেছিল, বাড়িতে এসেও সেই সুরেরই জের টেনে বলে উঠবে, 'আর বোলো না। যা একখানা কাণ্ড ঘটালে তুমি!..ঠিক যে সময় শশাঙ্কবাবু আমায় 'উপন্যাস উপন্যাস' করে খেয়ে ফেলছেন, সেই সময়ই তোমার ঝড়াৎ করে একখানা উপন্যাস ভূমিষ্ঠ হয়ে বসল। ...আবার তদ্দণ্ডেই 'চক্রবাল' অফিসে চালান করার বাতিক চাপল।' ...তারপর রসিয়ে রসিয়ে বলবে, অফিসে কে কী মন্তব্য করেছে, কী কী ঘটনা ঘটেছে, সুদীপটা কীভাবে হাতের লেখা চিনে ফেলে সেটা চাউর করে বসে এই কেলেঙ্কারিটি করে বসেছে!

হ্যাঁ, মনে মনে খানিকটা রিহার্সালও দেওয়া ছিল।

কিন্তু কীভাবে যে কী হয়ে গেল!

সুনয়না যেই শান্তভাবে জিগ্যেস করে বসল, ব্যাপারটা কী বলো তো? ...সেই পুরন্দর বলে উঠল, 'তার আগে তুমি আমার একটা কথার জবাব দাও তো!'

প্রশ্নের উত্তরের বদলে একটা প্রশ্নই সুনয়নার ওপর এসে আছড়ে পড়ল। অন্তত সুনয়নার তা-ই মনে হল। অথচ পুরন্দর খুব ধীর আর গম্ভীরভাবেই বলেছে, 'আগে তুমি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো।'

সুনয়না কেন হঠাৎ কেঁপে উঠল? সুনয়নার মধ্যে এ আশঙ্কা ছিল না তাহলে? ভেবেছিল, পুরন্দরই বুঝি কোণঠাসা হয়ে যাবে? ওর সহকর্মীদের এই উল্লাস আর সন্দেশের বাক্সর মানে বোঝাতে থতমত খাবে।

তবু সুনয়না সহজেই ঠাট বজায় রেখে বলে উঠল, 'শোনো কথা! আমিই কোথায় জানতে এলাম ব্যাপারটা কী, আর তুমি কিনা—'

'হ্যাঁ, আমিই আগে জানতে চাইছি—যে লেখাটা সেদিন আমার ব্রিফকেসে পুরে রেখেছিলে, সে লেখাটা কার?'

সুনয়নার সারা শরীরের রক্ত কি মুখে এসে জমা হতে চাইছে? তা না-হলে সুনয়নার মুখটা এমন গরম লাগছে কেন?... হ্যাঁ, গরমটাই অনুভব করছে সে, লালটা তো দেখতে পাচ্ছে না। তবু সুনয়না নিরীহ-নিরীহ মুখ করার চেষ্টা করে বলল, 'কেন? সেই একটা হতভাগা নতুন লেখকের।'

'বাজে কথা রাখো। লেখাটা 'তোমার' বলেই বলেছিলে। কিন্তু সত্যিই তোমার? কোনোখান থেকে টুকলিফাই করোনি তো?'

হঠাৎ সুনয়না অনুভব করল, কোথাও কিছু একটা ঘটেছে সুনয়নাকে শক্ত থাকতে হবে, স্থির থাকতে হবে। সুনয়না একটা বর্ম পরে নিল। সেই বর্ম-পরা গলায় বলল, 'এ-কথার মানে?'

পুরন্দর এখন একটু কৈফিয়তের গলায় বলল, 'মানে হচ্ছে—লেখাটা কিন্তু একদম পুরুষালি।'

'ওঃ। এই কথা!'....

সুনয়না বর্মের বোতামটা আর-একটু এঁটে নিল। বলল, 'লেখার মধ্যে মেয়েলিত্ব থাকাটাই তাহলে ন্যায্য? তা ছদ্মনামটা যখন পুরুষের, তখন আর আপত্তিটা কোথায়?'

পুরন্দর একটা সিগারেট ধরাল। বলল, 'আপত্তির কথা নয়। মানে লেখার স্টাইলটা এমন পুরুষালি, বিষয়বস্তুও। বিশ্বাস হচ্ছে না যে কোনো মেয়ের কলম থেকে—'

সুনয়না এখনকার এই আপাত-প্রসঙ্গটা যেন প্রায় ভুলেই গেল। তীক্ষ্ণ একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'মেয়েরা কীরকম লেখে না-লেখে জানো তোমরা? মেয়েদের লেখা পড়ো? ক্ষ্যামাঘেন্না করে হয়তো কবিতা দু-একটা পড়ো, তাও যে-মেয়ে হ্যাংলার মতো তোমাদের কাছে এসে সেটি নিবেদন করে 'কেমন হয়েছে' জানতে চায়। হয়তো তখন তার একটু পিঠ চাপড়ে বলো, 'বাঃ! বেশ হয়েছে তো! চালিয়ে যাও।'....যদিও সে কবিতারা তোমাদের পাশাপাশি চলতে এলে অবজ্ঞার হাসি হাসো!....কিন্তু তোমাদের ভাষায়—মেয়ে-লেখকের লেখা গল্প উপন্যাস ভ্রমণকাহিনী-টাহিনী উল্টে দেখো কখনো? নাক কুঁচকে ভাবো, 'মেয়ে লেখকের লেখা আবার পড়বো কী?...ওর মধ্যে খানিকটা ভাবালুতা ছাড়া আর আছেটা কী?' তোমরা পুরুষজাতটা যেন বিধাতাপুরুষের স্বজাতি—এই অহঙ্কারে বিধাতার 'শস্তামার্কা প্রোডাকশন' মেয়েদেরকে 'মানুষ' বলে ধর্তব্য করতেই নারাজ। ...তবে হ্যাঁ, মেয়েদের 'রূপ' জিনিসটাকে অবশ্যই মূল্য দিয়ে

থাকো। হয়তো বাড়াবাড়ি রকমেরই দিয়ে বসো কখনো-কখনো। তোমরা একটা 'রূপবতীর' জন্যে রাজ্য ধ্বংস করতে পারো, সংসার ধ্বংস করতে পারো, আত্মধ্বংস করতে পারো। কিন্তু তাদের গুণটুনগুলো? দূর্! সৃষ্টিকর্তা যাদের মাথার মধ্যে 'মগজ' জিনিসটাই দিতে ভুলে গেছে, তাদের মধ্যে আর কী থাকবে?....তারা 'মেয়েলি' হলে অবজ্ঞার, আর পুরুষালি হলে বিরক্তির।

সুনয়না যেন হঠাৎ ভুলে গেছে তারা কোন্ প্রসঙ্গে ছিল। তাই তার মনের মধ্যে জমে-থাকা অনেক কথা যেন হঠাৎ আলোড়ন তুলে বেরিয়ে আসতে চায়।...মনের মধ্যে পাক খেতে থাকে অজস্র অভিযোগ। ...তোমরা জানো, তোমাদের ভিতরের যন্ত্রণা-বেদনা, অনুভূতি উপলব্ধি আর বক্তব্যদের মুক্তি দিতে নিরবচ্ছিন্ন নিশ্চিন্ততা চাই। তাই 'সংসার' নামক জিনিসটাকে অনায়াসে ভুলে যেতে পারো। অনায়াসে বলতে পারো, 'ওসবের মধ্যে আমি নেই। সব আমার স্ত্রী জানেন।' ....আত্মপ্রকাশের যন্ত্রণা অস্থিরতা তোমায় ব্যাকুল করলে তুমি ঘণ্টায়-ঘণ্টায় চা-কফি খাবে, প্যাকেট-প্যাকেট সিগারেট ওড়াবে, হয়তো-বা গেলাস-গেলাস 'দামি পানীয়ও' গলায় ঢালবে এবং হয়তো রাত জেগে সারারাত ছাদে বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াবে। তুমি ভুলে যাবে আরো কেউ একজন তোমার জন্যে অকারণ রাত জেগে মরছে, কারণ তুমি হয়তো রাতের খাবার খাওনি। 'আমার খাবার ঢেকে রেখে তুমি খেয়ে নাওগে—' বলে তুমি সৌজন্য সেরে রেখেছ।

কিন্তু সত্যি তেমন ঘটনা ঘটলে কি তুমি খুশি হবে? তোমার স্ত্রী খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে দেখলে, তুমি নিঃশব্দে ঢাকা খুলে তোমার খাবারটা খেয়ে নেবে?....তা আর নয়। তোমার পক্ষে এতখানি উদারতা সম্ভব?....সকালবেলা তোমার বৌ সেই পড়ে-থাকা খাবারটা দেখে হতবাক হলে তুমি অনায়াসে বলবে, 'ওভাবে একা বসে ঢাকা খুলে নিজে নিয়ে খেতে প্রবৃত্তি হয়নি।'

এরপর আর কোনোদিন কি তেমন ঘটনা ঘটতে সাহস পাবে? তুমি নিজে বিশৃঙ্খল হবে, কিন্তু তোমার সংসারে সুশৃঙ্খলা থাকবে— এটা তুমি চাইবেই। আর সর্বদা সেই সুশৃঙ্খল পরিবেশটি রচনা করে তোমার স্ত্রী তোমায় উপহার দেবে—এটা তোমার নিশ্চিত প্র্যাপ্যের তালিকায় থাকে। তোমার চাওয়াটাই শেষ কথা।.....

কারণ, তুমি *সৃষ্টিকর্তার মূল্যবান সৃষ্টি*। এবং তার ওপর বাড়তি মাত্রা, তুমি কবি সাহিত্যিক শিল্পী।.....

তাছাড়া তোমাদের পুরুষ জাতটা মাত্রেরই তো এই ধারণা বদ্ধমূল, পৃথিবীর জন্যে সৃষ্টি হয়েছে পুরুষ।...আর পুরুষের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে নারী! পুরুষের

সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দবিধানের জন্যেই তারা। তারা না পৃথিবীর, না নিজের। তারা শুধু পুরুষের সম্পত্তি।

বোকা মেয়েজাতটাও চিরকাল সেইটাই সঠিক বলে মেনে এসেছে।...অথবা বোকা না হয়েও...বুঝেসুঝেও বোকা সেজে তোমাদের এই ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়ে আসছে।...হয়তো মমতায় ভালোবাসায়, হয়তো-বা আপন হৃদয়ের দুর্বলতায়। মেয়েদের সবথেকে বড় চাওয়া একটা সংসার! স্বামী-সন্তান নিয়ে গড়া একটি সংসার।...আর এই চাওয়াটির জন্যেই যে সে পুরুষের মুখাপেক্ষী, সেটা বুঝে ফেলেই হয়তো পুরুষের এই ঔদাসীন্য।....

এসব কথা কি সুনয়না এখনই বলে উঠছে?

না না! এ শুধু হঠাৎ একটা ধাক্কায় জমে-থাকা এই কথায় স্রোত বাঁধ ভেঙে মনের মধ্যে উপচে উঠছে। আলোড়িত করছে। সুনয়নার মুখে এখন আর কথা নেই, শুধু মুখটা লাল-লাল উত্তেজিত। কিন্তু সারাজীবনের জমানো অভিযোগ হঠাৎ এমন উথলে উঠতে চাইছে কেন?... তার অন্তরালে অবচেতনে কি রয়েছে পুরন্দরের এই কাঁপিয়ে-দেওয়া প্রশ্নটার প্রতিক্রিয়া?

সুনয়নার মধ্যে ভয়ের অন্ধকার।

'লেখাটা কী সত্যি তোমার? লেখাটা কি সত্যি তোমার?'

ওই লাল-লাল উত্তেজিত মুখটার দিকে—

পুরন্দর তাকিয়ে দেখল। কী ভাবল কে জানে। 'টুকলিফাই' কথাটা বলা বোধহয় ঠিক হয়নি। অপমান বোধ করেছে।...কিন্তু সেটাকে অগ্রাহ্য করে নিশ্চিত হওয়া তো চলবে না এখন। এখন যে পুরন্দরের সন্ধির দরকার।

তাই পুরন্দর অলস ভঙ্গি ত্যাগ করে সোজা হয়ে বসে একটু মধুর হাসি হেসে বলল, 'ভীষণ চটে গেছ মনে হচ্ছে! বিধাতা যদি তোমাদের মধ্যে কিছু দিতে ভুলেই গিয়ে থাকে, আমাদের কি দোষ? তবু তার ঘাটতিটা তো আমরা চিরকালই কী বলে ভর্তুকি দিয়ে ম্যানেজ করে আসছি। আর সে-খবরটি ঘোষণা করে স্বীকার করতেও ছাড়িনি। 'শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী—'

সুনয়না বলে ওঠে, 'জানি। জানি ওই ভর্তুকিটি দিয়ে চলায় তোমাদের বেজার নেই। বেজার হও যদি তারা ওই ভর্তুকিটা ছাড়াই সোজা হয়ে দাঁড়াতে চায়। তোমাদের পাশাপাশি চলতে চায়।'

পুরন্দর বলে ওঠে, 'সেরেছে। কোনো নারীমুক্তি আন্দোনের পাণ্ডা হয়ে তার জন্যে ভাষণ-টাষণ কিছু লিখছিলে নাকি? তাই এইসব জোরালো-জোরালো কথাগুলো স্টকে জমা রয়েছে। আরে বাবা, পাশাপাশির বদলে তারা তো তোমাদের হৃদয়কোটরে ভরে রেখে পৃথিবীর সব ঝড়ঝাপটা থেকে আগলাতেই চেয়ে এসেছে চিরকাল।'

'হ্যাঁ, তা এসেছে। তবে যখনি কোনো ঝড়ে পড়ে ডুবতে বসে, তখনই বেমালুম গা-ঝাড়া দিয়ে বলে ওঠে, 'ওই ওরাই! ওরাই ডোবার কারণ। ওরাই আমাদের ডোবায়।'

পুরন্দর আবার ভঙ্গিতে অলসতা এনে কাৎ হয়ে বসে সিগারেটের ধোঁয়াটা ওপর দিকে উড়িয়ে তেমনিভাবে হেসে বলে, তা সেটাও তো মিথ্যে নয়। সেই 'ডুমুরপাতার' আমল থেকেই তো তোমরা আমাদের ডুবিয়ে আসছ হে! কে প্রথম খেতে চেয়েছিল জ্ঞানবৃক্ষের ফল?...তো সেসব তো তামাদি ব্যাপার—'

পুরন্দর যেন এখন হঠাৎ তার বক্তব্যকে প্রকাশ করতে পারার একটু সূত্র হাতে পেয়ে লুফে নেয়। তাই বলে ওঠে, 'এখন তুমিও তো এক কাণ্ড করে এই অভাগাকে ডুবিয়ে বসলে!'

সুনয়না থমকাল।

'ওঃ। এতক্ষণে তার প্রশ্নের উত্তর পাবে মনে হচ্ছে। তবু বলল, 'আমার এত কী সাধ্য যে জাহাজ ডোবাই?'

'পাকেচক্রে হয়ে বসল তো তাই।...'

পুরন্দর আবার সোজা হয়ে উঠে বসে, বলে উঠল, এই শূন্যঝুলি অভাগাকে যখন ওরা 'উপন্যাস উপন্যাস' করে খেয়ে ফেলছে, ঠিক তখনই কিনা তুমি দুম করে একখানা ওই তোমার ভাষায় 'মারকাটারি' মার্কা হৃষ্টপুষ্ট উপন্যাস ওদের দপ্তরে সাপ্লাই করে বললে— তাও একদম পুরুষালি। ফলে, এক বিশ্রী ব্যাপার।

সুনয়না কী একটা অশনিসঙ্কেত শুনতে পেল।

তাই ভাবলেশশূন্য হয়ে গেল? আর সেই শূন্যতা নিয়ে তাকিয়ে শিথিলভাবে বলল, 'এতে বিশ্রীর কী হল?'

'হল আর কী? দুই আর দুইয়ে চার। ওরা ভেবে বসল, ওটা আমারই ছল। ছদ্মনামটা আমারই।'

সুনয়না যেন হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল, 'ছদ্মনামটা তোমারই?'

'সেই তো বিপদ। ওখানে ওদের কে যেন তোমার হাতের লেখাটি চিনে বসে রেখেছিল, কাজেই সে স্রেফ দরাজ গলায় বলে উঠল, বোঝা গেছে—দাদার বেশি লেখার ধৈর্য কম, তাই ডিকটেশান দিয়ে গেছে, আর বৌদি সযত্নে লিখে লিখে—আসলে ওই 'অভাগা নতুন লেখক' একটি কাল্পনিক চরিত্র মাত্র। 'উতঙ্ক উপাধ্যায়' বলে কেউ নেই।'

সুনয়নার পায়ের তলায়ও কিছু নেই।

সুনয়না তলিয়ে যাচ্ছে।

সুনয়না হাতের কাছে কিছু আঁকড়ে ধরে নিজেকে দাঁড় করাতে পারছে না।... সুনয়নার মাথার মধ্যে সব যেন ওলটপালট হয়ে যায়।....

সুনয়না শোভন-অশোভনতার প্রশ্ন ভুলে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল, কী-কী? বলছ কী তুমি?

পুরন্দর আশ্চর্য না হয়ে পারে না।

হ্যাঁ, হতে পারে আচমকা একটা আশাভঙ্গে বিচলিত হয়ে পড়েছেন মহিলা। তাই বলে শোভনতার ধার ধারবে না? ঘটনাটা তো বাইরের লোকের সঙ্গে জড়ায়নি, জড়িয়েছে পুরন্দর রায়ের সঙ্গে। যার সঙ্গে তুমি সুনয়না রায় জীবনে-মরণে জড়িয়েই আছ। তাছাড়া তোমার লোকসানটা কোথায়, তা তো ভেবে পাচ্ছি না।...তুমি 'উতঙ্ক উপাধ্যায়' নামের এক কুশপুত্তলী গড়ে, তার আড়ালে দাঁড়িয়ে পাঠকসমাজের প্রতি শরসন্ধান করতে চেয়েছিলে। তোমার ভয় ছিল, পাঠকসমাজে যদি পাত্তা না পায় তোমার জীবনের প্রথম উপন্যাস, তো 'যা শত্রু পরে পরে।' নিন্দে বা ঔদাসীন্য যাই কিছু আসুক ওই কুশপুতুলের ওপর বর্তাবে।...তা লিখে বসেছ নাকি তুমি দারুণ। ওরা তো তাই বলছে। হয়তো আমাকে টেনে নামানোর তালে একটু বেশি বেশিই বলছে। তো সেসবই তো তোমার নামের আওতা বাঁচিয়ে। ওই 'দারুণটা' যদি তোমার একটা উৎকট ছদ্মনামের ভোগে না লেগে তোমার প্রিয়তম স্বামীর নামের ভোগেই লাগে, তুমি অমন সাপের ছোবল খাওয়ার মতন আর্তনাদ করে ওঠলে কী বলে?... হুঁ। স্বামীর সম্পর্কে যে তোমার কতখানি 'কী' তা বোঝা গেল। আসলে তুমি অবশ্য ভেবেছিলে, ওই বানানো নামটা তো তোমার 'গোলার ধানটি' কেড়ে নিয়ে যেত না। তুমি জানতে, তোমার জিনিস তোমারই আছে। এ এখন বিপদ হল, জিনিসটা আর 'তোমার' থাকল না।

তা হঠাৎ মনখারাপ একটু হতে পারে। তা বলে, এতটা 'আপসেট' হওয়া কি উচিত? অন্তত সৌজন্য হিসেবে এটাকে একটা 'মজা' হিসেবে দেখার চেষ্টা করা উচিত ছিল তোমার।

পুরন্দর শুধু বিস্মিত হল না, একটু আহতই হল। কিন্তু তারও আর এখন কিছু করার নেই। বল অন্যের কোর্টে চলে গেছে। মেজাজ দেখিয়ে ফিরিয়ে এনে সুনয়নার কাছে ফেলে দেবে, উপায় নেই। পুরন্দর তাই একটু গম্ভীর ভাব দেখিয়ে বলল, আসল গোলমালটা তো তুমিই বাধিয়ে বসেছিলে। কী দরকার ছিল ওই সব ছদ্মনামটামে? সোজাসুজি লেখার তলায় যদি নিজের নামটা বসিয়ে রাখতে, কারুর সাধ্য হত তাতে দাঁত বসাবার?...তা নাম দেওয়া

তো দূরস্থান, আমার প্রায় মাথার দিব্যি দিয়ে রেখেছিলে, যাতে কিছুতেই না তোমার নামটি প্রকাশ হয়।...অথচ 'হাতের লেখার' মহিমায় প্রকাশ হয়ে বসলে।...এখন আমার অবস্থাটি বোঝবার চেষ্টা করো, প্রিয়া। সকলে মিলে হৈচৈ করতে করতে আমায় একেবারে নদীর কিনারে এনে ফেলেছে। ঠেলে জলে ফেলে দেবেই। পরিত্রাণের আশা নেই।

সুনয়না স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে ওই হাস্যোজ্জ্বল মুখটার দিকে। গম্ভীর হবার চেষ্টা করলেও, মুখের ঔজ্জ্বল্য ঢাকা যাচ্ছে না। কারণ ওকে তো আর সত্যি কেউ নদীর কিনারে এনে ফেলে ঠেলে দিতে বসেনি। বরং ওকে নদীর তীরে নিয়ে এসে একখানা মজবুত নৌকোয় চাপিয়ে দিচ্ছে সবাই মিলে। যে-নৌকোয় রয়েছে অর্থ, খ্যাতি, বাহবা!

কিন্তু সুনয়না?

সুনয়না চোখের সামনে শুধু খানিকটা ধোঁয়া দেখছে। ওটা কী পুরন্দরের সিগারেটের ধোঁয়া? কুণ্ডুলি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে!...সেই ধোঁয়া এতোখানি? তাই সুনয়না অন্য আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। পায়ের তলার মাটিও নয়। সুনয়না তাই যেন একটা গভীর গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। ...'পথ জনহীন' নামে আপাতত কোনো বই বেরোচ্ছেনা, ঝকঝকে একখানি চেহারা নিয়ে। যেখানাকে বুকে করে সুনয়না একটা ভগ্নদশাগ্রস্ত বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল। বেড়ার দরজা খুলে ঢুকে পড়ছিল। কাঁপাকাঁপা গলায় ডেকে উঠছিল, 'ছবি!'

না, সে বই এখন 'চক্রবাল'-এর হৃষ্টপুষ্ট শারদীয় সংখ্যাটির হৃদয়ে বিরাজ করবে কবি পুরন্দর রায়ের নামে। 'পদ্য-র কলমে গদ্য'! কবির প্রথম প্রচেষ্টা।

পুরন্দর হঠাৎ চমকে বললো, 'কী হলো?'

হাতের সিগারেট মাটিতে ফেলে দিয়ে না নিভিয়েই তাড়াতাড়ি উঠে সুনয়নাকে ধরতে গেল। না গেলে? সুনয়নাকে দেখে তো মনে হলো, পড়ে যাচ্ছে। সুনয়নার সেই উত্তেজিত রক্তিম মুখটা হঠাৎ যেন সাদা হয়ে গেছে। সুনয়না ভারসাম্য হারাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে পাশের দেয়ালটা ধরতে চেষ্টা করছে।

পুরন্দর ভয় পেলো! ব্যাপারটা কী? বললো, 'কী হলো?' তাড়াতাড়ি উঠে এলো সুনয়নাকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে!

সুনয়না নিজেই দেয়াল ধরে সামলেছে ততোক্ষণে। আস্তে হাত নেড়ে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বললো, 'বিকেল থেকে মাথাটায় কেমন যন্ত্রণা হচ্ছে, ঘুরছে। বুকটাও কেমন যেন— শুয়ে নিইগে একটু।'

পুরন্দর দিশেহারা ভাবে বলে, 'ডাক্তারকে ফোন করবো?'

সুনয়না হাত নেড়ে বারণ করলো।

'বাঃ! বলছো মাথা ঘুরছে। বুকেও— কই, এরকম তো হয়না। না না, ডাক্তার ঘোষকে একটা ফোন করি—'

সুনয়না আবারও হতে নেড়ে বারণ করে।

ক্ষীণভাবে বলে, 'ভেবেছিলাম একটা মাথাধরার টাবলেট খেয়ে নেবো। খাওয়া হয়নি।'

আস্তে এগিয়ে যায় শোবার ঘরের দিকে।

কবি পুরন্দর রায় স্মার্ট পুরন্দর রায় হঠাৎ যেন বোকা বনে যায়। সামান্য একটা 'কথার আঘাতে' এমন হতে পারে? কিন্তু সুনয়না কী ঠিক সে রকম? কতোদিন কতোরকম পরিস্থিতিই তো ঘটে, কই, কখনো তো ওকে এমন বিচলিত হতে দেখা যায় না। মুখ চোখের চেহারা হঠাৎ এমন বদলে যেতেও তো দেখেনি কখনো। কীরে বাবা। স্ট্রোক ফ্রোক হয়ে বসবেনা তো? ভেতরে ভেতরে 'হাই প্রেসার' নেই তো?

পুরন্দরকে এমন হতভম্ব হতে দেখা যায় না।

সুনয়নার পিঠে একটা হাতে ঠেকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যেতে যেতে শুকনো গলায় বলে, 'কই কোনোদিন তো এমন—'

সুনয়না এখন নিজেকে একটু সামলে নিতে পেরেছে। সুনয়না এখন শুধু একটু শুয়ে পড়তে যায়।

সুনয়না ক্ষীণভাবে বলে, 'সেই তো। হঠাৎ যে আজ কী হল। আচ্ছা, একটু শুয়ে নিই।'...চলে আসে শোবার ঘরে, কিছুক্ষণের জন্যে তো অন্তত আত্মরক্ষা হবে। কিন্তু পুরন্দরও চলে আসে। বলে, 'কই কোথায় তোমার কি ট্যাবলেট আছে?'

'আমার আর কী আছে? তুমি যেটা যখন তখন খাও সেটাই একটা খেয়ে নিয়ে ঘর অন্ধকার করে খানিকক্ষণ ঘুমোতে পারলেই—'

যাক বাবা। যা ভাবছিল পুরন্দর, তাহলে তা নয়। সত্যি সুনয়না হঠাৎ এত নীচ, এত ছোট হবেই বা কেন? সুনয়নার চরিত্রে তো এ জিনিস দেখা যায় না।

আহা, বেশ কিছুক্ষণ কথা চালাবার ইচ্ছে ছিল পুরন্দরের। অর্থাৎ, বিশদ হতে ইচ্ছে ছিল। বোঝাতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কী অদ্ভুত নিরুপায় অবস্থায় পুরন্দরকে এমন একখানা বাজে ব্যাপার মেনে নিতে হয়েছে। বলে টলে বলতো, 'ওহে সহধর্মিণী! এখন একটু সহমর্মি হও।'

শালা পুরন্দর রায়ের অবস্থাটা একবার অনুধাবন করবার চেষ্টা করো।...

ভেবে দেখো এবার না হয় 'দশচক্রে ভগবান ভূত',...কিন্তু এরপর? আবার যখন তাড়না আসবে?...এই একবারে তো আর ছেড়ে দেবে না আমায়? ছেড়ে দেবার জন্যে তো আমায় এভাবে টেনে নামায়নি।...ধরেই নিয়েছিল, আমার কলম থেকে যা বেরোবে, তা উৎকৃষ্ট হবে।...তা এ শালার দুর্দশার কপাল! তা না-হলে, তুমি চিরকাল একেবারে গোবেচারার মতো বসে থেকে কিনা হঠাৎ এমন ধারলো ছুরি একখানি বার করলে। তাজ্জব হয়ে গেছি সত্যিই তোমার ক্যাপাসিটি দেখে।...মাত্র ক'টা দিনের মধ্যে এমন একখানা লিখে ফেললে! আমি তো সত্যিই তাজ্জব। সবাই বলছে, রীতিমতো পাকা হাতের লেখা। তলে-তলে হাতকে এতটি পাকালে কখন, কী করে? ...তো পরিস্থিতি যা দেখছি, তোমায় না চিরকালের মতো 'ছায়া-লেখিকা' বনে গিয়েই কাটাতে হয়। তোমার পতিদেবতাটির মুখরক্ষা করতে, এবং ইয়ে—বেশ কিছু আয় উন্নতি ঘটাতে। ক্ষতিটা আর কি? শেষেরটা তো তোমার সংসারেরই উন্নতি ঘটবে, আর তোমার স্বামীর নাম-ডাক বাড়লে? সেটাও তো তোমারই লাভের খাতায়! আত্মত্যাগের এমন একখানা পরম মহিমা দেখিয়ে চলতে পারো তো বলি বাহাদুর।

এমনি কত কথা মনে-মনে ভেঁজে-ভেঁজে রাখছিল পুরন্দর, সে সব আর বলা হলো না।... আর বলা হল না, 'তবু বলবো সুনয়না, এই ভাষা তোমার হাতে এল কী করে? আর জেলখানার জীবনের অভিজ্ঞতা? সেটাই-বা পেলে কোথায়?' এটা আমার কাছে রহস্য।

কিছুই বলা গেল না আপাতত এখন।

সত্যিই দেখা গেল, না শুয়ে পারছে না বেচারা। যাক, তবু মন্দের ভালো। সত্যিই যদি পুরন্দরের সন্দেহ সত্যি হত? অর্থাৎ রাগে ক্ষোভে 'পতন ও মূর্ছা'।

এখন পুরন্দর মনে মনে একটু লজ্জিতই হচ্ছে। সুনয়না সম্পর্কে অমন একটা সঙ্কীর্ণ চিন্তা করছিল বলে।...সুনয়না তো কখানোই 'ক্ষুদ্র নয়'। না না সুনয়না এরকম নয়!

পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার ভঙ্গিতে কট্‌কট্ করে বেশ কিছু কথা হয়তো কখনো কখনো বলে বসে। কিন্তু তবু তার মধ্যে জ্বালা নেই। নেই সত্যিকার বিদ্রোহ! আসলে শরীরটাই হঠাৎ বিগড়ে বসেছে।

সুনয়নার অনেক গুণ! ভাবল পুরন্দর। ভেবে শান্তি পেল। কিন্তু সুনয়না ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে থাকলে, সেটাও একটু বলতে পারা যেত।

সে-সব কিছু হল না। আর কী করা? পুরন্দর বসবার ঘরে গিয়ে আলমারি খুলে বোতল গেলাস বার করল।

যাক, তবু কিছুক্ষণের জন্যে সময় মিলল 'সুনয়না রায়' নামের মেয়েটাকে সামনে মেলে ধরে, তার জালে জড়ানো জটিল অবস্থাটাকে দেখবার। শুধু দেখবারই-বা কেন, সে অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করবারও।

সুনয়না অনুমান করে, পুরন্দরও এখন কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বোতল-গেলাস নিয়ে বসেছে। সেটা আপাতত সুবিধের। সুনয়নার অনুপস্থিতি ঘটলে মাত্রা ঠিক রাখতে পারে না, এই যা অসুবিধে।

কী আর করা যাবে? সুনয়না কি ওকে পাহারা দিয়ে-দিয়ে চিরকাল 'মাত্রা'র মধ্যে আটকে রাখতে পারবে? বহিরঙ্গে তো নিরন্তর আয়োজন মানুষকে 'মাত্রাছাড়া' করে তোলবার। পৃথিবী লোভের পসরা সাজিয়ে বসে অবিরত হাতছানি দিয়ে চলেছে, 'চলে এসো, মাত্রাজ্ঞান হারাও।'

কেউ কোনোভাবে একটু বিশিষ্ট হয়ে পড়লে, কি একটু ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে উঠলেই তো তাকে ঘিরে থাকবে স্তাবকের দল। সব সময় যে কিছু প্রাপ্তির আশা থাকে তাও নয়। স্তাবকতাই সুখ।

আর ঘিরে থাকে আরো একটা দল, লোকটাকে ভাঙিয়ে খাবার তালে। যাদের নাম হচ্ছে 'ধান্দাবাজ'! অবোধ বালকেরা যেমন গাছের পেয়ারাগুলো ডাঁসা হবার আগেই 'কষা'দেরই পেড়ে খাবার চেষ্টা করে, নষ্ট করে, নষ্ট করে কুলগাছ থেকে টক কুলগুলোকে পেড়ে, আর কাঁচা আমগুলোকে বড়সড় না-হতেই ঢিল ছুঁড়ে আর ঠেঙিয়ে নামিয়ে-এও প্রায় তাই। 'ভাঙিয়ে খাবার' তালে প্রতিভাকে পরিণত হতে দেয় না। খেয়াল করে না যে, কোনো শিল্পীকেই তার প্রতিভা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন করে তোলা মানেই তার শিল্পচেতনার বারোটা বাজিয়ে দেওয়া।

কিন্তু কে খেয়াল করে সে কথা? আপাত-প্রাপ্তির লোভে লুব্ধ এই যুগ স্বর্ণহংসীর পেট চিরে সোনার ডিমগুলো সব বার করে নিতে চায়।

ভাবতে গিয়ে একটু থমকাল সুনয়না।... এখন এই পেয়ে-যাওয়া মহামূল্য সময়টুকু নিয়ে তুমি তোমার নিজের কথাটা ভাবো সুনয়না। ...দেখতে পাচ্ছো, এখন তোমার মরা ছাড়া আর কোনো পথ নেই! ...তোমার টুটুদার মতোই তুমি হঠাৎ এখন জনহীন পথে একা দাঁড়িয়ে পড়েছ। তোমার সঙ্গে কেউ নেই। কেনই-বা থাকবে? তুমি তো মাকড়সার মতো নিজেই নিজেকে ঘিরে জাল রচনা করে বসে আছ।

এখন ছবিকে মুখ দেখানোর থেকে অনেক সোজা মরে যাওয়া। পূজো সংখ্যা 'চক্রবালে' পুরন্দর রায়ের লেখা বৃহৎ উপন্যাস 'পথ জনহীন' প্রকাশিত হল—এ

দৃশ্য দেখবার জন্যে বেঁচে থাকবে নাকি সুনয়না? তার থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়াই শ্রেয়।

গলায় দড়ি।

সবথেকে অনায়াস অবলীলায় কথাটা উচ্চারণ করে থাকে লোকে। কিন্তু সেই ঝুলে-পড়ার দৃশ্যটি মনে করতেই শিউরে উঠল সুনয়না।

নাঃ। অমন বীভৎস একখানা দৃশ্যের নায়িকা হতে পারবে না সুনয়না। ওটা অচল।

আর গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই জ্বেলে দেওয়া? সেটাও আকছার ঘটে চলেছে।

না না। সে আরো বীভৎস!

সমস্ত অন্তরাত্মা যেন আর্তনাদ করে উঠল!

ভেবে অবাক হয়ে গেল সুনয়না। অথচ অহরহ ওই বীভৎস কাণ্ড ঘটে চলেছে সমাজে সংসারে।

সুনয়না পারবে না।

মরতে হলেও সুনয়নাকে সুন্দরভাবে মরতে হবে।

কী সেই সুন্দরভাবে মরা?

কে যেন কোথা থেকে বলে উঠল, 'কেন, ঘুমের বড়ি। যা নাকি মাত্রাছাড়া করে খেয়ে নিলে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারে।'

কিন্তু কোথায় অত স্টক?

তার জন্যে তাহলে অপেক্ষা করতে হবে। তা কিছুটা অপেক্ষা করাই বোধ হয় উচিত। এইক্ষণে এই দণ্ডে মরলে, পুরন্দর তো ধরেই নেবে, সুনয়নার মৃত্যুর কারণ ওই তার 'লেখা'র পরিণতি। তখন তো পুরন্দরও ধিক্কারের দৃষ্টি হেনে বলে উঠবে, ছিঃ সুনয়না তুমি এই। তোমার প্রাপ্য গৌরবটি তোমার স্বামীর খাতে গিয়ে পড়েছে বলে তুমি— ছি ছি, এত তুচ্ছের জন্যে জীবনটাকে বিকিয়ে দিলে তুমি? তুমি এত ছোটো? এত ক্ষুদ্র?

সুনয়না যেন এখন মনে-মনে একটু স্বস্তি পেল। থাক, এত তাড়াহুড়োর দরকার কী? পুজোসংখ্যা তো কালই বেরোচ্ছে না।

এখন সুনয়না ভাবতে চেষ্টা করল সুনয়নার আত্মহত্যার ঘটনায় সমস্ত পরিচিত সমাজে কী প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে।

সুনয়নার সামনে মুখের মিছিল!

এই ফ্ল্যাটবাড়ির খোপে খোপে যেসব চেনা মুখেরা সুনয়নার দিকে সমীহ সম্ভ্রম ঈর্ষা এবং কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তারা এসে দাঁড়াচ্ছে সামনে।...

এসে দাঁড়াচ্ছে— সুনয়নার সেই আত্মীয়সমাজের মুখেরা। পুরন্দরের দাদা বৌদি বোন, বোনের বর ও সে। এমনকি ওদের দীর্ঘদিনের পুরনো রাঁধুনীঠাকুরটা পর্যন্ত।

কী আছে সেইসব মুখে? দুঃখ? বেদনা? শোক?

নাঃ, ওসব কিছু না। শুধু বিস্ময়।

তাদের কাছে যে সুনয়নার সুখের শেষ নেই, সুনয়নার আরাম-আয়েসের অন্ত নেই, সুনয়নার মান-মর্যাদার তুলনা নেই।

সেই সুনয়না এই করল?

কেন? কেন? কেন? কী এমন হল হঠাৎ?

নিঃসন্তান জীবনের শূন্যতা?

তাতে কি কেউ অকস্মাৎ এমন কাজ করে বসে?

কিন্তু কেবলমাত্র তীক্ষ্ণ প্রশ্নের শরাঘাতে কেউ চুপচাপ থাকতে পারে না। মানুষের ধর্মই নয় সেটা। সে উত্তর খুঁজবেই।...আর যতক্ষণ-না অন্তত নিজের মনগড়া একটা উত্তরও আবিষ্কার করে ফেলতে পারবে, ততক্ষণ শান্তি পাবে না। সুনয়না সেই 'আবিষ্কারের' ফলশ্রুতিটি দেখতে পেল। সেই দেখতে পাওয়ার দৃশ্যে দেখতে পেল কাঠগড়ায় দাঁড়ানো কবি পুরন্দর রায়কে।

হ্যাঁ। স্থিরনিশ্চিত, শেষপর্যন্ত পুরন্দরকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে লোকে। ...বলবে নিশ্চয়ই ভিতরে-ভিতরে ঘটেছে কিছু! ওইসব কবিটবিদের তো একশোটা প্রেমিকা থাকে।....তাছাড়া তার 'ড্রিঙ্ক' করার খবরটিও তো আত্মীয়মহলে চাপা নেই আর।

ওর আত্মীয়সমাজ আবার এমন যে, ওই মদ্যপানটান যে কোনো ব্যাপারই নয়, ওটা যে আধুনিকতা আর সংস্কারমুক্তি, তা বোঝেই না। তারা 'মদ' শব্দটার সঙ্গে 'মাতাল' শব্দটাকেও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই মনে করে।

পুরন্দরের বৌদি তো সেদিন অন্য কারো প্রসঙ্গে এ ধরনের কথা তুলে অনায়াসে বলেছে, এখন তো চারদিকে যা দেখছি, যেন পয়সা হলেই মদ খেতে হবে। যেন পয়সা হওয়ার আর কোনো সার্থকতা নেই। ...এখন তো আবার দেখি লজ্জার ভাবও নেই। যেন মস্ত একটা বাহাদুরি, বোতল-বোতল পার করে বেহেড হওয়া।....

যেন আদি অন্তকাল ধরে এই ঘটনা ঘটে চলছে না। যেন জীবনে এই প্রথম দেখছে।

এমনভাবে, বলেছে অবশ্য, যেন মহিলার জানা নেই তাঁরই একান্ত আপনজন, এবং বিশেষ প্রিয়জনও ওই দেবরটি এই পানদোষে দুষ্ট। তিনি শুধু অন্যের কথাই বলেছেন।

কিন্তু সুনয়না যখন ঘুমের বড়ি খেয়ে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়বে?

হঠাৎ একটা ভয়ের শিহরণে বুকটা হিম হয়ে গেল সুনয়নার।

সুনয়না চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়লে, শুধুই কি পরিচিত সমাজ ওই পুরন্দর রায়কে মনে-মনে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে? 'পুলিস'? সে কি চুপ করে থাকবে? প্রকাশ্যে হাতকড়া লাগাবে না?

ভয়টা হৃৎপিণ্ড থেকে ক্রমশ হাতে-পায়ে ছড়িয়ে পড়ে। তৃতীয় প্রাণী হীন ওই সংসারে আর কাকে দায়ী করতে যাবে পুলিস?

সুনয়না কেবলমাত্র তার বান্ধবীর কাছে মুখ দেখাতে পারবে না বলে নিজের নির্মল মুখটা নিয়ে সরে পড়তে চাইছে?

পুরন্দরের মুখটা মনে পড়ছে না?

বিশ্বজনের সামনে সেই মুখটায় গভীর কলঙ্কের কালি মাখিয়ে দিয়ে অনায়াসে ঘুমিয়ে পড়বে সুনয়না?

অথচ ও বেচারির সত্যিই কোনো দোষ নেই।

পাকেচক্রে ওকে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে এইমাত্র!

ভীষণ ওই ভয়ের অনুভূতির পর মমতায় মনটা ভরে গেল। কে জানত ওই অহঙ্কারী উন্নাসিক আত্মপ্রেমী এবং শিথিলচরিত্র মানুষটার জন্যে এতখানি মমতার সঞ্চয় ছিল সুনয়নার মধ্যে!

সুনয়না, এ কী দশা হল তোমার?

'মরে বাঁচবার' নিশ্চিন্ত পথটার সামনেও যে এমন একটা অলঙ্ঘ্য বাধা এসে পথটা রোধ করে দাঁড়াবে, তা ও তো ভাবেনি।

সুনয়না, এখন কী করবে তুমি?

হঠাৎ সংকল্পে দৃঢ় হল সুনয়না।

নাঃ, সত্যটা খুলেই বলবে সুনয়না পুরন্দরের কাছে। বলবে— কী বলবে?

তার আদ্যোপান্ত জীবনের ইতিহাস?

সুনয়নার জীবনে যে 'টুটু' নামের একটি বৃহৎ উপস্থিতি ছিল, সেটাই তো তাহলে আগে বলতে হবে। তার মানে সুনয়নার জীবনের মূল শিকড়টা উপড়ে আসবে।

অতঃপর যখন পুরন্দর বলবে, কী হে সুনয়নাদেবী, লেখাটা পুরুষালি বলে ফেলেছিলাম বলে তো লম্বা একখানি লেকচার দিয়ে বসেছিলে।... যখন বলেছিলাম এমন একটা 'জীবন' তোমার কল্পনায় ধরা দিল কী করে? তখন যে খুব ধিক্কার দিয়েছিলে?

দৃঢ় সংকল্পের মুখটা ভিন্ন পথে গিয়ে পৌঁছল। যা থাকে কপালে, ছবিকেই সব খুলে বলতে হবে।

বলতে হবে, ছবি, আমার সীমাহীন বোকামির ফলে আজ এই অবস্থা।....কিন্তু কী করে জানব বল, এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে?

বড়জোর হয়তো বইটা ছাপত না, অথবা ছাপাতে দেরি করবে। তাছাড়া আর কী ভাবা যায় বল, আমার কপাল আমাকে এই অদ্ভুত অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

'মরা চলবে না'—ভেবে হঠাৎ যেন বুক থেকে একটা পাহাড়ের ভার নেমে গেল।

ভার নেমে গেল পুরন্দরের কাছে 'সত্য'টা বলতে বসতে হবে না, এটা ঠিক করে।

ভাবতে বসল, কীভাবে শুরু করবে চিঠিটা।

চিঠি?....নাঃ। এত উল্টোপাল্টা অবিশ্বাস্য সব কথা কি চিঠিতে গুছিয়ে লেখা যায়? কত বড় হবে সেই চিঠি! তার থেকে যদি একবার গিয়ে মুখোমুখি হওয়া যেত। আছড়ে পড়েই বলে ওঠা যেত, ছবি! তুই আমায় কেটে কুচিকুচি করে ফেল। ছবি তুই আমায় মেরে ফেল — ছবি আমি ভেবেছিলাম 'মরে' তোকে মুখ দেখানোর হাত থেকে রেহাই পাব। কিন্তু ছবি — পারলাম না রে। সংসারসুদ্ধ সব্বাইকে ধাঁধাঁয় ফেলে রেহাই পেতে যাওয়াটা বড় স্বার্থপরের মতো বলে মনে হল।

ছবি, একটাই সান্ত্বনা, টুটুদা জানে না এসব। টুটুদা জানে তার 'লেখা' ট্রাঙ্কের মধ্যে যত্নে তোলা আছে। টুটুদাকে জানাসনি ছবি। তোর পায়ে পড়ি। আমাকে তুই ইচ্ছে করলে বিশ্বাসঘাতকও ভাবতে পারিস। ঘেন্নায় আর জীবনে এমুখ দেখতে না পারিস, সেটা সইবে। কিন্তু টুটুদা যদি জানতে পেরে ভুল করে ভাবে নয়নাটা এই— সেটা সইতে পারা যাবে না। ভুল তো ভাবতেই পারে। এমন একটা জটিল জালের সম্ভাবনা কে ভাবতে পারে?

মনে মনে কথার পর কথা সাজাতে সাজাতে কখন যে সুনয়না ছবির কাছ থেকে পিছলে পড়ে, একটা রোগশয্যার পাশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, তার খেয়াল নেই।

টুটুদা, আমায় চিনতে পারো?.....টুটুদা, তুমি আমার মুখ দেখতে পাচ্ছো না? তোমার চোখ এত খারাপ হয়ে গেছে? টুটুদা, আমি তো ছবিরই মতো, আমায় কী তোমার একটু ভার দেওয়া যায় না? টুটুদা, আমার তো অনেক টাকা আছে—

হঠাৎ ফট করে ঘরের জোরালো আলোটা জ্বলে উঠল।

আর সুনয়নার সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বপ্নাচ্ছন্ন দূরে-হারিয়ে-যাওয়া মনটার ওপর

একটা হাতুড়ি কষিয়ে দিয়ে একটা তীব্র তিক্তস্বর বলে উঠল, আপনি কি এখনো ঘুমোচ্ছেন নাকি?....আমার হয়েছে এই এক জ্বালা। এদিকে আপনি ঘুমাচ্ছেন তো ঘুমাচ্ছেন! ওদিকে দাদাবাবু বোতল খেয়ে বেহুঁশ হয়ে সোফার ওপর পড়ে আছে। এ-বাড়িতে আর পোযাবে না দেখছি। খাওয়া-শোওয়ার সময়ের একটুকু ঠিক নাই। দেখগে যান না এধার ওধার বাড়িতে। ঘড়ির কাঁটায় খাওয়া-শোওয়া। আর এ-বাড়িতে—

চট করে উঠে বসে সুনয়না। গম্ভীরভাবে বলে, ঠিক আছে। না পোষাচ্ছে যখন, তখন, কাল সকালেই তোমার জিনিসপত্র আর মাইনেটা নিয়ে চলে যেয়ো।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ধরে নিয়েছিল, এ হুকুম শোনামাত্রই ও ঠিকরে উঠে বলবে, 'তো কাল সকালেই-বা কেন? এখনি চলে যাচ্ছি। দিয়ে দিন মাইনেটা'।

সেটাই প্রত্যাশিত ছিল। কারণ এটা নিশ্চিত কোনো 'ঘড়ির কাঁটার বাড়িতে' নৌকো বেঁধে এসেই না পোযানোর হুমকি দিতে এসেছে।

কিন্তু হঠাৎ-কযে-ফেলা অঙ্কটা গোলমাল হয়ে গেল। ঘটে গেল একটা উল্টোপাল্টা ব্যাপার।

মেয়েটা ঠিকরে ওঠার বদলে হঠাৎ ডুকরে উঠে বলে উঠল, ব্যস। 'হয়ে গেল 'জবাব!' আমার বুঝি খিদা লাগে না? ভয় লাগে না?'

একটা দমবন্ধ ঘরে অকস্মাৎ কি কেউ একটা দক্ষিণের জানলা খুলে দিল?

সুনয়নার অন্তত তাই মনে হল।

তাকিয়ে দেখল, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখটা মোছার দরুন ধ্যাবড়া করে পরা কাজলটা সেই উল্টোপিঠটাতে তো লাগলই, গালেও ছোপ পড়ল, নেহাত বাচ্চাদের মতো।

আর দেখে বিষবড়ি খেতে যাবার মতো মানসিক অবস্থায় কিনা হাসি পেয়ে গেল সুনয়নার।

খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'খিদা না-হয় লাগতে পারে, ভয় লাগবে কেন?'

লাগবে না?

জ্যোৎস্না চোখের জলের একান্ত সহচর 'নাকের জলটা'কে কব্জা করতে করতে বলল, দু'ঘরে দুটো মানুষ জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ঘুমাচ্ছে, পাড়া নিশুতি, ঘড়িতে রাত বারোটা বাজতে চলল, গা 'ছমছম' করে না?

বারোটা বাজতে চলল।

নিজেকে ভারি নিষ্ঠুর আর অবিবেচক মনে হল সুনয়নার। আর সুনয়না

সেই ছুতোয় তার দমবন্ধ ঘরটা থেকে একেবারে খোলা ছাতে চলে আসতে চাইল।....তা এ হয়তো একটা পলায়নী মনোবৃত্তির কাজ! আগুনের আঁচ থেকে সরে এসে ঠাণ্ডা হাওয়ায় এসে বসা।

শাড়িটা গুছিয়ে নিতে নিতে বলল, খিদা লেগেছিল তো খেয়ে নিলেই পারতিস?

খেয়ে নেব? নিজে-নিজে? আগেভাগে?

বাঃ, তাতে কী? আমি তো মাথার যন্ত্রণায় শুয়ে আছি, খাব কিনা ঠিক নেই, আর তোর দাদাবাবু তো শুনলিই তখন, অফিস থেকে অনেক খেয়ে এসেছে। হয়তো আর কিছু খাবে না।

জ্যোৎস্না এখন চোখ-নাক দুই মুছে ফেলে সুস্থির হয়ে স্থির গলায় বলে, 'হয়তো খাবে না, ভেবে নিয়ে মনিবের আগেভাগে নিজে নিয়ে-থুয়ে খেয়ে নিতে হবে? এমন খিদের ক্যাঁতায় আগুন!'

'আচ্ছা বাবা, চল্ চল্। নিজে নিতে-থুতে হবে না, আমিই দিয়ে দিচ্ছি গিয়ে।'

এই অতি-বিরক্তিকর মেয়েটার ওপর হঠাৎ ভারি প্রসন্নতা অনুভব করল সুনয়না। মেয়েটা যেন সুনয়নাকে একটা আগুনের আঁচ-ভরা ঘর থেকে টেনে বার করে এনে পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছে।

মেয়েটাও বোধহয় বৌদির এই প্রসন্ন কণ্ঠের আভাস পেয়ে কৃতকৃতার্থ হয়ে যায়। তাই বলে ওঠে, 'তাই কখনো হয়? আপনারা একটু কিছু মুখে দ্যান তো আগে!'

'আশ্চর্য! নিতান্ত তুচ্ছ একটা মানুষের মধ্যেও হৃদয়ের আভাস পেয়ে মনটা এত হালকা হয়ে যেতে পারে?'

সুনয়না একটু হেসে বলল, তবে যা, টেবিল গোছাগে যা। দেখি গিয়ে তোর দাদাবাবুকে—

'আচ্ছা এক 'গণ্ডালু'তে পড়া গেছে বাবা!'

সিগারেটটা ধরিয়ে হাতে নিয়ে বলে উঠল পুরন্দর। এটা ওদের তালতলার বাড়ির একটা চালু প্রয়োগ। ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে বা কোন গোলমেলে ব্যাপার পড়ে গেলে পুরন্দরের ছোটবোনও বলে, দাদাও বলে-'আচ্ছা এক গণ্ডালু'তে পড়া গেছে বাবা'। কে জানে মানেটা কী? আর কোন্ শব্দের অপভ্রংশে এর উদ্ভব! হয়তো গণ্ডগোল থেকে।

পুরন্দর তাদের তালতলার বাড়ির আচার-আচরণ, জীবনযাত্রা পদ্ধতির ধরনধারণ—সবটাই বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে বর্জন করে ফেলে সব কিছুতেই নতুন

বিন্যাস আনতে চেষ্টা করে চলেছে, তবু মাঝে-মাঝে সেই আগেকার এক-একটা চালু কথাকে চালায়। যেমন, কখনো-কখনো মায়ের মতো বলে ওঠে, 'দোহাই ভগবান' আর ভাইবোনের মতো এই 'গণ্ডালু'।...অবশ্য অসতর্কে অথবা নিতান্তই অভ্যাসের বশে বলে, তা নয়। বলে কতকটা যেন লীলাচ্ছলে।

সুনয়না টি-পট থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলে, 'হঠাৎ আবার 'গণ্ডালু' কেন?'

একটু হেসেই বলল। তবে, কথায় বিশেষ জেল্লা ফুটল না। ওটা হচ্ছে না আজকাল। চেষ্টা করেও না।

পুরন্দর বলল, 'কী হয়নি? তোমার মুখে তো সব সময় লোডশেডিং; এদিকে নিজেকে সর্বদাই যেন জোচ্চোর-জোচ্চোর আর ষড়্‌যন্ত্রের নায়ক বলে মনে হচ্ছে।'

প্রসঙ্গটা বুঝল সুনয়না। কিন্তু চট করে সেটাকে উদ্‌ঘাটিত করতে চাইল না। হেসেই বলল, 'তা কোনো-কিছুর একটা 'নায়ক' তো? তাহলেই লাভ।'

'তুমি হাসছ? জানো এই গোলমেলে ব্যাপারে আমার কী অসুবিধে ঘটছে?'

'বাঃ। অসুবিধে আবার কী?'

সুনয়নার কথায় জোর কম, কেমন একটু ফিকে-ফিকে।

পুরন্দর বলল, 'সুবিধেটাই-বা কী? সুবীরটা প্রুফ দেখতে দেখতে কেবলই এসে বলে উঠছে, আচ্ছা পুরন্দরদা, ঠিক বলছেন, আপনি কখনো পার্টি-পলিটিক্স করেননি? জেল-ফেল খাটেননি? উড়িয়ে তো দিচ্ছেন, অথচ পুলিশি অত্যাচার আর জেলখানার মধ্যেকার এত ডিটেল্‌স্ লিখলেন কী করে, বলুন তো?...কী জবাব দিই তার ঠিক নেই। বলি বটে, 'কবি তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান—' কিন্তু নিজেরই কানে খাপ খায় না।... সত্যি বলতে, তোমার ওই বইটি যদি আগে ভালো করে পড়ে দেখতাম, তাহলে আর এ-গাড্ডায় পড়তে যেতাম না। লেখাটা নিয়ে শ্যামলবাবুর দপ্তরে জমাই দিতে যেতাম না।'

সুনয়না আস্তে বলল, 'জমাই দিতে যেতে না!'

'অন্তত দেবার আগে ভেবে দেখতাম। তবে এও আশ্চর্য। তুমিই-বা এসব লিখলে কী করে? এ অবস্থায় তো পড়তে যাওনি কখনো?'

সুনয়নার ভেতরে জোরের অভাব, তবু সুনয়না বাইরে মুখের জোর বজায় রেখে বলে, 'তোমার মতে তাহলে লেখককে প্রতিটি অবস্থায় পড়ে-পড়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে তবেই লিখতে হয়? তাহলে তো তাকে—'

পুরন্দর অসহিষ্ণুভাবে বলে, 'সেকথা হচ্ছে না। কিছু ব্যাপার অবশ্যই সর্বকালের, সর্বজনের। সুখ-দুঃখ প্রেম-ফ্রেম বিরহ-মিলন হ্যানো-ত্যানো। কিন্তু

এখানে ব্যাপারটা আলাদা। আমি তো কিছুতেই এটা 'তোমার' সঙ্গে মেলাতে পারছি না। জীবনের প্রথম উপন্যাস লিখতে বসে এমন অদ্ভুত একটা প্লট বাছবার প্রেরণাই-বা এলো কোথা থেকে? অথচ ফোঁস-কেউটের ছোবল খাবার জন্যে আর-একবার তো বলে বসতে পারি না, 'কোথাও থেকে টুকে মেরেছ কিনা?' 'গণ্ডালু' ছাড়া আর কী তাহলে বল?

সুনয়নার ভিতরে তো ঝড়ের ওলটপালট, তবু পুরন্দরের শেষ কথাটায় একটু হালকা হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে প্রসঙ্গটাকে হালকা দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টায় বলে ওঠে, 'কেউটের ছোবল'! আরে বাস্। সুনয়না রায়ের মধ্যে যে এতখানি ক্ষমতা আছে, জানা ছিল না তো।'

আহা, ওটা তো কথার কথা। না-হয় প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। তবে ব্যাপারটা যেন ধাঁধার মতো। ওই-যে ওরা আমায় কাল দেখাল এক জায়গায় রয়েছে, কাহিনীর নায়ক বলছে, 'যখন সেন্ট্রি এসে হুকুম দিলে একটা বীভৎস নরককুণ্ডের মধ্যেই প্রাতঃকৃত্য সারতে হবে—তখন প্রবল ইচ্ছে হল ঘেন্নাপিত্তি বিসর্জন দিয়ে সেই নরককুণ্ডটাকে উঠিয়ে ওর মাথায় উপুড় করে দিই। তবু সেই দুর্দমনীয় ইচ্ছেটাকে দমন করে, 'রৌরব নরক' জিনিসটা কী, সেটার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হল। জানি তো—বেয়াদবি করলেই রামধোলাই দাওয়াই আর নির্জন 'সেল'।...ওঃ। ওইটাই সব থেকে মারাত্মক।' ওইখানটা নিয়ে এসে দেখিয়েই তো সুবীর আমায় চেপে ধরল, 'এ জিনিস দাদা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া লেখা হয় কী করে?'..তো বলো, আমার অবস্থা ধাঁধায় পড়ে যাবার মতো কি না?

সিগারেটটার শেষটুকু চায়ের কাপে ফেলল পুরন্দর। যেটা চিরকাল সুনয়নার দু'চক্ষের বিষ! ফেলে ঈষৎ কটাক্ষে দেখল। নাঃ, কোন প্রতিক্রিয়া নেই। রেগে উঠে বলল না, 'আবার ওইরকম নোংরামি?'...তার মানে সুনয়না এখন নিজস্ব 'মুড'-এ নেই।

সুনয়না টেবিলের এটা-ওটা গোছাতে গোছাতে বলে, 'রৌরব নরক'-এর কল্পনাও তো মানুষের কল্পনা। কেউ কি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসে লিখেছিল? পৃথিবীর সমস্ত দেশে চিরকালীন সাহিত্যে তো স্বর্গ আর নরকের কত কত বর্ণনা। রাশি রাশি। কে আর দেখে এসে লিখেছে?'

'সেটার সঙ্গে কি এটাকে মেলানো যায়?'

'যায় না বলে ধারণাবদ্ধ হয়ে থাকলে অবশ্য যায় না।'

ভিতরে শান্তি নেই। ভয়ঙ্কর একটা ফাঁকা আর ফাঁকির ওপর পা— তবু যুক্তিটাকে শক্ত রাখার চেষ্টা।

পুরন্দর একটু ইতস্তত করে আর-একটা সিগারেট বার করে। তেমনি বাঁকা

চোখে তাকিয়ে দেখে। 'নাঃ, আবার একটা ধরাচ্ছ?' বলে ঝাঁপিয়ে এসে কেড়ে নেবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

ভিতরে ভয়ানক একটা অস্থির সন্দেহের যন্ত্রণা।

বেশি করে ধোঁয়া ছাড়ল। তবু সুনয়নার স্বাভাবিক চৈতন্যে পৌঁছল না সে ধোঁয়া।...পুরন্দর এখন আবার বলল, 'সে তুমি যা-ই বল, আমি কিন্তু সত্যিই ভেবে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি তোমার এই 'কুসুমকলি' আঙুলে-ধরা কলম নিয়ে এ-সব লাইন বেরোল কী করে?

সুনয়নার পায়ের তলায় মাটি নেই। তবু সুনয়না স্থিরভাবে তাকিয়ে বলে, 'তাহলে ধরেই নিচ্ছ ওটা চুরির ব্যাপার?'

'আরে বাবা, তাই কি বলছি? মেলাতে পারছি না, সেটাই বলছি। তাছাড়া, গণ্ডালুর ওপর গণ্ডালু। পুরো ব্যাপারটা আমার ওপর এসে পড়ে বসে আছে।...বেশ ছিলাম বাবা! কী-যে শখ হল তোমার, উপন্যাস লিখব—লিখবে তো লিখবে, চুটিয়ে একটা প্রেমের গল্প লিখবে, হা-হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস, বিরহ-মিলন ইত্যাদি ইত্যাদি—তা-নয়, অদ্ভুত এক প্লট নিয়ে বসলে। আর তাও কিনা একটা পোড়খাওয়া পুরুষের জবানিতে।...কোনো মানে হয়?

পুরন্দরের কণ্ঠে অস্বস্তি। পুরন্দরের চোখে সন্দেহের ছায়া!

কী সেই সন্দেহ?

এ ধরনের ভাষা কোথা থেকে শিখল সুনয়না?

সন্দেহটা অন্য প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল।

'আচ্ছা সুনয়না, তোমার কি কোনো পলিটিক্স-করা দাদা-টাদা ছিল?

সুনয়না এখন প্রতিটি প্রশ্নের ধাক্কাতে কেঁপে ওঠে। কারণ, সুনয়নার পায়ের তলায় মাটি নেই। তবু সুনয়না বলে ওঠে, 'তোমার কথাটা হল সেইরকম, 'মূলে মা রাঁধে না, তার তপ্ত আর পান্তা'। 'দাদা' কোথায় তার ঠিক নেই, আবার পলিটিক্স-করা দাদা।'

বলেই একটু গভীর বিষণ্ণ গলায় বলে, 'আমার কী ছিল না-ছিল, সবই তো তোমার জানা। মায়ের মুখটাও মনে পড়ে না; এমন বয়েসে মা গেছে, পাড়ার লোকের দয়াধর্মে গড়িয়ে গড়িয়ে বড়ো হয়েছি। বাউণ্ডুলে বাবাটি নেহাত আক্কেল করে একটা ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল, তাই একটু উতরে গেছি, এই যা। তা তাই-বা কতটুকু এগোতে পেরেছি বল? বাবার 'হন্যে' হয়ে বেড়িয়ে 'কন্যাদায় উদ্ধারের' চেষ্টার ফলে কুড়ি বছর বয়সেই তো তোমার রুমালের কোণে বাঁধা হয়ে বসলাম—আমার জীবনটা তো তোমার কাছে তোমার টেবিলে পড়ে-থাকা ওই একখানা খোলা বইয়ের মতো! দশ বছর ধরে পড়ে আছে''

তা এই ধারণাই তো ছিল এতদিন সুনয়নার নিজেরও।

সুনয়না নিজেই তো জানত না, তার বাইরে কিছু আছে। অতএব সেই নিশ্চিন্ততাই ছিল পুরন্দরের মধ্যেও।

কিন্তু এখন পুরন্দরের মনের মধ্যে অনেক প্রশ্নের ওড়াউড়ি। তাই পুরন্দরও গভীর গলায় বলল, 'বইখানা পাতা-খোলা হয়ে টেবিলে পড়ে থাকাটাই কি শেষ কথা? যদি তার ভাষাটা না-জানা থাকে? তোমার টেবিলে একখানা হিব্রু ভাষায় লেখা বই বছরের পর বছর পড়ে থাকলেই কি তার মর্মোদ্ধার করতে পারবে?'

তারপর খুব গভীর গম্ভীরভাবে বলে ওঠে, 'টেবিলে-থাকা, পকেটে-থাকা, 'রুমালের কোণে বাঁধা-পড়ে-থাকা'—এরা কেউই গ্যারান্টি দিতে পারবে না, তার যতখানি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেটাই তার সব।'

অথচ পুরন্দর নিজেই এ-যাবৎ ভেবে এসেছে, টেবিলে-পড়ে-থাকা বইখানা তার বোধগম্য ভাষায় লেখা! এবং পড়েই ফেলেছে সে।

হয়তো এ-রকম একটা পরিস্থিতির উদ্ভব না-হলে সেই 'জানা'-টাই শেষ কথা হয়ে থাকত।

কিন্তু এখন যে পুরন্দরের মধ্যে যেন হেরে-যাওয়ার মতো একটা যন্ত্রণা।

ওকে আমি এতদিন যা ভেবে এসেছি, ও তো ঠিক তেমনটি নয়।

কোন্ পরিবেশে মানুষ হয়েছে ও? ওর কি কোনো প্রচ্ছন্ন অতীত আছে?

সন্দেহ জিনিসটা তো ঘুণপোকার মতো। অবিরত কুরেই চলে। কুরে-কুরে ফোঁপরা করে আনে। তাই সন্দেহটাকে 'যাক গে যাক' বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

অতএব—

আচ্ছা সুনয়না, ওই যে জেলখানার সেপাই-সান্ত্রী, জেলার ইত্যাদিদের মুখে অমন অশালীন ভাষা বসিয়েছ, অমন খারাপ-খারাপ গালাগালি ইউজ করেছ, এ-সব তুমি শিখলে কোথায়? শুনলে কোথায়?'

যদিও—

ওই উতঙ্ক উপাধ্যায়ের জবানিতে লেখা কবি পুরন্দরের 'প্রথম উপন্যাস'টি 'চক্রবাল' অফিসের সক্কলকে মাত্ করে দিয়েছে ওই ভাষার ধারেই। কী ভাষা! একেবারে শানানো ছুরি।... প্রথম দিনেই বলিনি, দাদা! আপনি একটি 'বর্ণচোরা আম'?... নাঃ, একেই বলে পাকা হাত। জাত সাহিত্যিক।... দেখলেন তো 'সব্যসাচী' কিনা?... দ্বিতীয় পুরন্দর রায় কিন্তু আমার আবিষ্কার।'

ছাপা হয়ে বেরোয়নি এখনো, তবু সক্কলের মুখে-মুখে।... 'পারব না, হবে

না, আমার দ্বারা সম্ভব নয়' বলে বলে খেল্ একখানা দেখালেন বটে। এত জীবন্ত সব চরিত্র, যেন মনে হচ্ছে পুরন্দরদা দীর্ঘকাল ধরে গারদে পচেছেন, আর সেই পচার এক্সপিরিয়েন্সের জ্বালা কলমের ডগায় বেরিয়ে এসেছে।

অফিসে ওই 'ভাষা'টা নিয়েই এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। তার কারণ, এটা অপ্রত্যাশিত। পুরন্দর রায়ের কবিতায় শব্দচয়নে এক আশ্চর্য ভঙ্গি থাকে।... এটার সঙ্গে মেলানো যাচ্ছে না। কিন্তু তাতে তো ওদের আহ্লাদ, ব্যবসায়িক লাভের প্রত্যাশায়। কিন্তু পুরন্দর যে তার বৌয়ের চিরচেনা শালীন সুকুমার সভ্য মার্জিত ভাষার সঙ্গে তার কাহিনীর নায়কের ভাষাকে মেলাতে পারছে না। সেই মেলাতে না-পারার যন্ত্রণাতেই আবার প্রশ্নমুখর না হয়ে পারে না।

'আচ্ছা সুনয়না, একটা পুরুষের মনের চিন্তা-চেতনা ভাব এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ফুটিয়ে তুললে কী করে?'

'মানে, প্রেমিক পুরুষ তো নয় যে বাজার-চলতি ব্যাপার।...ওরা তো আমায় ছেঁকে ধরছে নিশ্চয়ই আমি কোনো সময় পার্টি পলিটিক্স করেছি, নিশ্চয়ই আমি জেল-ফেল খেটেছি কোনো সময়।'

সুনয়না গম্ভীরভাবে বলে, 'ভাগ্যিস, তোমার 'ওদের' মতো সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন লোক আগের যুগে ছিল না। না-হলে তারা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথকে ছেঁকে ধরে জেরা করতে বসত, নিশ্চয়ই আপনি কখনো কোনো গ্রামের পোস্টঅফিসে পোস্টমাস্টারি করে এসেছেন।'

অতএব আর বেশি প্রশ্ন করা মানেই মান খোয়ানো।

অথচ বেচারা পুরন্দর রায়। অহঙ্কারী, উন্নাসিক, আত্মপ্রেমী, বিশ্বনস্যাৎকারী লোকটার মান খোয়া যাওয়ানোর জন্যে ভাগ্যের আয়োজনের শেষ নেই।

অথচ ওর হাত থেকে এড়াবার চেষ্টা করারও উপায় নেই। সেই 'প্রাপ্তব্য' অ্যাম্বাসাডারখানা যে পুরন্দর রায়ের দরজায় এসে পৌঁছে গেছে। বিভাগীয় সম্পাদক বললেন, 'নামটা একটু বদলে দিতে পারো না কবি পুরন্দর?'

পুরন্দর সম্পাদকের কথায় একবার ক্ষীণভাবে হেসে বলল, 'কেন? নামটা কী দোষ করল? বইয়ের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না?' সম্পাদক বললেন, 'না না, সেকথা বলছি না। তবে নামটা ঠিক তেমন 'ক্যাচি' হচ্ছে না। আসলে তোমার হচ্ছে কবির কলম, নামটামগুলো সেইভাবেই চয়েস করার অভ্যাস। অথচ এটা অন্য ব্যাপার। কিছু মনে করছ না তো?'

'না না ঠিক আছে। তবে কিনা—'

বাইরেটা কী সম্মানের! কী জমকালো!

মান খোয়ানোর পালা ঘরে ফিরে।

উঃ সুনয়না! কী ‘গণ্ডালু’তেই যে পড়া গেছে।

‘আবার কী হল?’

‘আর বোলো না! কর্তার মন-মর্জি। তোমার ওই মানসপুত্রটির পুরনো নাম বাতিল। নতুন নামকরণ করতে হবে।’

সুনয়না প্রায় বোকার মতোই তাকায়।

মানসপুত্র! নতুন নামকরণ।

‘হ্যাঁ। ওই ‘পথহীন’ না কী নামটা নাকি তেমন ‘ক্যাচি’ নয়। ঝানু লোক তো। ওসব বোঝেন ভালো। আমার মুশকিলটা ভাবো। একেই তো তোমার কাছে ষড়যন্ত্রের নায়ক হিসেবে প্রতিপন্ন হয়ে বসে আছি, তার ওপর কিনা আবার প্রমাণলোপের ব্যবস্থা। খুব খারাপ লাগছে সত্যি।’

সুনয়না শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, ‘কী নাম হবে?’

‘আরে, সে কী আর শুনেছি।’

‘শোনোইনি? পুরনো নামটা বাতিল করে তার নতুন কী নামকরণ হবে শোনোইনি?’

‘আরে, মনে হচ্ছে, ওরাও এখনো ঠিক করেনি। বাবাঃ। এত লোক উপন্যাস লিখছে! বস্তা-বস্তা ঔপন্যাসিক, তবু যে কেন শালা পুরন্দর রায়কে নিয়ে এই টানাটানির শখ হল! এই সেরেছে! মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল। মাপ করে দাও।...কিন্তু সুনয়না, তোমার কলমের তো এমন শুচিবাই দেখছি না।... তোমার কাহিনীর নায়ক, যে নাকি উত্তম পুরুষের ঢঙে কাহিনীর বিস্তার করে চলেছে, সে তো উঠতে-বসতে-নড়তে-চড়তে বাহান্নবার ‘শালা’ বলছে।... শব্দগুলো তো তোমার কলম দিয়েই বেরিয়েছে?’

সুনয়না একটু ফিকে হাসি হেসে বলে, ‘লেখার সময় তো শব্দরা কানে এসে ধাক্কা মারে না, হুল ফোটায় না।’

সুনয়না অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

সুনয়না হঠাৎ যেন পাথরের দেওয়ালে একটা ছোট্ট ঘুলঘুলি দেখতে পায়।

নামটা বদলে দেবে।

নামটা বদলে দেবে।

তার মানে শেষমেশ এ-ই দাঁড়াচ্ছে— ছবির সাপ্লাই-করা লেখাটার লেখকের এবং লেখার, দুয়েরই কোথাও আর পুরনো চিহ্ন থাকছে না। এটা কি তাহলে সাপে বর? ‘চক্রবালে’র বিজ্ঞাপনের বহরে চোখ পড়লেও হঠাৎ মাথায় হাতুড়ি পড়বে না ছবির।...ছবি শুধু ভাববে ‘কবি’টা তাহলে এবার গদ্যে আসছে।

তার মানে আরো দু'দশটা দিন হাতে পেল সুনয়না।... যতক্ষণ না 'শারদীয় চক্রবাল' বেরোচ্ছে এবং সেটা সংগ্রহ করে না পড়ছে, ততদিন পর্যন্ত ছবি নিঃশব্দে থাকবে।... তার মধ্যে কি সুনয়না একদিন ছবির কাছে গিয়ে পৌঁছতে পেরে উঠবে না? বলে উঠতে পারবে না—ছবি, হঠাৎ যদি আমার সুইসাইড করবার খবর পেতিস, তাহলে হার্টফেল করে বসবি ভেবেই সে থেকে বিরত থেকেছি।... বিশ্বাস কর, একটা বানানো গল্প বলে তোকে ধাপ্পা দিয়ে নিজের বিশ্বাসঘাতকতার সাফাই গাইতে আসিনি। পাকেচক্রে—

পুরন্দর বলল, খুব চিন্তায় পড়ে গেলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু ভগবান রক্ষা করলেন।

উত্তর দেবার আগেই জ্যোৎস্নার কলকণ্ঠ ধ্বনিত হল, 'ও দাদাবাবু, ও বৌদিদি, দেখুন, কারা সব এয়েছে—'

'কাবা সব এয়েছে।'

এ ভাষা এখানে খুব সচরাচরের নয়। অন্তত 'কাজের মেয়ের' কলকণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হবার মতো। অতিথির আবির্ভাব এখানে দুর্লভই। যারা সব আসে, তারা পুরন্দরের বহির্জীবনের লোক। পুরন্দরের ফ্যান। শুধু তাকে দেখে বিগলিত হতে আর একটু অটোগ্রাফ নিয়ে ধন্য হতে আসে অনেকেই। আর আসে পুরন্দরকে ভাঙিয়ে খাবার তালে। তারা আসে সাক্ষাৎকারের বাসনায়, ক্যামেরা নিয়ে টেপ-রেকর্ডার নিয়ে সমারোহের সঙ্গে। এবং আসে কবিকে সভাস্থ করবার জন্যে আবেদন-নিবেদন করতে। আত্মীয়জনের আবির্ভাব সত্যিই দৈবাৎ।

কেনই-বা আসবে তারা? বিখ্যাত হয়ে পড়লে তার কাছে আসাটা নিকটাত্মীয়েরা অনেকটা হ্যাংলামি মনে করে। কী দরকার? নাম করেছ, বেশ করেছ। লোকের কাছে শুনতে গৌরব। তা বলে তোমার বাড়িতে ধর্না দিতে যাব নাকি? গেলে তুমি তেমন খুশি হবে কিনা, কে জানে? হয়তো ভাববে, কাজের বিঘ্ন ঘটাতে এল। সময় নষ্ট করাতে এল। তোমার বাড়িতে এখন তোমারই কেষ্টবিষ্টু বন্ধুজনের ভিড়।

তাছাড়া তুমি যাও কারো বাড়ি?

এই যে পুরন্দর! অন্য সবাইয়ের কথা বাদ দাও। তাদের তালতলার বাড়িটাতেই বা ক'বার যায়? মা থাকতে যাও-বা একটা কর্তব্যের অনুশাসন গোছের ছিল, এবং সে অনুশাসনটি সম্পর্কে সুনয়নাও রীতিমতো সচেতন ছিল। বেশির ভাগ

সময় তো সুনয়নার ঠ্যালায় পড়েই যেতে হয়েছে। সুনয়না মনে করিয়ে দিত, কতদিন তালতলার বাড়িতে যাওয়া হচ্ছে না বলো তো? মা কীরকম 'ইয়ে' করেন দেখো তো।

মা মারা যাওয়ার পর থেকে সুনয়না আর তেমন জোর দিয়ে বলতে পারে না। যদিও মা না-থাকলেও দাদা-বৌদি আছে, ভাইপো-ভাইঝিরা আছে, চিরচেনা বাড়িটাও আছে। কিন্তু চিরচেনাই কি চিরদিন চেনা থাকে?

অথচ সত্যি বলতে, বিয়ে হওয়ার পর বছর তিনেকের এই শ্বশুরবাড়ি থাকা সময়টিই যেন সুনয়নার কাছে ছিল একটি পরম প্রাপ্তি। সুনয়না তো কখনো একটা সংসারের ছবির মধ্যে থাকার সুযোগ পায়নি। সুনয়নার শৈশব, বাল্য, কৈশোর কেটেছে অদ্ভুত একটা খাপছাড়াভাবে। একদিকে একটি পরের বাড়ি—যার প্রতি টানটা যতই থাক, সেই টানটা প্রকাশ করবার সাহস ছিল না। বাবা খাপ্পা। অপরদিকে বাপের সংসারে পুরনো কাজের লোক দক্ষর সাহায্যকারিণীর ভূমিকার থেকে বিশেষ বড়ো ভূমিকা ছিল না তার। সুনয়নার অদ্ভুত চরিত্রের বাবা সুনয়নাকে কোনোদিনই স্বস্তি পেতে দেয়নি।... তবে হ্যাঁ, বাপের উপযুক্ত কাজ একটা করেছিল বটে। একটি ভালোমতো বাড়িতে মেয়ের বিয়েটা দিয়েছিল। যদিও তাতে কতটা তার ক্রেডিট ছিল আর কতটা মেয়ের রূপের—সেটি বলা শক্ত।

তবু যাই হোক, শ্বশুরবাড়িতে এসে ভারি ভালো লেগেছিল সুনয়নার। স্নেহসমাদরও যথেষ্ট পেয়েছে সে সংসারের কাছে।

দামি ছোটোছেলেটির বৌ বলে সে হয়তো মহিলার কাছে একটু বেশিই পেয়েছে। যে-জন্যে তার লজ্জাও করত! তবু বড়ো জা-ভাসুরের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো ছিল। আর ননদটির সঙ্গেও ছিল বেশ সখ্য। তখন তো খুকু আইবুড়ো মেয়ে, বাড়ি দাপিয়ে বেড়ায়। দুই দাদার আদুরে ছোটবোন বলে নিজে-নিজেই মহিমা শোনায়।

কিন্তু পুরন্দরের খেয়াল, সুনয়নাকে এই একটি সাধারণ গেরস্থালির জীবন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে এই নিঃসঙ্গ কারাবাসে নিক্ষেপ করেছে।

হয়তো এতে সুনয়নার মনখারাপ হয়ে গিয়েছিল শুনে এ-যুগের আধুনিক মেয়েরা গালে হাত দেবে। কারণ, প্রায় সকলেরই তো এইরকম জীবনই কাম্য! স্বাধীন জীবন। সর্বতোময়ী কর্ত্রী! মাথার ওপর শাশুড়ী-ননদ-জা-ভাসুর হাবিজাবির পাট নেই। শুধু দু'জনে কূজন করার অগাধ সুযোগ।

অথচ বোকা সুনয়না এখনো তার সেই মাত্র তিন বছরের বধূজীবনটার দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে। যেখানে প্রাণ ছিল, জীবনের একটা মানে ছিল। খুকুর

বিয়ের কিছু পরেই পুরন্দর এই ফ্ল্যাটটা নিয়ে বসেছিল। এবং আচমকা সেই খবরটা দিয়ে মাকে, দাদাকে, বৌদিকে স্রেফ হতভম্ব করে দিয়েছিল।

মা অবাক হয়ে বলেছিল, অন্য বাসায় চলে যাবি? এখানে থাকবি না?

ছেলে এটা-ওটা বলে বুঝিয়েছিল, ওখানে কী-কী সুবিধা পাচ্ছে, আর এখানে কী-কী অসুবিধা ঘটছে।

কিন্তু আশ্চর্য! মনে-মনে যে সবাই ওই 'নিরীহ বেচারা' বৌটিকেই দায়ী করেছে, এ সত্যটুকু বুঝতে দেরি হয়নি সুনয়নার। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করতে যাবে কোন্ পথে? লাভই-বা কী? এখনো সুনয়না তার বড়ো জায়ের প্রতি যেন ঈর্ষা অনুভব করে। সে সেখানে আপন কেন্দ্রে অবিচল থেকে কেমন কাটিয়ে চলেছে। এই যে ননদ খুকু, তার বর, মেয়ে—এরা তো তাদের বদ্যিবাটির বাড়ি থেকে যখন-তখন এসে ওই তালতলাতেই ওঠে। খুকু দু' দশদিন কাটিয়েও যায়। কারণ তার কাছে তো সেটাই বাপের বাড়ি। মা মারা গেলেও, সেখানের ইট-কাঠে, রান্নাঘর-ভাঁড়ারঘর-ঠাকুরঘরে মায়ের অস্তিত্বটুকু যেন এখনো বিরাজিত। সেটা তার দাবির জায়গা।

তার কাছে ছোড়দা-ছোটবৌদির এই নিজস্ব সংসার? ধ্যাৎ!

সুনয়না এ সব খবর পায় একটু-আধটু। কিন্তু ওদের কাছে টানবার চেষ্টা করা সুনয়নার হাতের বাইরে। পুরন্দর এ-সব বাড়তি ঝামেলা যে পছন্দ করবে, এমন মনে হয় না।

তাই খুব ইচ্ছে হলেও সুনয়না কখনো লিখতে পারে না, 'খুকু, আমার কাছে এসে দু'দিন থাক না বাবা। একা একা হাঁপিয়ে মরি।'

তা বলে পুরন্দর কি তার এই ছোটোবোনটাকে ভালোবাসেনা? তা অবশ্যই বাসে। এই যে এসেছে, দেখে খুব ভালোই লাগল। তবু এ-কথা বলে উঠবে না, দাদা বৌদির কাছে গিয়ে তো থাকিস-টাকিস বাবা। এখানে আয় না। থাক না দু'চারদিন।'

হ্যাঁ, খুকুই এসেছে। বর নিয়ে, মেয়ে নিয়ে।

আর 'কারা সব এসেছে—' ভেবে আবিষ্কার করবার আগেই শুড়মুড়িয়ে ঢুকে এসে, জ্যোৎস্নার থেকেও কলকণ্ঠে বলে উঠেছে, 'উহ্, বাঁচলাম বাবা! ছোড়দা রে, বাড়িতে আছিস। দ্যাখ না, এই অপয়া লোকটা সেই ভোর থেকে বলে চলেছে—তুমি ছুটির দিনে, আর যত সকালেই বেরোও, তোমার ছোড়দাটিকে ধরতে পারবে বলে মনে হয় না।... চোর আর বিখ্যাতজন—এদের ধরা খুব কঠিন ব্যাপার। গিয়ে হয়তো শুনবে, তিনি এখন ফুলের মালা গলায় দিয়ে কোথাও কোনোখানে সভা উজ্জ্বল করে বসে আছেন গিয়ে।'

'অপয়া' লোকটা তাড়াতাড়ি বলে, 'ইস! কী আশ্চর্য! একেই বলে ঘরশত্রু। বলেছি বলে এইভাবে হাটে হাঁড়ি ভাঙা?'

খুকু বলে ওঠে, না, ভাঙবে না। যা ইচ্ছে বলে পার পেয়ে যাবে, কেমন? হিং সুটের রাজা। ওই যে আমার দাদাটার এত নামডাক, তাতেই তোমার গাত্রদাহ।'

এ-সবই যে লীলা মাত্র, তা বুঝতে কি দেরি হয় কারো?

তবু সুনয়না বলে, 'কী যে বলিস। এসো ভাই, বীরেশ। আজ আমাদের এত ভাগ্যি?'

বীরেশ একটু কৌতুকদৃষ্টিতে বৌয়ের দিকে তাকায়।

খুকু ইত্যবসরে তার বছর পাঁচ-ছয়ের মেয়েটাকে নড়া ধরে কাছে টেনে এনে বলে, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে। মামা-মামীকে প্রণাম কর?'

মেয়েটা হাত বাড়িয়ে খপ্‌খপ্‌ করে মাতৃ-আদেশ পালন করে।

সুনয়না বলে, 'হয়েছে বাবা, হয়েছে। আয়, বোস।'

পুরন্দর মনে-মনে মুচকি হাসে। এই বাচ্চাদের দিয়ে পায়ের ধুলোটুলো নেওয়ানো যে কী গাঁইয়ামি! তবু, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে' বলে মেয়েটার হেঁট মুণ্ডুটার ওপর একটু সৌজন্যের হাত বুলিয়ে বলে, 'আরে ব্বাস, দারুণ বড়ো হয়ে গেছে তো? এই তো সেদিন যেন দোলায়-শোওয়া দেখছিলাম!'

'সেদিন'টা যে অনেকদিন, এবং তার মাঝখানে দৈবাৎ দেখে থাকলেও যে মনে নেই, তা খেয়াল করে না।

বীরেশ একটু হাসি গোপন করে বলে, 'দোলাটা আর-একজনকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েই বড়ো হয়ে যেতে হল!'

খুকু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'তুমি থাম তো!'

'আমি তো সব সময় থেমেই আছি। আমার তো সংসারে কাটা সৈনিকের পার্ট। তা মেয়েকে তো খুব ম্যানার্স শেখানো হল, নিজে গুরুজনদের পদধূলি নিলে কই?'

বলে নিজে নিমেষে সেই কাজটা করে নিয়ে বাধা দেবার আগেই আবার গুছিয়ে বসে পড়ে।

খুকু চোখ কপালে তুলে বলে, 'কী? ছোটবৌদির পায়ের ধুলো নিতে বসব? ও আমার থেকে এগারমাসের ছোট না। বৌদি বলি—নাম ধরি না, এই ঢের। আর ছোড়দা? পায়ের ধুলো নিতে দিলে তো? বিজয়ার দিন আর ভাইফোঁটার দিন মারামারি, পা-টানাটানি করে কোনোমতে নিয়মরক্ষে। তাও তো এই দু-তিন বছর—হি হি হি। তোর মনে আছে ছোড়দা, একবার ভাইফোঁটার দিন ফোঁটা নিতে বসার সময় পায়ে তোয়ালে চাপা দিয়ে বসেছিলি? পাছে পায়ের ধুলো নিই?'

সুনয়নার মুখে আসছিল, 'ওসব তুচ্ছ কথা মনে রাখবার মতো জায়গা কোথায় তোমার ছোড়দার মনের মধ্যে?' তবে বলল না। সামলে নিল। পরিস্থিতি নষ্ট করতে ইচ্ছে হল না। যদিও খুকুর এই অতি-উচ্ছ্বাস সুনয়নার অনভ্যস্ত জীবনে একটু বাড়াবাড়িই লাগছে। তবু মনে হল, খুকুর আজকের এই আসাটা যেন সুনয়নাকে আপাতত বাঁচিয়ে দিল। যেন কোথায়, কোনো-একটা কুটিল হিংস্র প্রাণী ওৎ পেতে বসেছিল, হঠাৎ লাফিয়ে এসে ঘাড়ে পড়বার জন্যে—অতিথিকে দেখে পিছিয়ে গেল।

আপাতত অতএব বেঁচে-যাওয়া গলায় বলে ওঠে, 'এই জ্যোৎস্না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে? চায়ের জল চাপিয়েছিস?'

জ্যোৎস্না ক্যাঁচ করে জিভটা কেটে ছুটে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

খুকু বলে ওঠে, 'কিন্তু ছোটবৌদি, শুধু চা। বেশিক্ষণ বসা হবে না।'

সুনয়না একটু অবাক হল। ঘটা করে রবিবারের সকাল দেখে বেড়াতে আসা হল, অথচ 'বেশিক্ষণ বসব না' মানে? কী জন্যে এসেছে তবে? তাহলে কি ওরও উদ্দেশ্য ওদের বদ্যিবাটির কোনো সাহিত্যসভার সভাপতি সংগ্রহ? সেখানে ওর পরিচয় জেনে কেউ ওকে ধরে পড়েছে, 'এটা করে দিতে হবে' বলে? এমন তো হয়েই থাকে।

খুকুর কথার পরই বীরেশ খুব করুণ-করুণ মুখ করে বলে, 'একেবারে ফতোয়া জারি করে দিলে—শুধু চা? কতদিন পরে বড়ো কুটুম্বের বাড়ি এলাম, শালাজের হাতের একটু ভালোমন্দ জুটত, সে-পথে কাঁটা দিয়ে বসলে?'

সুনয়না একটু হাসল, 'কাঁটা দিলেই কি নিবৃত্তি হব ভাবছ? কাঁটাবন পার হবার ক্ষমতা নেই শালাজের? কিন্তু ঘটনাটা কী? বেশিক্ষণ বসব না, মানে?'

পুরন্দরও এখন বলে ওঠে—'হাঁ, তাই তো। এমন কম সময় নিয়ে হঠাৎ এতদিন পরে আসা! আর কোনো কাজে এ-পাড়ায় এসেছিস বুঝি, খুকু? তাই একটু বুড়ি ছুঁয়ে যেতে এলি?'

খুকু একটু অপ্রতিভভাবে বলে, 'বাঃ, তা কেন? তোমাদের কাছেই এসেছি। তবে আরো দু-চার জায়গায় যেতে হবে। তাই।'

এটা আরো রহস্যময় মনে হচ্ছে।

খুকু বরের দিকে তাকিয়ে বলে, 'এই, বলো না—ইয়ে, ওটা বার করো না?'

'ওটা তোমার হ্যাণ্ড-ব্যাগেই আছে। তুমিই বলো না।'

সুনয়না বলে, 'তোমরা তাহলে রহস্য চালিয়ে যাও, ভাই। আমি দেখিগে চায়ের জলটা ফোটাতে পারল কিনা।'

'আরে বাবা দাঁড়াও, দাঁড়াও। রহস্যটা ভেদই হয়ে যাক।'—বলে খুকু তার কাঁধ থেকে নামিয়ে-রাখা ঢাউস ব্যাগটার মুখ খুলে মেয়েদের স্বভাব অনুযায়ী বেশ কিছুক্ষণ তার মধ্যে হাত চালিয়ে ওলটপালট করে অতঃপর একগোছা রঙিন খাম বার করে তার মধ্যে থেকে দেখে দেখে একখানা নিয়ে বরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'এই নাও। তুমি দাও। আর, যা-যা বলবার ভবিষ্যুক্তভাবে বলো। এটা তোমার করণীয় কর্তব্য, বুঝলে?'

'বুঝলাম।'

বলে বীরেশ সুনয়নার দিকেই খামটা বাড়িয়ে ধরে ঘাড়টা একটু চুলকে বলে, 'ব্যাপারটা হচ্ছে আগামী বুধবার দিন এক ব্যাটা জীবনে প্রথম অন্নগ্রহণ করবে। তার অনারেই আর-কি, আপনারা সেদিন সে-ব্যাটার বাপ-পিতেমোর ভিটে বদ্যিবাটির বাটিতে পায়ের ধুলো দিয়ে একসঙ্গে দুটি ডালভাত খাবেন।'

চিঠিখানা মার্কামারা ছবি দেওয়া 'শুভ অন্নপ্রাশন'-এর একখানি নিমন্ত্রণপত্র। পত্রের বয়ানও মার্কামারা ন্যাকা-ন্যাকা। 'এই বুদবাল দিন দুপুলে আমি পথোম পায়েথ-ভাত খাব। তোমলাও আমাল থঙ্গে খাবে। বুঝলে? নিত্তয়ই নিত্তয়ই আতবে।'

সুনয়না বিনাবাক্যে চিঠিটা পুরন্দরের হাতে দেয়। পুরন্দর দেখে নিয়ে একটু বোকার মতো বলে বসে, 'কার ছেলে?'

খুকু হিহি করে হেসে মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চেপে বলে, 'হল তো? কাউকে কিছু জানানো হবে না, জানালে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। এখন কাটা মাথা জুড়ে ঘাড় হেঁট করে উত্তুর দাও।'

সুনয়না কেমন যেন স্তিমিত গলায় বলে, 'এতবড়ো সুখবরটা এতদিন ধরে চেপে রেখেছিস?'

'ওই তো বললাম। ওই মহাপুরুষটির খেয়াল, কাউকে কিছু বলা হবে না। পরে শুনে দাদা-বৌদি কম রাগ করল? বলল, মা-ই না-হয় নেই, আমরা তো আর মরিনি? ওই তোদের বদ্যিবাটির হসপিটালে—ইস!'

বীরেশ অম্লানবদনে বলল, 'বদ্যিবাটির হসপিটালে দৈনিক কতকগুলো করে প্রাণী পৃথিবীর আলো দেখছে, সে হিসেব যদি শুনতেন!'

সুনয়না তখন একটু চাপা গলায় বলে, 'তা না-হয় হল, কিন্তু মাথাকাটা যাওয়ার প্রশ্নটা আসছে কোথা থেকে?'

বীরেশ আর-একবার ঘাড় চুলকে বলে, 'ওই মানে হরবখৎ তো কানের কাছে শাসানি শুনতে হয়, সর্বত্র পোস্টার 'একটি বৈ দুটি নয়—' অথচ সেই দুর্ঘটনাই ঘটিয়ে বসা হল। তাই আর কি! তো যাক গে, এখন সবিনয় নিবেদন,

যাবেন নিশ্চয়ই। বুঝলেন? না-গেলে কিন্তু সমস্ত ঝাল আমার ওপরেই ঝাড়া হবে। আমি 'ভবিষ্যুক্ত' করে বলিনি বলে।'

পুরন্দর বলে, 'এ তো আবার দেখছি অফিস ডে—'

বীরেশ বলে ওঠে, 'অফিস ডে, আপানার? আপনি আর হাসাবেন না, ছোড়দা! আপনার ওই খবরের কাগজের অফিসে আপনি যে নিয়মিতই পায়ের ধুলো দেন, এ আমি বিশ্বাসই করি না। এ কি আমাদের মতো অভাগা-হতভাগা কেরানি? যাবেন, যাবেন। নিশ্চয়ই যাবেন। কী খুকু, ঠিকমতো বলা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে?'

খুকু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'বেশি ঢঙ কোরো না। এই ছোটোবৌদি, নিশ্চয়ই করে ছোড়দাকে নিয়ে যাবি। না-হলে আমার প্রেস্টিজ পাংচার। কত ছেলেমেয়ে আটোগ্রাফ খাতা বাগিয়ে বসে থাকবে। কত তরুণী-কবি পুরন্দর রায়কে দেখতে পাবার আশায় দিন গুনছে। এ তো আর শুধুই ছেলের মামা নয়, বাবাঃ। কী একখানা কেষ্টবিষ্টু! ছোটোবৌদি, মুখ রাখিস ভাই।'

সুনয়না আস্তে বলে, 'কেষ্টবিষ্টু জনকে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নেব আমার এমন কী সাধ্যি? তবে আমার বিষযে গ্যারান্টি থাকল।'

পুরন্দর ভুরু কুচকে বলে, 'তার মানে? তুমি কি একা যাবে নাকি।' সুনয়না বলে, 'একা আর কী করে যাব? চিনিই না ভালো করে। সেই যা বিয়ের সময় সবাই মিলে যাওয়া হয়েছিল। তোমার যাবার সময় না-হলে আমি তালতলায় চলে গিয়ে দাদা-বৌদির সঙ্গে যাব। ওনারা তো নিশ্চয়ই যাবেন? মামাই তো ভাত খাওয়ায়।'

পুরন্দর হঠাৎ রেগে উঠে বলে, 'একেবারে প্রোগ্রাম ঠিক করা হয়ে গেল। তালতলায় চলে যাব। আমি বলেছি, যাব না?'

'যাবও বলোনি। শোনামাত্রই অফিস ডে দেখিয়েছ।'

পুরন্দর আরো রাগের গলায় বলে, 'তা এমন আচমকা সব ব্যাপার। একটা বাচ্চা জন্মেছে, আর ছ'মাস ধরে খবরটা চেপে বসে আছ।'

সুনয়না খুব ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'ওরা জানে কবি পুরন্দর রায় কারো খবর জানার জন্য ব্যস্ত নয়। খবরটা জানালেও হয়তো সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাবে।'

পরিস্থিতি খারাপ করবে না ভাবছিল, হঠাৎ কী যে হল, সুনয়নার মনে হচ্ছে কোথায় যেন সে হেরে গিয়ে বোকা বনে বসে আছে। সেই হেরে যাওয়ার জ্বালাটাই যেন আর কারো ওপর হানতে ইচ্ছে করছে। সুনয়নার বিয়ের পরে বিয়ে হয়েছে খুকুর। খুকুর মেয়ে ইস্কুলে পড়ছে, আবার খুকু ছবি-আঁকা কার্ড নিয়ে ছেলের ভাতের নেমন্তন্ন করতে এসেছে। এটা যেন সুনয়নার পরাজয়ের গ্লানি।

অথচ পুরন্দরও অপদস্থ। সুনয়না যে হঠাৎ অন্যের সামনে তাকে এভাবে কোণঠাসা করবে, তা তো ভাবনার মধ্যে ছিল না। কাজেই রাগ আরো চড়ে। বলে ওঠে, 'তা তুমিই-বা এ-সব খবরটবর রাখো কই? এ তো মেয়েদেরই কাজ!'

'মেয়েদেরই কাজ? তাই নাকি? জানা ছিল না তো। তাহলে তো ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। আমি তো জানি আমি বহিরাগত, আমার কাজ হচ্ছে স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী হবার চেষ্টা করে যাওয়া।'

হঠাৎ জায়গাটা থমথমে হয়ে ওঠে।

আর সুনয়না হঠাৎ যেন সবটাই ঠাট্টা চালাচ্ছিল, এইভাবে সেই পরিস্থিতিটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে কাঁচের বাসন ভাঙার শব্দে হেসে উঠে বলে, 'নাও, এখন দুই ভাই-বোনে ঝগড়া করো, অথবা পুরনোকালের গল্প করো বসে বসে। কিন্তু খবরদার বলছি খুকু, আমার নন্দাইটিকে 'এক্ষুনি চলো' বলে তাড়া দিবি না।'...

আমি ওর জন্যে একটা 'স্পেশাল ডিশ' বানাতে যাচ্ছি। খুব দেরি হবে না অবশ্য। ওঃ, তোর ওপর যা রেগে গেছি। কী সাংঘাতিক মেয়ে। আর তোর মেয়েকেও বলিহারি দিই। কই, বলে ওঠেনি তো তার একটা ভাই হয়েছে। কই রে রিঙ্কু কোথায়?'

অদৃশ্য কোনোখান থেকে রিঙ্কুর গলা শোনা যায়, 'জ্যোৎস্নাদির সঙ্গে গল্প করছি।'

'এই এক মেয়ে'— খুকু রেগে ওঠে, 'বসুধৈব কুটুম্বকম, বিশ্বসুদ্ধু সকলের সঙ্গে এক মিনিটে ভাব।'

বীরেশ এখন পরিস্থিতি 'সহজ' ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে দরাজ গলায় বলে ওঠে, 'স্বভাবটা মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছে। যা একখানি 'জিনিস' এই অভাগার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন ছোড়দা।'

'যাক বাবা! হাওয়া হালকা।' খুকু বলে ওঠে, 'ছোড়দারে, তুই গেলে শ্বশুরবাড়ির লোকের কাছে আমার মান-মর্যাদা কতটা বেড়ে যাবে, তা ভেবেও অফিস কামাই করে যাবি বুঝলি। তুই আমার সত্যি নিজের ভাই, ওখানে পাড়ার ছেলেরা বিশ্বাসই করতে চায় না। যেন বিখ্যাতদের যতসব অখ্যাত আত্মীয়স্বজন থাকে না।'

হাওয়া হালকাই থাকে। কারণ সেটাকে হালকা রাখার আশ্চর্য একটা ক্ষমতা

আছে সুনয়নার। সুনয়না তার সেই ক্ষমতাটিকে একদম পুরোদস্তুর প্রয়োগ করে চায়ের আসরটি জমজমাট করে তোলে।

খুকু বলে, 'সত্যি এক্ষুণি-এক্ষুণি নন্দাইয়ের জন্যে স্পেশাল ডিশ বানিয়ে ফেললি! ধন্যি বাবা! কিমার পুর-দেওয়া ডিমের পাটিসাপটা? এটা করতে হলে আমার তিন বেলা প্রস্তুতি চালাতে হত।'

সুনয়না বলল, 'ঢঙ রাখ্ তো! মালমসলা প্রায় সময় ফ্রিজে মজুতই থাকে। বানিয়ে ফেলতে আর কতক্ষণ?'

'ওই তো,' বীরেশ মাথা চুলকে বলে, 'ওনার সংসারে ফ্রিজকে যে অপাপবিদ্ধ রাখতে হয়। আমিষ বস্তুর প্রবেশাধিকার নেই।'

সুনয়নার মনে পড়ে, শ্বশুরবাড়ি এসে তালতলার বাড়িতেও এইরকম একটা নিয়ম যেন দেখেছিল। যা রাখা হত তাতে, তা ওই অপাপবিদ্ধতা।

কী আর মন্দ সেটা? ভালোই তো। একটু বিধিনিষেধ, একটু নিয়মকানুন মানার মধ্যে তো এক ধরনের নির্মলতাও আছে। চন্দননগরেও তো দেখেছে, সোনাকাকিমার রান্না হত আলাদা।

এখানে, সুনয়না কার জন্যে কী করবে?

সুনয়না বলে, 'তাতে একটু অসুবিধে ঘটে বটে। তো যাক্, আর-একটু দিই?'

'ওরে সর্বনাশ! আজ তো ভাত খাওয়াই দুরূহ হবে। বড়ো শালাজের কাছে বকা খেতে হবে।'

বলে ফেলে যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি বলে, 'কী গো, তোমার বড় বৌদি বলে রেখেছিলেন না, যেদিন কলকাতায় আসবে—'

রিঙ্কি চটপট বলে ওঠে, 'যেদিন কলকাতায় আসা হয় বড়োমামীর কাছেই তো যাওয়া হয়, খাওয়া হয় বাবা! ছোটোমামীর কাছ সাতজন্মে আসো? ছোটোমামী কী সুন্দর দেখতে। বাড়িটাও কী সুন্দর! রান্নাঘরটা পর্যন্ত কী চমৎকার সাজানো—'

সুনয়না আবার হাল ধরে। 'হুঁ, খুব তো বলছিস, ছোটোমামী কী সুন্দর দেখতে। তো গল্প করতে গেলি তো ওই জ্যোৎস্নাদির সঙ্গে। আমার সঙ্গে তো কথাই হল না। ভাই কেমন দেখতে হয়েছে?'

'ভীষণ সুন্দর।'

'হাসতে শিখেছে?'

'দারুণ।'

'তোকে দিদি-দিদি বলে ডাকে?'

'আহা! কথা শিখেছে বুঝি?'

'ওমা শেখেনি? আমি ভাবছি তোকে দিদি-দিদি করে ডাকে, তোর হাত ধরে বেড়াতে যায়...'

'এঃ, ঠাট্টা হচ্ছে?'

খুকু বলে, 'এলে তো আর উঠতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু উঠতেই হবে। ওর দুই পিসির বাড়ি যেতে হবে, শ্যামবাজারের দিকে।'

কোথায় জমছিল মেঘ। মেঘের অন্তরালে বজ্র-বিদ্যুৎ।

ওরা বেরিয়ে যেতেই পুরন্দর হঠাৎ ফেটে পড়ে বলে ওঠে, 'ওসব লজ্জায় মাথা কাটা-টাটা সব বানানো কথা। ও-বাড়ির সবাই সব জানে নিশ্চয়ই।'

আর সুনয়না বরের ওই অপমানে ফেটে-পড়া মুখটার দিকে তাকিয়ে স্থিরভাবে বলে, 'সেটাই স্বাভাবিক। এ-সব ক্ষেত্রে নজর লাগার ভয়ে বাঁজা মেয়েমানুষকে লোকে অ্যাভয়েড করারই চেষ্টা করে।'

হঠাৎ যেন পরিবেশটার ওপর সপাং করে একটা চাবুক পড়ল। নাকি সুনয়নার ওপরই পড়ল। কে বসাল এই চাবুকটা? সুনয়না নিজেই? সুনয়নার মুখ দিয়ে ওই কুৎসিত, অশালীন শব্দদুটো উচ্চারিত হল? নাকি সুনয়নার মুখ দিয়ে আর কেউ বলে উঠল?

'নজরলাগা! বাঁজা মেয়েমানুষ!'

স্তব্ধ হয়ে গেল সুনয়না।

পুরন্দরের ফেটে-পড়া ক্রুদ্ধ উক্তির উত্তরে সে তো বলতে যাচ্ছিল, 'ওঁরা জানবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক। ও-বাড়ির ওঁরা সম্পর্ক রেখে চলে আসছেন।'

কিন্তু সেই উদ্যত উত্তর কোন্ অশুভের কারসাজিতে উদ্যত ছুরি হয়ে পরিবেশটাকে বিদ্ধ করে বসল? কোথায় ওৎ পেতে বসেছিল এই অভাবিত শত্রু? যে সহসা এমন নিরাবরণ করে ফেলল সুনয়না নামের, ভদ্র, মার্জিত সভ্য মেয়েটাকে?

কোথায় লুকোবে সুনয়না তার এই নিরাবরণ মূর্তিটাকে? অথচ সে জানত না, এই ধরনের কথা তার জানা ছিল! তবে? কে বলল? কেন বলল?

চাবুকের আঘাতটা পুরন্দরের ওপরও এসে আছড়ে পড়েছিল বৈকি। তবু সুনয়না নিজে যতটা বিচলিত হল, পুরন্দর বোধহয় ততটা নয়।

তবে চমকে উঠল বৈকি। তারপর তিক্ত ব্যঙ্গের গলায় বলে উঠল, আরেব্বাস! সুনয়না দেবীরও এ-সব ভাষা জানা আছে নাকি? ধারণা ছিল না!..

তারপরই বলে উঠল, অবশ্য ধারণা না-থাকার কারণ এখন আর নেই।

আরো অনেকরকম কড়া-কড়া ভাষা যে তোমার জানা ছিল, সেটা তো জানা হয়ে গেছে।...'

সুনয়নার ভিতরের জ্বালাটার অন্য ব্যাখ্যা করল পুরন্দর। মনে হল, সুনয়নার এমন নির্লজ্জভাবে নিজেকে ওই 'বাঁজা মেয়েমানুষ' বলে উল্লেখ করাটা পুরন্দরের প্রতি আক্রোশের প্রকাশ। যেন পুরন্দরের একটা খেয়াল সুনয়নাকে অকারণ বঞ্চিত করে, অন্যের চোখে হেয় করে রেখেছে।

খুব রাগ হল। মনে হল, ওঃ তোমার মধ্যে এই জ্বালা পোষা ছিল? কই, কোনদিনই তো তেমনভাবে টের পেতে দাওনি, তুমিও আর-পাঁচটা হাবিজাবি মেয়ের মতোই তাড়াতাড়ি মা হবার জন্যে আকুল ছিলে? তোমার মধ্যেও ওই হাবিজাবিদের মতোই ধারণা, মা হওয়াটাই মেয়েদের জীবনে চরম সার্থকতা। তাই খুকুকে দেখে তোমার হিংসেয় প্রাণ ফেটে গেছে। আরে বাবা, বাইরে নিজেকে যতই মহিমান্বিতা দেখাও, ভেতরে সবাই এক। সেই অতিসাধারণ মেয়েমানুষ মাত্র। তোমার তখন তো মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, খুকু বুঝি কী এক পরম ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে বসেছে, যে ঐশ্বর্য থেকে তুমি বঞ্চিত। অথবা তোমায় বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। আহা, কী ঐশ্বর্য! ও ঐশ্বর্য তো ফুটপাতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। বস্তিতে, ঝুপড়িতে মশা-ছারপোকার মতো বাড়ছে। রাবিশ। 'সুবিধে, স্বাচ্ছন্দ্য, মুক্তি'— এগুলোর মানেই জানো না।

কথাগুলো অবশ্য মনের মধ্যেই উচ্চারিত হয়ে চলেছে। সুনয়না তো সেই একটিমাত্র কথা বলে অথবা একটি চাবুক বসিয়েই একদম নিঃশব্দ হয়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর পিঠের দিকটাই শুধু দেখা যাচ্ছে।

এই জানালাটা দিয়ে অবশ্য রাস্তা দেখা যায় না। দেখা যায় পাশের ফ্লাটে একটা ছোট্ট ব্যালকনি, যেখানে ফ্লাটের মালিক সারি-সারি ক'টা ছোট্ট-ছোট্ট টবে কী যেন গাছ লাগিয়ে 'ঝুলন্ত বাগান' করে রেখেছেন।

রোজ দেখা দৃশ্য। তবু আজই হঠাৎ সুনয়নার মনে হল, সুনয়নাও যেন ওইরকম কারো শখের বাগানের একটি ঝুলন্ত টব।

পুরন্দরের মনে হল, এখন তার নিজের দিকের কোনো বন্ধুটন্ধু এলে ভালো হয়। নীরবতা বড়ো অসহ্য। কেউ আসছে না। অথচ অন্য অন্য ছুটির দিনে-টিনে তো বাইরের লোকের ভিড়ে কতদিন নিজেরা একসঙ্গে বসে চা-টা খাওয়াও হয়ে ওঠে না।

সুনয়না বলে, 'ছুটি তো নয়, ছুটির ছলনা।'

আজ ওরা চলে যাবার পরই যেন একটা শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে এসেছে।

জ্যোৎস্না বোধহয় এতক্ষণে রান্নাঘরের কোণে নিজের ব্রেকফাস্টটি নিয়ে বসেছে। তাই তারও নীরবতা। এই ব্যাপারে তার বেশ নিষ্ঠা। যখনই যা খায়, ধীরেসুস্থে বাবুগেড়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে। তা না-হলে হয়তো এখনি 'বৌদি এখন কী কাজ? এখন কোন্‌টা হবে?' বলে বকবক করতে আসত।

অনেকক্ষণ সিগারেট টেনে পুরন্দর হঠাৎ খাপছাড়াভাবে বলে উঠল, 'আমি ওদের ওখানে যাচ্ছি-টাচ্ছি না।.. নেমন্তন্নর ছলে এসে অপমান করে যাওয়া।'

নীরবতার প্রাচীর ভেঙে পড়ল।

সুনয়না ফিরে দাঁড়াল।

তীক্ষ্ণ বিস্ময়ের গলায় বলে উঠল, 'অপমান? খুকু? তোমায়?'

এটা আশঙ্কা করেনি পুরন্দর, তাই একটু ছাড়া-ছাড়া গলায় বলে উঠল, 'তাছাড়া আর কী? শুধু আমায় কেন? আমাদেরই।'

'আমি অমন অদ্ভুত কথা ভাবতেই পারি না।'

পুরন্দর রেগে উঠে বলে, 'অথচ এইমাত্র সেই কথাই বলেছ।'

'সেই কথাই বলেছি?'

'তাছাড়া আর কী? নজর লাগার ভয়ে হ্যানোত্যানো—'

'সেটা আমি বলেছি শুধু যা স্বাভাবিক তা-ই বলতে। সাধারণত মেয়েদের মধ্যে এ কুসংস্কার থাকেই।'

'নিজেকে তুমি যা বললে, তা যে সত্যি নও, তা তো ভালোই জানো।'

'শুধু আমি জানলেই তো হবে না। যাক, থাক ও-কথা। তবে এ-কথা বলব না, ওরা আমাদের অপমান করতে এসেছিল। ভালোবেসেই এসেছিল।'

তারপর একটু হাসির মতো করে বলে, 'তবে তোমার চিন্তাধারা হয়তো আলাদা। 'ছোড়দা রে তুই আমার বাড়ি গেলে, সেখানে আমার মানমর্যদা বাড়বে, শ্বশুরবাড়ির দেশের লোকের কাছে খাতির জুটবে। তোমাকে দেখার জন্যে লোকে হাঁ করে আছে—' এ সব কথা যদি তোমার অপমানজনক মনে হয়—'

পুরন্দর যেন সমুদ্রে একটা খড়কুটো পেয়ে যায়। তাই সেটাকেই চেপে ধরে বলে ওঠে, 'ওই তো, ওইখানেই তো আপত্তি। 'দাদা' ওর বাড়ি যাবে, সেটাই একমাত্র আনন্দের বিষয় হওয়া উচিত। তা নয়, তার থেকে লোকের কাছে মানমর্যাদা বাড়ানোর ফায়দা লোটার চিন্তা। খুব খারাপ।'

কথাটা বলে ফেলে পুরন্দর বেশ-একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। ভাবে, অকাট্য একখানা যুক্তি দেওয়া হয়েছে। আর কিছু বলবার নেই।

কিন্তু আশ্চর্য, সেই না-থাকা জায়গাতেও কিনা বলে উঠল সুনয়না, 'সেটাও খুবই স্বাভাবিক। বিখ্যাত লোকদের ব্যাপারে তা-ই হয়।... এই তুমি। তুমি

যদি নেহাতই তোমার গজদন্ত-মিনার থেকে নেমে পড়ে, ছোটবোনের মফস্বলের বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো দিতে যেতে পারো, নিশ্চয়ই দেখতে পাবে, সেখানে যজ্ঞিবাড়ির কাজকর্মের হাল ধরে বসে রয়েছেন তোমার দাদা, আর তোমার বৌদি আছেন হয়তো ভাঁড়ারের গিন্নি হয়।... তুমি শুধু নেমন্তন্ন গিয়েই কৃতার্থ করবে। তাহলে?... যাক, সেটা যদি পারো তো ভালো। না-হলে আমায় একটু আগে বলে দিয়ো। আমি ওঁদের সঙ্গেই চলে যাব।'

'ওঃ। সেই ওঁদের সঙ্গে! সেই প্ল্যানটিই মাথায় ভেঁজে রাখা হয়েছে। আমি একেবারে যাবই না ধরে রাখার মানে? বলেছি সে-কথা।'

সুনয়না এবার সত্যি ভালো করে হেসে ফেলে বলে, 'মিনিট কয়েক আগেই বলেছ।'

বলেছিল তাই। তবু গেল পুরন্দর বদ্যিবাটিতে।

গেল ট্রেনে নয়, নিজের সেই সদ্য-লব্ধ গাড়িতে। সস্ত্রীক বেশ-একটু বেলায়। রীতিমতো মাননীয় অতিথির মতোই।

সুনয়না বলেছিল, 'গাড়িতে যাবার কী দরকার?'

'না যাবারই-বা কী কারণ থাকতে পারে?'

'একটু চালিয়াত মতো লাগতে পারে।'

'একদম পাতি মধ্যবিত্ত মনোভঙ্গি। গাড়ি জিনিসটা চড়বার জন্যেই।'

'তা সেটা অস্বীকার করা যায় না অবশ্য!'

অতঃপর যা-যা হবার, তা-ই হল। এদের দেখে খুকু আহ্লাদে উল্লাসে বাড়ি মাথায় করল, বীরেশ আনত হয়ে বারকয়েক কুর্নিশ করে করে তার অভিব্যক্তি জানাল। খুকুর শাশুড়ি বিগলিত আনন্দে ছুটে এসে স্বাগত জানালেন। যার মধ্যে বারবার উল্লেখ ছিল, 'তোমরা আসতে পেরেছ দেখে কী আহ্লাদ যে হল। আমি তো বলছিলুম, ছোটছেলের কত কাজ, উনি কি আর আসতে পারবেন?'

অতঃপর দেখা গেল সুনয়নার ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে-বর্ণে মিলে গেছে। পুরন্দরের দাদা দীপঙ্কর ফর্সা পাটভাঙা কোঁচানো ধুতির কোঁচার আগা পেটে গুঁজে, তার ওপর শুধু গেঞ্জি চাপিয়ে রান্নার তদারকি করছে। আর পুরন্দরের বৌদি ভাঁড়ারঘর থেকেই বেরিয়ে এসে বলে উঠল, 'আহা রে, সেই এলেই। তো ছেলের 'মুখেভাত'টা দেখতে পেলে না। পঞ্জিকার মতে কাজ তো। বারবেলা না কী যেন পড়ে যাচ্ছিল।'

পুরন্দর খুব সহজ হবার ভঙ্গিতে বলল, 'আগেই খেয়ে নিয়েছে? গুড্। তো কই, সেই লায়েক ব্যাটাটি? দেখি—'

বৌদি আহ্লাদে ভাসা গলায় বলল, 'ওই তো ওর মা-বাবার ঘরের মধ্যে। চন্দনটন্দন মুছে ফুলের মালা ছিঁড়ে দিব্যি রাখাল সাজ করে বসে আছেন বাবু।'

বাড়িতে পুরন্দব বলেছিল, 'একটা কিছু উপহার দেওয়া উচিত তো?'

সুনয়না হেসে বলেছিল, 'ও বাবা। তোমার এ-সব তুচ্ছ ঘরোয়া কথা মাথায় থাকে?'

'বাঃ থাকবে না? শ' পাঁচেক টাকাব গিফট চেক দিয়ে দেওয়া যাক, কী বল?'

'তোমাব যদি সেটাই সুবিধে হয, তাই দেবে!'

অতএব তাই এনেছিল পুরন্দব।

ঘরে যেতে-যেতে নিচু গলায় বলল, 'তুমিই হাতে করে দাও, কী বল?'

'বাঃ! তা কেন? তুমি মামা! আসল জন।'

পুরন্দর অতএব অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে একটু ধান-দুর্বো তুলে নিয়ে আশীর্বাদ মতো করে, তার দেয়টি ভালো করে মেলে ছেলের হাতে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করে বলে উঠল, 'আবে, এ যে দারুণ সুন্দর দেখতে হয়েছে রে, খুকু? তুই তো কেলে!'

খুকু একটু মুখ টিপে হেসে বলল, 'অন্য একটা সোর্স তো রয়েছে।'

কথাটা সত্যি। মেয়ের বিয়ের সময় পুরন্দরের মাকে বোঝানো হয়েছিল পাত্র এমন আর কি! মফস্বলে একখানা মস্ত বাড়ি আর বাগান-পুকুর আছে, এই পর্যন্ত। করে তো সামান্য কাজ— ডেলি প্যাসেঞ্জার!'

কিন্তু মহিলা তাঁর ভাজের বোন-পো এই ছেলেটির রূপ দেখেই বিগলিত হয়ে বলেছিলেন, 'তা হোক। আমার মেয়েই-বা কী এমন আহামরি। বদ্যিবাটি-শেওড়াফুলিকে এখন আর কেউ পাড়া-গাঁ বলে না।'

তা খুকুর ছেলেটা সেই 'অন্য সোর্স' থেকেই রূপটা পেয়েছে, দেখা যাচ্ছে।

'নাম কী রেখেছিস?'

'ওই তো—আজই তো নামকরণ হল। অবশ্য আগে অষ্টোত্তর শতনাম হয়ে গেছে। তবে অফিসিয়ালি নাম হল দেবদূত।'

'বাঃ। ঠিক উপযুক্ত নাম।...' বলেই পুরন্দরকে অবাক করে দিয়ে সুনয়না তার গলায় দিব্যি একখানা সোনার হার ঝুলিয়ে দিল!'

অবাক হবার পর রাগ!

অতবড়ো একখানা সোনার হার দেবার মানে? তাও একবার পুরন্দরের সঙ্গে পরামর্শমাত্র নয়? হয়তো গড়িয়ে দেয়নি, হয়তো নিজের সম্পত্তি থেকেই দিয়েছে, কারণ হারটা নেহাত শিশুজনোচিত নয়। ওজনদাব। মাপেও বড়ো। বেমানান? হুঁ! সোনার আবার মানান-বেমানান!

খুকু লাফিয়ে উঠল, 'ওমা! ছোটবৌদি? ভাগ্নের মুখ দেখাব ট্যাক্স দিতে এই এতোখানি খসালি?'

বীরেশ বলল, 'উঃ। ব্যাটা খুব রোজগারি হয়ে উঠেছে।'

খুকুর শাশুড়িও ধন্যি-ধন্যি করলেন। সমবেত মহিলারাও সুস্মিতমুখে হারটার গড়ন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার ভানে হাতে করে নেড়ে-চেড়ে ওজনটা বুঝতে চাইলেন।

আর পুরন্দর বেজার মুখে ঘর থেকে চলে এল।

অতঃপর অবশ্য বৈঠকখানা-ঘরের ডাকে তাকে স্রোতে ভেসে যেতে হল। হ্যাঁ, অটোগ্রাফ খাতা, অথবা এমনি খাতা কিংবা একটু-আধটু কাগজের টুকরো হাতে বালখিল্য-বাহিনী ঘিরে ধরল। কয়েকজন অবিবাহিতা তরুণীও সে দলে যোগ দিল। ইনি, উনি, তিনি কিছু সমীহসূচক কথা বললেন।

তা এ-সব কিছু নতুন নয় পুরন্দরের কাছে। সভা করতে যাওয়ার সূত্রে, এ-রকম সব পরিবেশ তো তার মুখস্থ।

তবু একসময় সুনয়নার সঙ্গে একা একটু যোগাযোগ ঘটল। বলে উঠল, 'তুমি যে খুকুর ছেলেকে ওই হারটা দেবে, তা তো আমায় বলোনি?'

সুনয়না খুব সহজ গলায় বলল, 'তোমায় আর কি বলতে যাব। গড়িয়ে দিতে তো হয়নি। বাড়িতে ছিল।'

'বাড়িতে ছিল বলেই বাঃ। এটা কিন্তু তুমি ঠিক করোনি। এতটা দেবার কী দরকার ছিল?' বলে খেলো হবার ভয়ে কবি পুরন্দর অন্য পথ ধরল। বলল, 'এটা যেন দাদা-বৌদির ওপর টেক্কা দেওয়া হল। ওঁরা নিশ্চয়ই এতটা দেননি।'

সুনয়না চোখ কপালে তুলে বলল, 'ওমা, সেকী? রাজার হাতের ওই মোটাসোটা বালাদু'টো, কপালে টিকলি, পায়ের গহনা—সবই তো দাদা-বৌদির দেওয়া। তাছাড়া মামার বাড়ি থেকে দেয় হিসেবে ভাতের আসন-বাসন, অনুষ্ঠানের যাবতীয়—সবই তো ও-বাড়ি থেকে এসেছে। দাদা কোলে নিয়ে ভাত খাইয়েছেন বলে, আলাদা আশীর্বাদী বড়ো একখানা 'পাত্তি' খসিয়েছেন। সব দেখলাম তো।'

তারপরই হঠাৎ একটু মধুর হেসে বলল, 'তো তবুও যদি একটু বেশিই হয়ে যায়, খারাপটা কী? নতুন অ্যাম্বাসাডারের টেক্কার ওপর আর-একটু মাত্রা যোগ হল।'

কে যেন এসে পড়ল। উত্তর দেওয়া হল না পুরন্দরের।

উঃ, অসহ্য। হঠাৎ কী ভেবেছে সুনয়না? পুরন্দরকে এমন ডাউন করার

চেষ্টা কেন? আবার আগে থেকে ঘোষণা করে রাখা হয়েছে, 'খাওয়া হয়ে গেলে তুমি গাড়ি নিয়ে সোজা তোমার অফিসে ফিরে যেয়ো। আমি অত তাড়াতাড়ি নাই-বা গেলাম। দাদাদের সঙ্গে বিকেল-সন্ধে নাগাদ ট্রেনে ফিরব। অনেকদিন ট্রেনে চড়া হয়নি। তালতলার বাড়ি থেকে তুমি অফিস-ফেরত আমায় নিয়ে নিয়ো।'

আদিখ্যেতা। হঠাৎ তালতলার বাড়িটি এত আপন হয়ে ওঠার মানে কী?... তা তো নয়। লোকের সামনে স্বাধীনতা-স্বেচ্ছাচারটি দেখানো।

মনটা তেতো হয়ে ছিল।

হঠাৎই একটি খবরের দখিনা বাতাস এসে তিক্ততাটা উড়িয়ে দিল।

খবরটা আনল খুকুর এক ভাগ্নে। ওই বদ্যিবাটি থেকে প্রকাশিত একটা দীনহীন সাপ্তাহিক রবিবারে-রবিবারেই বেরোয়। বোধহয় সেটা হাতে নিয়ে উল্লসিত গলায় বলতে-বলতে ভেতরে ঢুকে এল, 'মামী, দেখো 'সাপ্তাহিক সাহিত্য সংবাদ'-এ তোমার ছোড়দার নাম। লিখেছে, এবার উনি সব্যসাচী ভূমিকায় নামছেন। শারদীয় 'চক্রবাল'-এ ওঁর দ্বিতীয় কলমের কারিগরি দেখা যাবে। পুরন্দর রায়ের বৃহৎ উপন্যাস উতঙ্ক উপাধ্যায়ের উপাখ্যান-ই এবারের শারদ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।'...

বাস! হুমড়ে পড়ল অনেকেই।

পুরন্দরের বৌদি বলল, 'বাঁচলাম বাবা। এতদিনে আমাদের খাদ্যযোগ্য দেবার কিছু ভেবেছ। তোমার কবিতায় দাঁত ফোটাই, এমন ক্ষমতা তো নেই।'

পুরন্দরের দাদা বলল, তা ভালোই। কবিতার থেকে গল্প-উপন্যাসের চাহিদা তো বেশি, আর দক্ষিণাও নিশ্চয়ই বেশি।'

আর খুকু ঝাঁপিয়ে এসে বলল, 'লিখলি তো এমন উদ্ভুট একটা নাম কেন রে বাবা, ছোড়দা? কত আধুনিক-আধুনিক নাম থাকতে থাকতে—যেন পুরাণের গল্পের মতো, 'একলব্যর উপাখ্যান'! 'নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান'! এর পরে অমন বিদ্ঘুটে নাম দিসনি বাপু। তো গল্পটাও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নয় তো?...নয়? বাঁচলাম বাবা! কবে বেরোবে? তোদের তো মহালয়ার আগেই বেরিয়ে যায়, তাই না?'

কিন্তু পুরন্দরের বৌ? সে কী বলল? তারই তো ভয়ানকভাবে কিছু-একটা বলে ওঠবার কথা।

'তোমার বইয়ের নামটা পাল্টে যাচ্ছে।'

এটা তার জানা ছিল ঠিকই। এবং প্রথমটা শুনেই খুব উত্তেজিত হয়েও আবার হঠাৎ স্থির হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল, ভালোই হল, এটা হয়তো আমার

কাছে শাপে বর। কবি পুরন্দর রায় যদি হঠাৎ একটা উপন্যাসই লেখে, সে খবরটা চট করে তো কাউকে ধাক্কা মারবে না। কবি তার গদ্যরচনাতেও নামকরণের সময় কাব্যিক শব্দ প্রয়োগ করতে পারে।... কিন্তু এখন? বদ্যিবাটি থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক সাহিত্য সংবাদ'-এর খবরে? যে-খবর দেখে পুরন্দরের বোন বলে উঠল, 'লিখলি লিখলি তো অমন একটা উদ্‌ভুট্টে সেকেলে নাম দিতে গেলি কেন? যেন পৌরাণিক গল্প শুনতে বসছি।...

স্থানীয় একটা মেয়ে অবশ্য তক্ষুণি বলে উঠেছিল, 'ভীষণ সেকেলে সব-কিছুই তো এ-যুগে সবথেকে মডার্ন ভাই। দ্যাখোনা, নাকে নথ না পরলে এখন এ-যুগে কনে সাজানো অচল।'

কিন্তু এ-সব কথা কি পুরন্দরের বৌ শুনেছিল? ও কি তখন সেখানে ছিল?

নাঃ। ওকে খুকুর এক জ্ঞাতি খুড়শাশুড়ি ডেকে গিয়েছিলেন নিজেদের বাড়িতে তাঁব প্রতিষ্ঠিত 'গোপালঠাকুর' দেখাতে। বলেছিলেন, 'তোমার বড়ো-জা তো প্রায়ই আসে-টাসে, দেখে গেছে।' তুমিতো কখনো আসোনা। চলো দেখাইগে!

শরিকি বাড়ি। বাড়ির উঠোন দিয়েই ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়ে যাওয়া-আসা। অনুরোধে পড়ে যেতেই হয়েছিল। কিন্তু গিয়ে হঠাৎ কীকরম যেন আচ্ছন্ন-করা একটা অনুভূতি এল। এই বাড়িটার সঙ্গে সুনয়নার সেই চিরচেনা বাড়িখানাব কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। এদের অবস্থা তেমন নয়, তাই বাড়ির এ অংশটি জীর্ণদশাগ্রস্ত।... এই ভাঙা-ভাঙা ইটের দেওয়াল, এবড়োখেবড়ো উঠোনের ধারে, রান্নাঘর, একধারে তুলসীমঞ্চ আর লাউমাচা।... কতদিন এমন দৃশ্য দেখেনি সুনয়না। খুকুব বাড়ির অংশ এদের হিসেবে রীতিমতোই বিলাসবহুল। খুকুর টিভি আছে, এবং ক্ষুদে একটা ফ্রিজও আছে, 'বসবার ঘর' বলে একটা জায়গা আছে, এবং সেখানে 'বসবার' যোগ্য আসনও কিছু আছে। এদের শুধু দালানে পাতা একখানা মস্ত তক্তপোশ! সেখানেই জটলা, সেখানেই অতিথি-আপ্যায়ন।

কতদিন এমন বাড়ি দেখেনি সুনয়না।

সুনয়না যেন হারিয়ে যাচ্ছিল। খুড়শাশুড়ির একটি তরুণ পুত্র লাজুক-লাজুক মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মা বললেন, 'এই যে আমার এই ছেলেটিও গল্প-পদ্য লেখেটেখে।'

সুনয়না হারানো মাঠ থেকে ফিরে এল। মনে-মনে একটু হাসল। এও লেখেটেখে! মুখে বলল, 'ভালোই তো'।

আর ছেলেটি দুম করে বলে বসল, 'ওনার কাছে যদি আমার দু-একটা লেখা দেখতে দিই, দেখে দেবেন?'

এই 'ওনা'টি অবশ্যই পুরন্দর রায়।

সুনয়না মজা দেখার ভঙ্গিতেই বলল, ' তা উনি তো পাশের বাড়িতেই রয়েছেন। জিজ্ঞেস করলেই হয়।'

'আপনি' 'তুমি'র ধন্দ বাদ দিয়ে শব্দরচনা।

ছেলেটি ঘাড় চুলকে বলল, 'ও বাবা। সাহস হয় না। উনি কত বড়ো।'

সুনয়নার হঠাৎ ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'বড়ো গাছে নৌকো বেঁধে ফেলে উনি 'অত বড়ো'র গৌরব অর্জন করছেন। ওই 'চক্রবাল' গোষ্ঠি নিজেদের প্রয়োজনে কাউকে-কাউকে গ্যাসবেলুনের মতো ফুলিয়ে তুলে দেখায়। হয়তো ওর মতো কবি আরো ঢের আছে, যারা কোথাও পাত্তা পায় না।

কিন্তু সত্যি তো আর তা বলা যায় না। তাই বলে, 'সময় তো খুব কম।'

'তা তো সত্যি। উনি তো আবার চক্রবালের সহকারী সম্পাদকও, তাই না? এবার তো আবার পুজোসংখ্যায় উপন্যাসও লিখেছেন।'

সুনয়না অবাক হল। এখানেও পৌঁছেছে খবর। তবু কৌতুকের গলায় বলল, 'তাই বুঝি? কে বলল?'

'এই যে এতে খবর বেরিয়েছে—'

ছেলেটি চট করে হাতের কাছের একটা তাক থেকে টেনে বার করে সেই একখানা 'সাপ্তাহিক সাহিত্য সংবাদ'। পাঁজির কাগজের মতো কাগজ, কয়েক পৃষ্ঠার পত্রিকা, তবু টাটকা খবর রাখে।

সেই খবরের পাতাটা সুনয়নার চোখের সামনে মেলে ধরে ছেলেটা।

ফিরে যাবার সময় গাড়িতে উঠতে যাবার মুখেও পুরন্দর আশা করেছিল শেষ মুহূর্তে হয়তো মত পরিবর্তন করে সুনয়না বলে উঠবে, 'যাকগে তোমার সঙ্গে চলেই যাই। আর বেশিক্ষণ থেকেই বা কী হবে?'

কিন্তু সে প্রত্যাশার পূরণ হল না।

তেমন ঘটনা ঘটা তো দূরের কথা, ধারেকাছে কোথাও দেখতেই পেল না সুনয়নাকে। দেখতে পেলে একটু সোহাগের ভাব দেখিয়ে নিচু গলায় বলতে পারত, 'কি হবে আরো ক'ঘন্টা এই ভিড়ের মধ্যে থেকে? চলো, যেমন দুজনে এসেছিলাম তেমনি যাই!'

কিন্তু সুনয়নার আঁচলের কোণটুকুও তো অনেকক্ষণই কোথাও ঝলসাতে দেখেনি। অথচ একবার দেখাটা না করে চলেই বা যাওয়া যায় কি করে? যেন বোকার মত লাগে নিজেকে।

আশ্চর্য! হঠাৎ তালতলা বাড়ির আত্মজনেদের সঙ্গে সুনয়নার এত আঁতাত

ঘটে গেল কখন? 'ওঁদের সঙ্গে ফিরব।'— মানে হয় এর? দাদার ছেলেমেয়ে দুটোই-বা হঠাৎ তাদের কাকিমণির এত অনুরক্ত ভক্ত হয়ে উঠল কী করে? সুনয়না ওদের সঙ্গে ফেরার ইচ্ছেটি ঘোষণা করা মাত্রই তাদের কী লাফালাফি। বৌদিটি অবশ্য পুরন্দরের মতে 'চির-ঘড়েল।' এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন এযাবৎ দুই জায়ে একসঙ্গেই ঘর-সংসার করে আসছেন। আর আশ্চর্য, সুনয়নাও সেই অভিনয়কেই প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে।

খুব খারাপ লাগছে পুরন্দরের। যেন একটা দামী জিনিস পরের বাড়িতে ফেলে যেতে হচ্ছে, এইরকম অস্বস্তি হচ্ছে।

যদিও বৌদি চোখেমুখে হাসির বিদ্যুৎ ছড়িয়ে আশ্বাস দিয়েছে, 'নিশ্চিন্ত থেকো ভাই, রাতের মধ্যে তোমার জিনিসটি নিশ্চিত ফেরত পাবে। বরং তুমিও আজ নিশ্চিন্তচিত্তে আরো বেশিক্ষণ অফিসে থাকতে পারবে। তোমাদের জাতটিব তো ওইটিই একমাত্র আনন্দের।'

তবু আশা করছিল পুরন্দর। তাই গাড়িতে উঠতে গিয়ে এটা-ওটা কথা কয়ে দেরি করছিল। অবশেষে শেষ চেষ্টা হিসেবে বলেই উঠল, 'তো তোমাদের বাড়ির ছোট গিন্নিটি গেলেন কোথায়? যাবার আগে জেনে নিই, গিয়ে কাজের মেয়েটাকে কোনো নির্দেশ দিয়ে রাখতে হবে কিনা।

বৌদি আবার চোখেমুখে বিদ্যুৎ খেলিয়ে বলল, 'তা বটে। ওরে মুন্না, দেখ তো তোদের কাকিমণি কোথায়? বল গে, কাকা চলে যাচ্ছে, যদি কিছু বলার থাকে, এসে বলে যাক।

মুন্না বলল, 'কাকিমণিকে তো তখন কে একটা বুড়ি তাদের বাড়িতে ঠাকুর না কি দেখাতে নিয়ে গেল।'

'কে একটা বুড়ি! মানে?'

পুরন্দরের উত্তেজিত ভাব দেখে খুকু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, বলল, 'আরে বাবা, আমার এক খুড়শাশুড়ির সঙ্গে গেছে। এই তো একই বাড়ি। শরিকি হিসেবে মাঝখানে পাঁচিল উঠেছে, তাই ওই আমবাগান দিয়ে ঘুরে যাওয়া। আচ্ছা, ডেকে দিচ্ছি। এই সুশীল, — যা, ছুট্টে যা! বলবি, ছোটমামাবাবু তাড়া করছে। একটু পরে সেই হাফপ্যান্ট-পরা ছেলেটা ফিরে এসে ভগ্নদূতের ভঙ্গিতে বলে, ছোট ঠানদিদের বাড়িতে নাই উনি। ওই মেজ ঠানদির বাড়িতে কাঠচাঁপার গাছ দেখতে গেছে।'

'কাঠচাঁপার গাছ।'

রাগে মাথা জ্বলে যায় পুরন্দরের। তবু লোকসমাজে মুখ রাখতে কাষ্ঠহাসি হেসে বলে, 'কাঠচাঁপার গাছ! সে জিনিসটা আবার কী? খুব দুর্লভ কিছু বুঝি?'

খুকু হেসে গড়িয়ে পড়ে বলে, এখানে মোটেই দুর্লভ নয়। সেজ জেঠির বাড়িতে তো কাঠচাঁপার বৃন্দাবন। তবে তোদের জগতে বোধহয় দুর্লভ। কলকাতা শহরটা তো এত হাত-পা ছড়াচ্ছে যে ফুলের জন্য আর এক ইঞ্চিও মাটি রাখছে না। তো ছোটবৌদিটা বরাবরই একটা ফুল-পাগল। দেখতে গিয়ে আটকে গেছে। একটু অপেক্ষা কর। নিজে ছুটে গিয়ে বলিগে, ওরে ছোটবৌদি, তুই তো এখানে চাঁপাফুল দেখে বেড়াচ্ছিস, ওদিকে ছোড়দা চোখে সর্ষেফুল দেখছে। চটপট চলে আয়। রথে ওঠার আগে একবার তোর মুখটি না দেখে—দাঁড়া একটু। ছুটে যাচ্ছি। হি হি হি।

পুরন্দরের হঠাৎ নিজেকে খুব অপদস্থ আর হেয় বলে মনে হয। 'ভ্যাট'! বলে রাগে জ্বলতে জ্বলতে গাড়িতে চেপে বসে।

ড্রাইভার স্টার্ট দেয়। আর স্টার্টের শব্দ ছাপিয়ে পুরন্দরের বৌদির শানানো গলাটি শোনা যায়, 'যাকগে। নিশ্চিত থেকো ছোটসাহেব। সন্ধেরাতের মধ্যেই নিশ্চয়ই তোমার জিনিস তোমাব বাড়িতে পৌঁছে যাবে।'

পুরন্দরের মনে হয়, পিছনে যেন রীতিমতো একটি সমবেত কলহাস্যরোল শোনা যায়।

অবশ্যই নির্দোষ কৌতুকের। তবে পুরন্দরের মনে হয় যেন তাকে কেউ বা কারা ব্যঙ্গ করে হেসে উঠল।

ঠিক আছে। রাতে যদি নাই ফেরো, তোমার হঠাৎ-প্রেম-জেগে-ওঠা তালতলার শ্বশুরবাড়িতেই থেকে যাও, পুরন্দরের কিছু এসে যাবে না।

কাঠচাঁপার গাছ! তাই দেখতে গেছেন।

ন্যাকামির পরকাষ্ঠা! আর কিছু নয়, লোকের কাছে স্বাধীনতা দেখানোর একটা ছল! ঠিক আছে।

কিন্তু ঠিক কী থাকল?

পুরন্দরের বৌদি কি তার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলো? তাই যদি পারবে, তবে সেই কখন থেকে কেন সে অমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ননদের শ্বশুরবাড়ির দেশের এ-তল্লাট সে-তল্লাট ছুটে বেড়িয়ে হাঁপিয়ে এসে বসে পড়েছে? এবং ক্রমশ বাড়ির সবাই হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই 'ফুল-পাগল' মহিলাটিকে।

প্রথম নম্বর তো সেই গোপাল ঠাকুরের বাড়ির খুড়শাশুড়িটি আকাশ থেকে পড়লেন 'ওমা! এখনো ফেরেনি? এখান থেকে তো তক্ষুণিই চলে গেল। আমার ঠাকুরঘরে ওই চাঁপার গাদা দেখে আহ্লাদ করেছিল বলে, আমিই বললুম, এ আর ক'টা। আমার সেজভাসুরের বাড়িতে এ-গাছের গাদা। তো রান্নাঘরের

পেছন দরজা দিয়ে পৌঁছে দিয়ে এলাম।...সে তো কোন্‌কালে।'

দ্বিতীয় নম্বর আকাশ থেকে পড়লেন সেই চাঁপাবাড়ির জ্যাঠশাশুড়ি। গালে হাত দিয়ে বললেন, 'ওমা! এখানে এখনো বসে আছেন নাকি তিনি? ফুল দেখতে এলাম বলে, বলল বটে, তো তেমন মন তো দেখলুম না। বললুম, চারটি ফুল পাড়িয়ে তোমার সঙ্গে দিই।...তো বলল, না না, ছিঁড়ে দরকার নেই, গাছের ফুল গাছেই থাক। আমার ঘরের বৌঝিরা তখন তোমার বাড়িতে ভোজ খেয়ে এসে আলিস্যিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তাই অনন্তর মাকে সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলুম, তোমাদের বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আসতে। সে কি আজকের কথা?'

অনন্তর মা জেরার মুখে কবুল করল, ছেড়ে সে দিয়ে এসেছিল বটে, তবে একেবারে ঠিক বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে যায়নি। বারবাড়ির চাতালধারের বেড়ার দরজা পর্যন্ত এসে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, এবার আমি নিজেই চিনে নিয়ে ঢুকে যাচ্ছি। তুমি যাও?'

'ঢুকে যাওয়া পর্যন্ত দেখতে পারলে না? এত কী রাজকার্য তোমার?'

'ওমা! শোনো কথা। বাচ্চা ছেলেপুলে নাকি? একখানা বুদ্ধিমান আস্ত মানুষ। কেমন করে জানব, ওইটুকু থেকে পথ হারাবে।'

তো সেটাই ভাবা হল কিছুক্ষণ। সেখান থেকে পথ হারিয়ে না হোক, আর কারো আগানে-বাগানে কোনো ফুল-টুল দেখে হয়তো ঢুকে পড়ে ভুলভুলাইয়ায় ঘুরে মরছে। এখানে-সেখানে ভাঙাচোরা বাড়ি তো বিস্তর।

নাঃ, তেমন ঘটনার নায়িকা হয়েছে বলে মনে হল না কবি পুরন্দর রায়ের স্ত্রী সুনয়না রায়। ঘুরে মরলে কেউ তো দেখতে পাবে? তারপর আর কেউ তাকে দেখেছে কই?

পুরন্দরের দাদা দীপঙ্কর বলল, 'ছেলেমানুষি মজা করতে—পুরুর আগেই বাড়ি পৌঁছে গিয়ে সারপ্রাইজ দেবার খেয়ালে ট্রেনে চেপে চলে যাননি তো?'

যদিও এটা একটা 'খোঁড়া' চিন্তা, তবু সে সম্ভাবনাও ভেবে দেখা চলে। আস্ত একটা মানুষকে এই ভরদুপুরে বদ্যিবাটি-হেন জায়গায় মুখুয্যেপাড়ার আওতার মধ্যে থেকে তো আর কেউ কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়নি।

'ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে'—একথাটাও একমাত্র অনন্তর মা ছাড়া কেউ উচ্চারণ করবে না!

খুকু বলল, 'এত দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো মজা করতে বসবে? ছোটবৌদিকে তো তেমন মনে হয় না।'

আর খুকুর বড়বৌদি, যে নাকি খানিক আগে একজনকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসেছে, সন্ধেরাতের মধ্যেই তোমার জিনিস তোমার বাড়ি পৌঁছে যাবে—।

সিওর! সে শুকনো মুখে বলে, ‘কী জানি বাবা, ‘তোমার সঙ্গে ফিরছি না বলে বরকে ডোন্ট-কেয়ার করে প্রাণে ভয় ঢোকেনি তো? যা তোমার ছোটভাইটির খামখেয়ালি মেজাজ। ভয়ে-ভয়েই হয়তো রেলগাড়ি চেপে—’

‘একা? এই অজানা জায়গা থেকে?’

‘তা তাতে আবার কী আহামরি আছে? এ যুগের মেয়েরা একা কী-না করছে? পথ থেকে একখানা রিকশাকে ধরে স্টেশনে নিয়ে চল্ বললেই তো নিয়ে যাবে।’

অতঃপর সে খোঁজও করা হল।

কিন্তু তেমন কোনো সদুত্তর মিলল না।

অজস্র রিকশা। কাকে ধরে-ধরে প্রশ্ন করা যাবে?

আর স্টেশনেই-বা কার কাছে কী হদিস মিলবে? কলকাতার দিকে যাবার গাড়ি তো একখানা নয়? পরপর তো ছাড়ছেই। রবিবার বলে সকালের দিকে অফিসগাড়ির সংখ্যা বোধহয় দু'একখানা কম ছিল। তবে সবাই তো আর কেবলমাত্র অফিস যাবার জন্যই ট্রেনে ওঠে না। লোকের কলকাতায় অহরহই কাজ। কাজ পুরো লাইনটাতেই। যে যেখানে ইচ্ছে নেমে পড়ে। আবার উঠেও পড়ে অনেকেই। যেখান থেকে, সেখান থেকে।

আর কাঁধে একখানা শৌখিন ঝোলা ঝুলিয়ে কত-কত স্মার্ট মেয়েই তো চলাফেরা করছে। কে কার দিকে তাকিয়ে চিনে রেখে তার বর্ণনা দেবে?

দীপঙ্করের চিন্তায় শেষমেষ এই সিদ্ধান্তে আসা হল, ‘বীরেশ, তুমি বরং আর-একটু দ্যাখো এদিক-ওদিক। আমরা রওনা দিচ্ছি। আন্দাজমতো সময়ে তোমার এখানের কারো বাড়ি থেকে আমার ওখানে একটা ফোন করবার চেষ্টা কোরো। আমি দেখি গিয়ে কী রেজাল্ট সাপ্লাই করতে পারি তোমায়। আমার তো খুবই মনে হচ্ছে, হঠাৎ কোনো খেয়ালে বাড়িই চলে গেছেন।’

‘জিনিস পত্তর তো সব পড়ে রয়েছে।’

‘জিনিস পত্তর আর কী? বোধহয় কিছু বাড়তি শাড়ি-জামা আর পাউডার-ফাউডার। মেয়েদের যা লাগে। ব্যাগটা তো খুকু বলছে সঙ্গেই ছিল।’

‘তাই তো দেখেছিলাম।’

‘তবে আর কী। তার মধ্যে তো টাকা-পয়সা।’

‘কিন্তু এমন অদ্ভুত একখানা কাজ করবার কারণটা কি?’

‘কী জানি। কত্তা-গিন্নীর ভেতরের কোনো রেষারেষির ফল কিনা। সেকালে কত্তা-গিন্নীর ঝগড়া-কোঁদল বোঝা যেত। একালে সবই অন্তঃসলিলা!’

যে যার মনের মতো মন্তব্য করে চলে অবিরতই।

শুধু পুরন্দরের বৌদি বলে, 'আমার যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে গো! আমি মরতে ছোটসাহেবের কাছে তিনসত্যি করে বসলাম। ছোটগিন্নী যে আমায় এমনভাবে ডোবাবে, তা কে ভেবেছিল।'

না, কেউই ভাবেনি।

স্বয়ং আসামীটিও ক্ষণমুহূর্ত আগে ভাবেনি, সে কী করতে যাচ্ছে! কাউকে ডোবাতে, না নিজে ডুবতে!

আচ্ছা, সুনয়নার কেন ভয় করেনি?

কী জানি। বোধহয় যে ডুবতে যায়, তার কাছে 'ভয়' শব্দটা অবান্তর। ভয়, লজ্জা, পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার চিন্তা— কোনোকিছুই তখন আর স্পর্শ করেনা তাকে। সুনয়নাকেও করেনি।

সুনয়নার মনের মধ্যে শুধু যেন একটা ভাঙা গ্রামাফোন রেকর্ড বেজে চলেছিল, ভেবেছিলাম এখনো ক'টা দিন সময় পাচ্ছি! ভেবেছিলাম এখানো ক'টা দিন—।

পুরন্দরের পত্রিকা অফিস যে তাদের উপন্যাসের নাম পরিবর্তন করতে এমন একখানা নাম নির্বাচন করে বসবে কে জানত?

এখন আমি কী করব?

এই বদ্যিবাটি থেকে প্রকাশিত ওই 'সাপ্তাহিক সাহিত্য সংবাদ' কি শুধু এর গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? তাই কখনো থাকে? 'সংবাদ' শব্দটার তাহলে অর্থ কী?

মরতে আমাকে হবেই। তাছাড়া গতি নেই।

শুধু মরার আগে একবার—

নিতান্ত একটা আচ্ছন্ন অবস্থাতেও সুনয়না রায় নামের মেয়েটা ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছে গেল। খেয়াল করল না তার জন্য কোথায় কী তোলপাড় করা হচ্ছে বা হতে পারে।

না, পিছনের দিকটায় আর তাকায়নি সুনয়না। শুধু পথের দিকে দৃষ্টি রেখে চলে এসেছে। মরবার আগে একবার—

কিন্তু কী আশ্চর্য! দশ-দশটা বছরেও তো খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি জায়গাটায়। যদিও কোথাও ঘটে থাকে তো সে এই পাড়ায় নয়। স্টেশন থেকে এই ভাঙাচোরা বাড়িটাতে এসে পৌঁছানের পথে নয়।

এ-বাড়িতে দরজায় কড়া নাড়তে হয় না। কাউকে দরজা খুলতে আসতেও হয় না। মানুষের পক্ষে অবারিত এই বাড়িটায় শুধু রাত্রেই বাইরের একটা দরজা বন্ধ করা হয়। ভিতরের উঠোনের ধারে গরু-ছাগল প্রবেশ নিষেধ করতে

যে একটা বেড়ার দরজা আছে, সেটা মানুষের পক্ষে অবাধ। আশ্চর্য! আশ্চর্য! সেই এক দৃশ্য। সেই একই পদ্ধতি। এই দশ-দশটা বছর রয়েই গেছে।

ওই বেড়ার দরজার বাঁধনটা আলগা করে ঠেলে খোলবার একটা বিশেষ পরিচিত শব্দ আছে। যেটা বাড়ির লোককে জানান দেয়, বাইরের কেউ এল।

আর যে-লোকটার দৃষ্টির জগৎ প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে, তার কাছে শব্দের জগৎটা বুঝি বেশি করে ধরা দেয়।

পুরন্দরের বৌদি কলকাতায় ফিরে স্টেশনে নেমে বলল, 'আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছি—তুমি ট্যাক্সি করে সোজা চলে যাও ছোটসাহেবের বাড়ি।'

দীপঙ্কর ছেলেমেয়ের কান বাঁচিয়ে বলল, 'ওঃ, কী পতিব্রতা সতী। হাঁড়িকাঠে গলা দেবার জন্য পতিদেবতাটিকে বধ্যভূমির দিকে আগে এগিয়ে দেওয়া!'

বৌ বলল, 'কেন? তুমি তো সিওর, নিশ্চয়ই তোমার ছোট বৌমা বাড়ি ফিরে গিয়ে বসে আছেন।'

'স্বাভাবিক অনুমানে বলছি। তবে যদি অনুমান ঠিক না হয়? তাহলে? স্বামীকে বাঘের গুহার মধ্যে চালান করে দিতে চাইছ? তাছাড়া আমি তো গুছিয়ে কোনো কথাই বলতে পারব না। তুমি গেলে বরং ভেতরের কথা আদায় করতে পারবে—যাবার আগে কোনো ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল কিনা বা বাড়ি থেকেই কিছু স্থির করে কোনো চিঠিপত্র লিখে রেখে গেছেন কিনা!—হয়তো বাপের বাড়ির দিকের কোনো আত্মীয়ের বাড়ি ওই দিকেই—'

বৌ বলল, 'আমাকে কাটলেও এখন ছোটবাবুর সামনে যেতে পারব না। ওরে বাবারে! আমি কিনা যাবার সময়ই আবার গ্যারান্টি দিয়ে বললাম—নাঃ, অসম্ভব। তুমিই যাও। তোমার অনুমান সত্যি হলে তারপর না-হয় কাল একবার দেখা করে দুজনকেই আচ্ছা করে থুড়ে আসব।

কিন্তু দীপঙ্করের অনুমান তো আর সত্যি হয়নি। কাজেই, তার বৌয়ের ওই সাধু সংকল্পটি কোনো কাজে লাগেনি।

পুরন্দর একা দাদাকে আসতে দেখেই চমকে বলে উঠল, 'কী ব্যাপার? তুমি? একা?'

'আমি মানে ইয়ে একটা খবরের জন্যে—'

পুরন্দর তিক্ত ব্যঙ্গের গলায় বলে উঠল, 'কী? তিনি তাঁর সাবেকি শ্বশুরবাড়িতেই রয়ে গেলেন আজকের মতো?'

'না না, তা নয়। এই তো তোর বৌদি ছেলেমেয়েদুটোকে নিয়ে বাড়ি চলে গেল, আর আমি স্টেশন থেকে সোজা তোর কাছে—'

'ও! তাহলে ননদের বাড়িতেই রয়ে গেছেন? কী যেন সেই কাঠফুল না কি তার জন্যে! তা সেই খবরটি দেবার জন্যে তুমি—'

দীপঙ্কর ব্যাকুলভাবে বলে ওঠে, 'আরে না না। শোন, মানে আমি জানতে এসেছিলাম, ছোটবৌমা এখানে চলে এসেছেন কিনা!'

নিজের সম্পর্কে ধারণা ঠিকই ছিল দীপঙ্করের। গুছিয়ে কথা বলার ক্ষমতা বিশেষ নেই তার। তাই ওইভাবেই বলে ফেলে।

পুরন্দর দপ করে জ্বলে ওঠে, 'মানে? এখানে চলে এসেছে কিনা মানে?'

দীপঙ্কর বসে পড়ে গভীর গলায় বলে, 'মানে, খুকুর বাড়ি থেকে আসবার সময় সারা পাড়া তন্নতন্ন করে খুঁজেও তো বৌমাকে পাওয়া গেল না। তাই ভাবলাম—'

'তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না!'

পুরন্দর ভীষণ ভয়ঙ্কর গলায় বলে ওঠে, 'কী? তাই কী ভাবলে? অ্যাঁ ইয়ার্কি না কি? মামদোবাজি।'

কবিজনোচিত কোনো ভাষা মুখ দিয়ে বেরোয় না পুরন্দরের। বাঘের মতো গর্জন করে বলে ওঠে, ছেলেখেলা নাকি! পাওয়া গেল না? বীরেশের নামে পুলিশ কেস করব আমি।'

দীপঙ্কর হতাশভাবে বলে, 'আহা, সে বেচারির আর কী দোষ? তিনি নিজেই স্বেচ্ছায় কোথাও—মানে তোর বৌদি তো এমনি বলছিল, দ্যাখোগে বোধহয় তুই চলে আসায় হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়ে ট্রেনে চলে এসেছে। যাতে তুই এসেই দেখতে পাস।'

'ওসব ফালতু কথা বাদ দাও, দাদা। আমি জানতে চাই কোথায় সে? একা-একা হঠাৎ কোথায় যাবে?'

দীপঙ্কর মলিনভাবে বলে, 'আমারও সেই প্রশ্ন।'

'ওখানে থানায় জানানো হয়েছে?'

'না না, হঠাৎ থানা-পুলিশে জানাজানি করা হবে? বললাম তো, ভাবা হচ্ছিল হঠাৎ কোনো খেয়ালে বাড়ি চলে এসেছেন।'

'আর তাই ভেবে তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে—ওঃ, অসহ্য! তো সেই মহিলাটি এলেন না যে? যিনি গ্যারান্টি দিলেন তখন? ষড়্‌যন্ত্র। এসব নিশ্চয়ই কোনো ষড়্‌যন্ত্র!'

দাঁড়িয়ে উঠে পায়চারি করতে থাকে পুরন্দর। তারপর হঠাৎ কী ভেবে ডাক দেয়, 'জ্যোৎস্না। এই জ্যোৎস্না।'

জ্যোৎস্না অবশ্যই এতক্ষণ অন্তরাল থেকে শুনছিল সবই এবং 'বৌদি ফেরে

নাই, হারিয়ে গেছে' শুনে তার হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। এখন ডাক শুনে ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়াল।

'এই তোর বৌদি তোকে কিছু বলে গেছে?'

'কী বলে যাবে?'

'এই, আজ আর ফিরবে না, বা কিছু।'

'আমাকে আবার কী বলবে? তো বৌদিদি আসে নাই?'

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি বলে, 'সে তো দেখতেই পাচ্ছো। ওখানে বৌমার কোনো চেনাজানা আত্মীয়ের বাড়িটাড়ি নেই তো, পুরু?'

পুরু কণ্ঠে বিষ ঢেলে বলে, 'ওর তিনকুলে কে আছে না আছে তোমরা ভালই জানো। আশ্চর্য! আমি ভেবে পাচ্ছি না, তুমি এভাবে একা এসে দাঁড়ালে কী করে?'

'আহা, আমার কথা বুঝতে চাইছিস না কেন? আমরা ভেবেছি, তিনি কোনো খেয়ালে হঠাৎ চলে এসেছেন। হারিয়ে যাবেন, এ ভাবনা তো একটা অ্যাবসার্ড ব্যাপার।'

'আঃ। বারবার এক কথা অ্যাবসার্ড। আমি বীরেশকে কোর্টে দাঁড় করাবো!'

'কী মুশকিল। বীরেশ বেচারা কী করল?'

'ওঃ বেচারা। সবাই বেচারা। ঠিক আছে। রাত হয়ে গেছে তুমি এখন যেতে পারো।'

'আর তুই?'

'আমি? আমি কী করব? তোমার সঙ্গে যাব?'

'না না। তা বলছি না, মানে—'

'দাদা! তুমি আর আমায় মানে বোঝাতে এসো না। কেন? কেন? কোন্ সাহসে বীরেশ তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে আমার স্ত্রীকে অন্য পাঁচটা যার-তার বাড়িতে যেতে দেয়? অ্যাঁ, কোন্ অধিকারে?'

'পুরু, যেতে দেওয়া আবার কী? বৌমা তো ছেলেমানুষ নন। তিনি ইচ্ছা করেই তো—'

'ব্যাস, ব্যাস। ঠিক আছে। বলছি তো, রাত হয়ে গেছে, তুমি বাড়ি যেতে পারো।'

আহত অপমানিত দীপঙ্কর ভাইয়ের মানসিক অবস্থা বুঝে মনে-মনে না বলে পারে না, পয়সা হয়ে ধরাকে সরা দেখছ তুমি। তাই যে-লোক তোমার বাড়িতে কখনো পা ধুতেও আসে না, সে আজ একটাবার এসে পড়েছে বলে তুমি তাকে যত ইচ্ছে অপমান করছ। 'চলে যাও' বলছ। ঠিক আছে। তোমাদের

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী ঘটনা ঘটেছে, প্রকাশ হবেই একদিন।—

মুখে শান্তভাবে বলে, 'আমি তোর বাড়িতে থাকতে আসিনি, পুরু। তবে মনে জেনে রাখিস, যদি একটা অ্যাডাল্ট লোক হারিয়ে যাবে মনস্থ করে, যে সুযোগ খোঁজে!'

বেবিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ জ্যোৎস্না বলে ওঠে, 'ও দাদাবাবু, আমাকেও তাহলে ছেড়ে দ্যান। আমি পাশের 'ফেলাটে' গিয়ে শুইগে। বৌদি আসেনি দেখে আমার হাত-পা কাঁপছে। ভয় লাগছে।'

দীপঙ্কর কড়া গলায় বলে, 'এত ভয়টা লাগছে কিসে?'

'ও বাবা! আপনি যা ক্ষেপে গেছেন, বুঝতেই পারছি, ওই আপনার দাদা চলে গেলেই এক্ষুণি বোতল-গেলাস নিয়ে বসবে। যত ইচ্ছে খাবে। মাতালে আমাব বড ভয় বাপু। আমি চললুম।'

বলেই দীপঙ্করের পাশ কাটিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যায়। যেন আটকা পড়ে যাবার আতঙ্কে।

দীপঙ্করও অস্ফুটে একবাব কী যেন বলে, 'ছোটভাইয়ের দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে বেবিয়ে যায় দরজাটা ঠেলে দিয়ে।'

'নাঃ। আর কোনো কুয়াশা রইল না। রইল না কোনো অন্ধকাব। বোঝা গেছে। স্বেচ্ছায নিরুদ্দেশ। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো! ছোটভাইয়ের দিকে আর তাকাতে ইচ্ছে করল না দীপঙ্করের। বেবিয়ে গেল।

কতকগুলো দিন আগে সুনয়না তার ফ্ল্যাটেব দরজাটা খুলেই ছবিকে দেখে অবাক আর আবেগের গলায় বলে উঠেছিল, 'তুই!'

আজ ছবিও দাদার ঘর থেকে বেবিয়ে এসে রোয়াকে পা দিয়েই তেমনি অবাক আর আবেগ-আনন্দের গলায় বলে উঠল, 'তুই!'

তারপরই ভাঙা সিঁড়ি দিয়েই লাফিয়ে রোয়াক থেকে উঠোনে নেমে পড়ে সুনয়নার কাঁধটা চেপে ধরে বলে ওঠে, 'অচেনা কুটুমের মতন উঠোনে দাঁড়িয়ে আছিস যে মুখপুড়ি? মা। দ্যাখো কে এসেছে।'

বলে 'যে' এসেছে, তাকে প্রায় হিঁচড়ে টেনে রোয়াকে তোলে।

বহুকালই মেয়ের এমন উচ্ছসিত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়নি। মা রান্নাঘরের দিক থেকে কি যেন একটা হাতে নিয়েই বেরিয়ে এসে একনজর দেখে নিয়ে উথলে বলে ওঠেন, 'ওমা নয়না! আমার কী ভাগ্যি। কার মুখ দেখে উঠেছিলুম আজ?

অ টুটু। জেগে আছিস? দেখ, কে এসেছে। চোখকে যে বিশ্বাস করতে পারছি না রে।

এখন টুটু যেভাবে পড়ে থাকে, তাতে দেখে সর্বদাই মনে হয়, বোধহয় ঘুমোচ্ছে। আর অবাঞ্ছিত জনেরা যখন সৌজন্য-সাক্ষাৎ করতে আসে, তখন টুটু ইচ্ছে করেই ঘুমের ভান করে।

সুনয়না যেন হঠাৎ সব ঝাপসা দেখছে। সুনয়না কি সত্যিই এখানে এসে পৌঁছেছে? না, খুব দুর্লভ একটা স্বপ্ন দেখছে?

কিন্তু তার সোনাকাকিমা কি তাকে স্বপ্নের ঘোরে থাকতে দেবেন? তিনি এই আচমকা আবির্ভাবে, কী করবেন যেন ভেবে পাচ্ছেন না। প্রথমেই তো প্রণামোদ্যতকে দু'হাতে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে বলেন, 'সোনাকাকিকে এখনো মনে আছে, আমার সোনামণি?'—তারপরই একঝাঁক প্রশ্ন, 'হঠাৎ এমন ঘটনা? কার সঙ্গে এসেছিস? একা? ও—মা, আমি কোথায় যাব? হঠাৎ খুব ইচ্ছে করল? ওরে ছবি, দ্যাখ। আমরা তো মেয়েটার খোঁজও করি না; ও নিজে থেকে—একা এসে, বাড়ি চিনতে পারলি? হ্যাঁরে, খবর তো কিছুই জানি না, ছেলেমেয়ে সঙ্গে আসেনি?

করে যান আরো অনেক প্রশ্ন। কোন্‌টা আগে করবেন, কোন্‌টা পরে করবেন যেন ভেবেই পাচ্ছেন না। আবার হঠাৎ বলে ওঠেন, 'ছবি, তুই যে এমন চুপচাপ? কতকাল পরে দেখলি—'

সোনাকাকির এই উচ্ছ্বাসের মধ্যেও সুনয়না ছবির মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। হ্যাঁ, ছবি চুপচাপই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার মুখে কি মেঘের ছায়া?...কই, তা তো মনে হচ্ছে না। ছবি শুধু উজ্জ্বল হাসি-হাসি মুখে মায়ের কাণ্ডকারখানা দেখে যাচ্ছে।

এখন বলল, 'তোমার বাক্যজাল ভেদ করে ঢোকার অবসর পাচ্ছি কই? যা করছো তুমি!'

'করবো না? কী বলছিস রে তুই ছবি? নয়না এসে আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—স্বপ্নের নয়, কল্পনার নয়, সত্যিকারের নয়না, বিশ্বাস হয়?'

সুনয়না এখন সোনাকাকির বাহুপাশ থেকে একটু আলগা হয়ে আস্তে বলে, 'আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু তুমি আমায় দেখামাত্রই চিনতে পারলে কী করে গো, সোনাকাকি?'

'চিনতে পারবো না? তোকে চিনতে পারব না? নয়না রে। তোর সোনাকাকির চোখে এখনো ছানি পড়েনি।—তোকে চিনতে পারবো না?'

আবেগের বশে একই কথা বারবার বলেন।

সুনয়না একটু হেসে বলে, 'বাঃ, আমি তো আর আগের মতন নেই। ছিলাম টিংটিঙে, এখন মোটকা হাতি।'

'হাতি! হাতির মতন মোটা হয়েছিস তুই? কী যে বলিস। হ্যাঁরে ছবি, তুইও তো এই এতকাল দেখিসনি, দেখে চিনতে পারিসনি? দেখে মনে হয়েছে মোটা হাতি হয়ে গেছে?'

'এতকাল দেখিসনি।'

দুই বান্ধবীর চোখে-চোখে একটু ইশারা হয়। অর্থাৎ, সাবধান। যেন ফাঁস হয়ে না যায়।

কিন্তু ছবির কালো মুখটা ভরে যে পূর্ণিমার আলো। তার মানে ছবি এখনো সেই 'বর্তমান সাহিত্য সংবাদটি' দেখেনি। ছবি এখনো তার এক বিশ্বস্তচিত্ত বন্ধুর জন্যে মনের মধ্যে অগাধ ভালোবাসা বহন করছে। কিন্তু সুনয়নাকে এখন একটা কঠিন অস্ত্রোপচার করতে হবে, যাতে ছবির হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে উঠে আসে তার বাল্যবান্ধবীর হাতে।

কিন্তু সুনয়না এখনো ছুরি বসায়নি। বসাবার জন্যে তো একটু অবকাশ দরকার। একটু নিভৃতি।

আচ্ছা, সুনয়না যদি এসে দেখত, ওই ছুরি বসানোর কাজটা আগে ঘটে গেছে! তা'হলে ছবির মুখটা কীরকম দেখতে হত? অবশ্য এ-কথা বলে উঠতে পারত না—ছবি, হঠাৎ এখানে এসে হাজির হলি যে বেহায়া, বিশ্বাসঘাতক। মুখ দেখাতে লজ্জা করল না তোর?

না, তাতে তো তার মা'র সামনে, দাদার সামনে নিজেকেই উদ্‌ঘাটিত হয়ে যেতে হত। কাজেই বলত না। শুধু নয়নার দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে ভাবতে থাকত, 'বিশ্বাসঘাতকরাই বোধহয় এমন বেহায়া হয়।'

আপাতত ভগবানকে ধন্যবাদ যে সুনয়নার আগেই কোনো ঘটনাসাপেক্ষে সেই ছুরি বসানোর কাজটা হয়ে যায়নি।

ছবির মুখে পূর্ণিমার আলো।

সেই আলো নিয়ে ছবি বলছে, 'তোমার ঢেউ থেকে ছাড়ান পেলে তো কথা কইব। বলে উঠেছে—তা যদি বললে মা, 'হাতি'টা বাড়াবাড়ি হলেও—তোমার সুনয়না বেশ একখানি শাঁসেজলে হয়ে উঠেছেন।

'দুর্গা দুর্গা! এই ভরসন্ধের মুখে তুই আমার মেয়েটাকে খুঁড়ছিস?'

আহা-হা! এমন কী বলেছি, বাবা! শনি নয়, মঙ্গল নয়, নেহাতই নির্দোষ রবিবার। নজর লাগবে না। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ চালাবে মা? এসো, দাদার ঘরে চলে যাই। বেচারি হয়তো বুঝতেই পারছে না কে এসেছে—

হঠাৎ দাওয়ার ধারের ঘরের দরজাটার কাছ থেকে একটি স্নিগ্ধকোমল মৃদু স্বর বেজে ওঠে, 'কে এসেছে, তা মায়ের উচ্ছাস-উল্লাসেই বুঝে গেছি রে!'

'ওমা! দাদা! তুই ওঠে এসেছিস? একা পারলি?'

'না এসে পারলাম না যে রে!'

'চল চল। ওখানেই সবাই—'

কোথায় যেন একটা শাঁখ বেজে উঠল। উচ্ছাসে উদ্বেলিত মহিলা এখন একটু সমে এসে বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোরা ওখানে গিয়ে বোস। আমি সন্ধেটা দিয়ে আলো জ্বেলে আনছি। রাতটা থাকছিস তো মা? পরে গল্প হবে। ওঃ, কত কথা জমে আছে রে। তোর বাবা তোর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানাটা পর্যন্ত যখন আমায় দিল না, তখন দুঃখে অভিমানে—'

'আঃ—মা। এই কথাগুলো কি এখন বলার?'

কিন্তু সমুদ্রে বালির বাঁধ!

'তুই বলছিস কি, টুটু? এই দশ-দশটা বছর আমি নয়নার কোনো খোঁজখবর রাখতে পারিনি। সে দুঃখু কি ম'লেও যাবার? তার কারণটা বলব না?—মরে গেছেন স্বর্গে গেছেন, তবু না বলে পারছি না রে টুটু, সেই মানুষ নিশ্চয়ই মেয়েকেও দিব্যি দিয়ে রেখেছিল, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবি না। নচেৎ নয়না এতদিন—'

নয়না মরমে মরে যায়।

না, তার বাবা ভেতরে-ভেতরে এদের ওপর যতই খাপ্পা থাকুক (অহেতুকই সেই খাপ্পাটা, অন্তত নয়নার বরাবর তা-ই মনে হয়েছে) মেয়েকে তেমন কোনো নিষেধবাণী দিয়ে যাননি।

নয়না পারেনি।

নয়নার কোথায় যেন বেধেছে।

কাদের কাছে যেতে চাও? কে তারা? পাড়ার একজন? কাকী বলো?—অমন তো কতই থাকে। সেখানে আবার কি যাবে?

না, কেউই বলেনি এ-সব। সুনয়নাই নিজের মনে এইসব প্রশ্ন তুলেছে আর উত্তর জুগিয়েছে।

কেন? কে বলবে কেন? অথচ অবিরত মনে মনে এই জানিয়ে এসেছে।

কিন্তু সুনয়না তো চিঠিও দিতে পারত?

তাই-বা দিয়েছিল কই?

আসলে সুনয়না তখন তার বাবার ওপর অভিমানে আর আক্রোশে অমন একটা অদ্ভুত মনোভাবের শিকার হয়েছিল। ঠিক আছে, সুনয়নার একমাত্র প্রাণের

ভালোবাসার জায়গাটিতেই যদি তোমার এত বিদ্বেষ বিরাগ, তা'হলে সে জায়গাটা সুনয়না পাথর-চাপা দিয়েই রাখবে।

হ্যাঁ, এইরকম একটা বোকাটে অভিমানই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সুনয়নাকে। প্রায় সেই চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতোই।

কিন্তু তারপর? বাবা মারা যাবার পর? তখন আবার অন্য একটা মনোভাব কাজ করছে। বাবা যেটা পছন্দ করত না, সেটা এক্ষুণি করতে বসব, বাবা মারা গেছে বলে? কোথায় যেন বেধেছে। বিবেকে? না সেন্টিমেন্টে?

তারপর? তারপর আর কি? আস্তে আস্তে বিস্মৃতির ধুলোর স্তর পুরু হতে-হতে কখন কোন্ ফাঁকে ঢেকে দিয়েছিল শৈশব-বাল্যের সেই জীবনকে।

হঠাৎ এতদিন পরে সেদিন ছবি গিয়ে পড়ে যেন 'বালুকা খুঁড়ে বেদনা' উপহার দিতে গেল সুনয়নাকে। সুনয়নার সাজানো জীবনের ছক উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। সুনয়না এক অদ্ভুত অবস্থায় পড়ে গেল।

আর আজ এখন?

সুনয়না যা করে বসেছে, তা কি ঘণ্টা কয়েক আগেও ভাবতে পারত? ছবি কি তা'হলে সুনয়নার জীবনে শনি হয়ে দেখা দিয়েছে?

সুনয়না তাই ছবির কাছে মুখ দেখাবার ভয়ে ভেবে চলেছে, মৃত্যু ছাড়া আর পথ নেই আমার। বিশ্বাসঘাতকের দণ্ডই তো মৃত্যু। তা ছবি তো সুনয়নাকে তা-ই ভাবতে থাকবে এখন। পরম বিশ্বাসঘাতক। ভাববে, যড়যন্ত্রকারী। ভাববে, নিজের সুনামটি বাঁচাতে এখন একটা গল্প বানিয়ে এনে শোনাতে বসেছে ছবিকে।

এখন সুনয়না এসে দেখছে, ছবি এখনো বিশ্বাসের জগতে রয়েছে। ছবি হয়তো বা ভাবছে—সুনয়না সেই বইটাই নিয়ে এসেছে। বলেছিল না সুনয়না, বইটা বেরোলে আমি নিজে নিয়ে যাবো।

তা সত্যি বলতে, ছবি মনে-মনে তা-ই ভেবে চলেছে। তাছাড়া এমন হঠাৎ এসে দাঁড়াবার কারণটা কী হতে পারে? সময় বুঝে ধীরেসুস্থে বার করবে। ছবি বারবার সুনয়নার কাঁধের ঝোলাটার দিকে তাকিয়ে দেখছিল, ওর মধ্যে ভরেই নিয়ে এসেছে বোধহয়। এত তাড়াতাড়ি ছাপা হয়ে গেল? ভগবানের কী দয়া!

অথচ সুনয়না এখন সংকল্পমন্ত্র পাঠ করছে, 'মরা ছাড়া গতি নেই আমার। টুটুদা জেনে ফেলার পর আর আমার বেঁচে থাকার মানে হয় না।'

তা এ-সব কথা তো দুটো মেয়ের মধ্যেটা তোলপাড় করছে। এদিকে এই 'সোনাকাকি'। তাঁর মধ্যে যে সমুদ্রের উথালপাতল। চলে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে কথার রেলগাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন।

'হ্যাঁরে নয়না, কই বললি না কী ছেলেমেয়ে? ওমা, অমনভাবে হাত নাড়লি যে?......'

'...হয়নি? সে কী? এতকাল বিয়ে হয়েছে—শাশুড়ি আছে না? বিয়ের পর তোর বাবা ওইটুকু বলেছিল—শ্বশুর নেই, শাশুড়ি আছে। দুই ভাই, এইটিই ছোটো। তো শাশুড়ি—'

'মা, নয়না যখন এ-সময় এসেছে, রাতারাতি তো পালাবে না, পরে কথা হবে। ও এখন—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—তাই ভালো। নয়না মুখহাত ধুয়ে নে। ছবি, দেখ, সন্ধেটা দিয়েই আমি তোদের চা আনছি। চায়ের সঙ্গে বকফুল-ভাজা খাবি তো? আগে তো খুব ভালোবাসতিস।'

'সোনাকাকিমা। আজ দুপুরে একটা মুখেভাতের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে এখানে এসেছি—ওসব বকফুল আজ থাক।'

'দুপুরে একটা বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে—'

হঠাৎ যেন সকলের সব রোমাঞ্চ মিইয়ে গেল।

'ও, তাই।'

'এখানে এসেছিল, তাই। মানে পাওয়া গেল। তা-ই এমন সাজাগোজা।'

ছবি যা ভাবছিল তা'হলে তা নয়।

সোনাকাকিমা আবারও থমকালেন, 'এখানে? কাদের বাড়ি রে?'

'ঠিক এখানে নয়। অন্যখানে।'

'আচ্ছা, পরে সব শুনবো।'

চলে গেলেন উনি।

আর সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত পরিবেশটা স্তব্ধ হয়ে গেল।

তারপর ছবি বলল, 'দাদা ঘরে এসো। নয়না আয়।'

সাবধানে দাদাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়ে ছবি বলল, 'তুই বোস নয়না, আমি একটা হ্যারিকেন জ্বেলে নিয়ে আসি!'

সুনয়না ভাবল, হ্যারিকেন কেন? আলো কোথায় গেল? আলো তো ছিল। কম পাওয়ারের সেই বাল্বগুলোর মিটমিটে চেহারাটা মনে পড়ল। তাই বলল, 'হ্যারিকেন কেন রে? লোডশেডিং নাকি?'

অন্ধকারের মধ্যে টুটুর সেই মৃদু কোমল আর গম্ভীর গলার স্বরটা শোনা গেল, 'এ বাড়িতে এখন সব দিন সব সময় লোডশেডিং, নয়না।'

আবার স্তব্ধতা।

শুধু আলো নিয়ে আসতে ছবি এত দেরি করছে কেন?

অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকাও তো ভীষণ অস্বস্তিকর।

'টুটুদা! কী চেহারা হয়েছে তোমার।'

একটু হাসির মতো শব্দ, অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিস? এখনো 'চোখে মানিক জ্বলে?'

এটা সুনয়নার অতি-শৈশবের একটি কথা। তবে বাড়িতে বেশ চালু ছিল।

জেঠু বললেন, 'এই নয়না, রাত্তিরে উঠোনে নামছিস যে?'

'ওই—ওইখানে তখন আমার চুলের ক্লিপ পড়ে গিয়েছিল।'

'অন্ধকারে দেখতে পাবি?'

'পাবোই তো। অন্ধকারে আমার চোখে মাণিক জ্বলে।'

সেই নিয়ে জেঠুর কী হাসি।

হঠাৎ টুটু নামের লোকটা তার অতিশীর্ণ হাতের ওপর একটা ঘামে-ভেজা মখমল-নরম হাতের স্পর্শ পেল, 'টুটুদা। এখনো সেই কথা মনে আছে তোমার?'

নয়নাও তার নিটোল মসৃণ হাতের ওপর একখানা শীর্ণ হাতের স্পর্শ পেল, 'তোমার সব কথাই মনে আছে নয়না। প্রতিটি দিনের।'

'টুটুদা।...'

'বল।'

'টুটুদা, কাউকে একখানা মস্ত তালুক দানপত্র করে দিয়ে যদি তার দলিলটা তার হাতে তুলে না দিয়ে বাক্সে তুলে রেখে দেওয়া হয়, সে দেওয়ার মূল্য কী?'

'নয়না, ওটা আর কিছু নয়, দাতার সাহসের অভাব। তালুকটাকে সে কোনোদিনই 'মস্ত' বলে ভাবেনি। খুবই অকিঞ্চিৎকর ভেবেছে।'

'বুদ্ধিমান পণ্ডিতজনেরাও তা'হলে কত সময় কত ভুল ভাবনা ভাবে, টুটুদা।'

'নয়না, অযোগ্য অপদার্থ একটা লোকের মধ্যে অনেকরকম ভুলের বাসা থাকে।'

'অযোগ্য! অপদার্থ!'

'সমাজ-সংসার জায়গাটা কী অদ্ভুত টুটুদা। এখানে কোন্ মাপকাঠিতে যে কাকে কীভাবে মাপা হয়! হয়তো তুমি নিজেও সেই মাপকাঠিকে 'আদর্শ' বলে মেনে নিয়ে বসে থেকেছো। তাই তোমাদের নয়নার জীবনটা এমন ভেস্তে গেল।'

'নয়না! এ কী বলছিস তুই? তোর অমন জীবন—'

'বাইরে থেকে ওইরকম মনে হয় বটে, টুটুদা। নয়নার সুখের অবস্থা দেখলে লোকের হিংসে হয়। অথচ—যাকগে ও-সব কথা। তুমি যে কেন এভাবে নিজেকে ধ্বংস করলে—'

'আমি? নিজেকে?

টুটু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। টুটুর আঙুল ক'টার সাঁড়াশির মতো আক্রমণ থেকেই সেটা মালুম হয় সুনয়নার।

'আমি বাঁচতেই চেয়েছিলাম। সবাইকে নিয়ে। আমার পুরো দেশ আর দেশের মানুষদের নিয়ে—অথচ ভুল করে ওরা আমায়—'

থেমে যায়।

একটু হতাশার গলায় বলে, 'নিজের সেই অভিজ্ঞতার কথাটা অনেককে জানিয়ে যাব ভেবে অনেক কষ্ট করে করে—হল না! এখন ভাবছি জানাতে বসলেই কি লোকে শুনতে বসে? কার কী দায়? লোকে একটা সফল জীবনের কথা শুনতে চায়। তার প্রতিটি নিশ্বাসের ওঠাপড়ার কথাও আগ্রহ করে শুনতে বসে। কিন্তু একটা ব্যর্থ জীবনের কথা শুনতে চাইবে কেন? যাকগে—আর ও নিয়ে ভাবি না। চোখদুটোই তো জবাব দিয়ে দিয়েছে।'

হঠাৎ সুনয়না ওর হাতটা আরো চেপে ধরে বলে ওঠে, 'টুটুদা, কোথাও একটা সার্থক হবার পথও তো ছিল। চোখে পড়েনি কেন? কেন বলো? নিজেকে ঠকিয়েছো, আর একজনকে ঠকিয়েছো। তাকে বাঁচতে দাওনি। চিরদিন তুমি তাকে জানতে দাওনি, তাকে বঞ্চিত করে রেখেছো।'

'নয়না। এখনই-বা তোমায় কে জানাতে গেল?'

সুনয়না একটু কেঁপে উঠল। বলে উঠতে পারল না, তোমার লেখার মধ্যে তুমি ধরা পড়েছ টুটুদা, আর নয়নার চোখের সামনে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে তার সারাজীবনের ফাঁকির হিসেবটা।

না, তা বলতে পারে না। শুধু বলে, 'চিরকালই কি আর সবই বলে দিতে হয়। ছেলেমানুষ নয়নাকে ঠকিয়ে মজা পেয়েছিলে, কিন্তু চিরকাল কি কেউ ছেলেমানুষ থাকে টুটুদা? একটা জীবনকেও সুখী সার্থক করে তুলতে পারাও কিছু কম নয়। তুমি শুধু নিঃসঙ্গতার পথটাকেই বেছে নিয়েছিলে।'

টুটু আস্তে নিশ্বাস ফেলে বলে, 'হয়তো ভুলই করেছিলাম। কিন্তু—'

কিন্তুটা আর শোনা হয় না।

ঘরে একটা আলোর রেখা এসে পড়ে। সঙ্গে-সঙ্গে ছবির কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে, 'নয়না বোধহয় ভাবছিলি, ছবি আলো জ্বালতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।....দাদা রে, আর বলিস নে, গিয়ে দেখি মা'র কেরোসিনের স্টক থেকে মা পল্টুর মাকে দাতব্য করে বসে টিন ফাঁকা করে রেখেছে। অতএব আমাকে আবার একটা দাতব্যের ঘর খুঁজতে যেতে হল। সামান্য একটা আলো জ্বালতেও—'

সুনয়না আস্তে বলে, 'আলো জ্বালা জিনিসটা কি সামান্য রে?'

'তা বটে।'

ছবি হাসে।

হ্যারিকেনটা সামনের টুলটার ওপর বসিয়ে দেয।

টুটু তখন আস্তে বলে, 'নয়না কি একটা হালকা নীলরঙের শাড়ি পরেছে ছবি? বর্ডারে জরি?'

'হ্যাঁ তো। দেখতে পাচ্ছো?'

'একটু-একটু। আচ্ছা ছবি, বড়োলোকের বউরা তো অনেক-অনেক গয়না পরে। নযনার হাতে শুধু একটা বালা কেন?'

'ওঃ দাদা। বড়োলোকের বউরা কী-পরে-না-পরে তুই জানিস?'

'পৃথিবীতে তো চরে বেড়াচ্ছি অনেক দিন। কিন্তু ছবি—নয়নার মুখটা ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না রে। ঝাপসা লাগছে।'

ছবি হঠাৎ হ্যারিকেনটা উঁচু করে তুলে ধরে হেসে উঠে বলে, 'এই দ্যাখো। দেখে চিনতে পারবে কি? সেই আমপাতার ছাঁচের মুখটি এখন পানপাতা-হেন হয়ে গেছে। বড়োলোকের গিন্নি হলে যা হয। এরপর পানপাতা থেকে না পানের ডাবর হয়ে ওঠে—'

হিহি করে হাসতে থাকে ছবি।

চেষ্টা করে হাসা।

পরিস্থিতিকে মুঠোয় আনার চেষ্টায় হাসা। দাদার মধ্যে যে তোলপাড় চলছে, তা কী বুঝতে পারছে না ছবি?

রাতে শোবার আগে সুনয়না বেশ সহজ-সরল গলাতেই ডাক দেয়—এই ছবি, আজ রাতের মতো তোর একখানা শাড়ি ধার দে বাবা! আপাতত তো ম্যানেজ করি। ভবিষ্যতে দেখা যাবে।

শুনে ছবির মা থম:ক বলে উঠেছিলেন, 'একেবারে একবস্ত্রে চলে এসেছিস? তা হ্যাঁ রে, এখানে আসছিস, রাতে থাকবি— এ-সব জামাইকে বলে এসেছিস তো?'

'জামাইকে? মানে তোমার সেই অদেখা প্রাণীটিকে? খেপেছো? সেটি যে কী জিনিস জানো তুমি, সোনাকাকি? বলে আসবার সৌজন্য করতে গেলে আসা হত? 'কেন, কী বৃত্তান্ত'র ধাক্কায় আসার বারোটা বেজে যেত। এ তো আমি যজ্ঞিবাড়ির ভিড়ভাট্টার মাঝখান থেকে অলক্ষ্যে কেটে পড়ে চলে এসেছি।

সোনাকাকি ওর মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করেন। মাটিতে নামানো

হ্যারিকেনের আলোয় মুখ দেখা যায় না। আস্তে বলেন, 'খুব সাহস তো তোর। তো একটা কথা সত্যি বলবি? ঝগড়াঝাঁটি হয়নি তো?'

ছবি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'কি যে বলো, মা। শুনলে তো বরেরই বোনের ছেলের মুখেভাতে এসেছে দুজনে সেজেগুজে। এর মধ্যে আবার ঝগড়াঝাঁটির গন্ধ পাচ্ছো কোথায়?'

মা আস্তে বলেন, 'না পেলেই ভালো। আমরা সেকেলে মানুষ, সবেতেই ভয় পাই। আচ্ছা শুয়ে পড়, রাত ঢের হল।'

'দাদা এখনো জেগে আছে বোধহয়?'

'কি জানি। ওর জাগা, ঘুমোনো বোঝা শক্ত।'

ঘরে এসে ছবি বলে, 'আজ আর দাদা ঘুমিয়েছে।'

আর সুনয়না বলে ওঠে, 'তবু তো আসল কথাটা জানেই না। জানার পর জীবনে আর কোনোরাত্রে ভালো করে ঘুমোতে পারবে কিনা কে জানে।'

বলে সুনয়না অন্ধকারে পরিধেয়টা পরিবর্তন করে নিয়ে ছবির বিছানায় একধারে বসে পড়ে বলে ওঠে, 'মরবার আগে তোদের একবার না দেখে মরতে পারব না বলেই এমনভাবে চলে এসেছি, ছবি।'

ছবি ওর হাতটা চেপে ধরে বলে, 'মববার আগে মানে?'

'মানে মরা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই বলেই বলছি মরবার আগে।'

'রহস্য-রোমাঞ্চ খুলে বসিসনি নয়না। যা বলবার, স্পষ্ট করে বল।'

সুনয়না আস্তে বলে, 'তাহলে আলোটা বাড়িয়ে দে।'

বলে আঁচলের তলায় রাখা সেই 'সাপ্তাহিক সাহিত্য সংবাদে'র কপিটা ছবির সামনে বিছানায় নামিয়ে রাখে। যেখানা নয়না খুকুর সেই খুড়শাশুড়ির বাড়ি থেকে না বলে নিয়ে এসেছে।

ছবি তুলে নিয়ে বলে, 'কী এটা? ওমা এটা তো আমাদের এখানেও স্টলে দেখি।'

'দেখিস? এটা দেখেছিস্? এই-যে এই সাহিত্যের খবর?'

ছবি তাকিয়ে দেখে। আর প্রায় বোকার মতোই বলে ওঠে, 'কী ব্যাপার?'

সুনয়না কেমন একটা নিষ্ঠুর আর কর্কশ গলায় বলে ওঠে, 'কেন? বুঝতে পারছিস না? তোর প্রাণের বন্ধু নয়নার মুখোশ-খুলে-যাওয়া বিশ্বাসঘাতকতার দলিল। তোর সরলতা আর বিশ্বস্ততার সুযোগ নিয়ে সেই বিশ্বাসের ওপর ছুরি মেরে তোর দাদার জিনিসটাকে চুরি করে নিজের বরের নামে ছাপতে দিয়ে—'

হঠাৎ বালিশের ওপর হুমড়ি পড়ে মুখ ঢাকে সুনয়না।

ছবি আর-একবার ভালো করে লেখাটা দেখে।

যাতে বলা হয়েছে, এ-বছরের শারদীয় 'চক্রবাল'-এর প্রধান চমক কবি পুরন্দর রায়ের প্রথম ও বৃহৎ উপন্যাস—উতঙ্ক উপাধ্যায়ের উপাখ্যান।

আস্তে সেটা সরিয়ে রেখে সুনয়নার পিঠে একটা হাত রেখে বলে, 'ব্যাপারটা কিন্তু আমার মাথায় ঢুকছে না নয়না।'

নয়না তেমনিভাবেই বলে, 'কী করে ঢুকবে? এতবড়ো বিশ্বাসঘাতকতার নমুনা কি তোর সুন্দর সরল মাথায় ঢোকবার? তোদের নয়না তার বরের নামডাক বাড়াতে টুটুদার সর্বস্বটুকু চুরি করে—'

'বাজে কথা রাখ নয়না। আসল ঘটনাটা খুলে বল তো শুনি। মনে হচ্ছে কোথায় কি একটা ভুল ঘটেছে।'

'আসল ঘটনাটা খুলে বললে কি তুই বিশ্বাস করবি ছবি? প্রায় অবিশ্বাস্যই যে। হয়তো ভাববি, তোর নয়না এখন একটা বানানো গল্প ফেঁদে—'

'এবার কিন্তু সত্যি রেগে যাব নয়না। ওঠ, ওঠ বলছি।'

উঠেই বসে নয়না।

এবং ধীরে-ধীরে কোনোমতে সেই আসল ঘটনাটা বলে। যেটা নাকি সুনয়নার একটা নিরেট বোকামির ইতিহাস, আর তার বরের 'দশচক্রে ভগবান ভূত' হয়ে পড়ার এক অদ্ভুত ইতিহাস।

সব শোনার পর ছবি নিশ্বাস ফেলে বলে, 'এইজন্যে তোর মরাটা এত জরুরি হচ্ছে?'

'কী বলছিস তুই ছবি? এরপর জীবনে আর টুটুদার কাছে মুখ দেখাতে পারব? পারব না বলেই এমন করে চলে এসেছি ছবি।'

'অনেক দয়া করেছিস। আগেই যে মরে ভূত হোসনি, তার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আসলে তো অপরাধের প্রধান নায়িকা আমিই নয়না। দুঃসাহসে ভর করে ঝোঁকের মাথায় দাদাকে লুকিয়ে ওইসব করতে যাওয়াটাই হয়েছিল আমার মস্ত বোকামি। খেয়াল করে দেখিনি—তোকে এর জন্যে কী পরিস্থিতিতে পড়তে হতে পারে। শুধু দুরন্ত একটা লক্ষ্য ছিল দাদার চোখের আলোটুকু থাকতে-থাকতে দাদার হাতে তুলে দেব দাদার পরম বাসনার ফলটুকু। কেবলই ভেবেছি, যখন বইটা দাদার হাতে ধরে দিয়ে বলব, 'দাদা, দেখো তো, এই বইটার লেখককে চিনতে পারো?' তখন দাদার মুখে কী আলো ফুটে উঠবে। সেটাই ভেবেছি তার বাইরে কী ঘটতে পারে ভাবিনি। যাক! এখন তো আর সে প্রশ্ন নেই! আর তো দেখানো হতোনা।'

চুপ করে গেল ছবি। সুনয়না ঠিক বুঝতে পারেনা।

সুনয়না ব্যাকুলভাবে বলে, 'সেইজন্যেই তো বলছি ছবি, মরা ছাড়া আমার আর কোনো পথ নেই। ...টুটুদা যখন দেখবে—'

'দাদা আর দেখবে না নয়না। দাদার চোখের সামনে থেকে দেখার জগৎ লুপ্ত হয়ে গেছে। দাদা আর—'

'ছবি! কী বলছিস তুই!'

'ঠিকই বলছি রে নয়না।....কিছুদিন আগেও কাগজে খবরের হেডিংগুলো পড়তে পারছিল, আর পারে না! কে আর দাদার কাছে বলতে আসবে, 'তোমার একটা পবম মূল্যবান জিনিস ছিনতাই হয়ে গেছে।' ও ওর নিজের ব্যর্থতার জগতে যেমন ছিল তেমনিই পড়ে থাকবে। তবু তুই আমায় বাঁচিয়েছিস নয়না, লেখাটা 'কপি' করে আসলটা আমায় ফেরত দিয়ে। ....দাদা একদিন বলল, 'সেই বাক্সে কাগজগুলো এতদিনে বোধহয় উইটুইয়ে খেয়ে নিয়েছে, কী বলিস ছবি?' আমি খুব ...রাগ দেখিয়ে ট্রাঙ্কটা বয়ে নিয়ে এসে দাদাকে দেখালাম। বললাম, 'ছবিকে তুমি ভাবো কী।' খুব অপ্রস্তুত হল; আবার খুব হাসল সেদিন।....তারপর আস্তে-আস্তে খাতাগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখে, রেখে দিল! বলল, আমি মরেটরে গেলে এগুলো পুড়িয়ে ফেলিস! জঞ্জাল বৈ তো নয়!...লিখতে-টিখতে জানি না নয়না, তাই বুঝতে পারি না নিজের লেখাগুলো এত আদরের আর ভালোবাসার হয! আর সে লেখা ছাপার অক্ষরে দেখার জন্যে এত আকুলতা থাকে।'

সুনয়না নিশ্বাস ফেলে। বলে, 'হয়তো জীবনটা অমন হয়ে না গেলে এমন হত না। অন্য কাজের মধ্যে ডুবে থেকে ভুলেই যেত! তবু ভাবি কী অদ্ভুত এই জগৎটা, ছবি! কত তুচ্ছর অভাবেই এক-একটা জীবন এমন ব্যর্থতা বয়ে-বয়ে শেষ হয়ে যায়। আর এক-এক জনের জীবনে সার্থকতা আসে যেন দু'হাত উপচে! সেই 'পাওয়া'টা দেখতে দেখতে এক-এক সময় যেন 'অশ্লীল' বলে মনে হয়। কেউ কেউ কিছু পাবে না, আর কোনো-একজন এত পাবে কেন?'

হঠাৎ একটা স্তব্ধতা নেমে আসে।

যেন একই বেদনায় ব্যথিত দুটি নারীহৃদয় এই চিরন্তন প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে থাকে। হয়তো এ প্রশ্ন চিরন্তনই।....

কেউ-কেউ কেন সামন্যতম থেকেও বঞ্চিত থাকবে, আর কেউ কেউ কেন এত বেশি পাবে যে, সেই পাওয়াটাকে দর্শকের কাছে 'অশ্লীল' বলে মনে হবে?

অতিপ্রাচুর্য এক ধরনের অশ্লীল বৈকি! সে প্রাচুর্য মানুষকে তার কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্যুত করে ফেলে, তার ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়।

একসময় স্তব্ধতা ভেঙে ছবি বলে, 'একটা কথা সত্যি করে বলবি নয়না? শুধু আমার কাছে। তুই কি তোর জীবনটা নিয়ে সুখী নয়?'

সুনয়নাও আস্তে বলে, 'কোনোদিন ভেবে দেখিনি।

'ভেবে দেখিসনি?'

'নাঃ। যে-কোনো ছাঁচের একটা জীবন জুটে গেছল, সেই ছাঁচটার মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে-নিতে দিনগুলো কাটিয়ে চলেছি। ভাবাভাবির শৌখিনতা করিনি। তবে দশজনে সুনয়না রায়ের জীবন দেখে ঈর্ষা করে, ভাবে মেয়েটা কী সুখের সাগরে ভাসছে— সেটা দেখতে দেখতে কেমন একটা আচ্ছন্নতা এসে গিয়েছিল! তারপর হঠাৎই ভেঙে গেল সেটা।'

ছবি পরিতাপের গলায় বলে, 'আমিই হয়তো তোর সাজানো ছন্দের জীবনটাকে ভেস্তে দিলাম নয়না। যদি—আমি—'

সুনয়না একটু হাসে, 'ওটা নিমিত্তমাত্র! কোনো-এক সময় কোনো-একটা ধাক্কায় যেতই ভেস্তে!'

'কিন্তু সত্যি বলতে, তোর সংসারের মধ্যে তোকে দেখে আমার তোকে বেশ সুখী-সুখীই মনে হয়েছিল, নয়না!'

'ওই তো, সেই আচ্ছন্নতার মায়া-আবরণ!'

'তাহলে একটা দারুণ কড়া প্রশ্নই করি নয়না, তুই কি তোর বরকে ভালোবাসতে পারিসনি?'

সুনয়না একটু থেমে বলে, 'সেটা বললেও হয়তো ঠিক বলা হবে না, ছবি! মেয়েদের সঙ্গে তার সৃষ্টিকর্তার এ একটা সূক্ষ্ম কৌতুক।... লুঠ করে নিয়ে এসে হারেমে বন্দী-করে-রাখা মেয়েরাও বাঁদিগিরি করতে করতে সেই লুঠেরা বাদশাজাদাটাকে ভালোবেসে ফেলে মরে, এমন দৃষ্টান্তও তো ইতিহাসে অনেক।'

ছবি চুপ করে যায়।

শুধু অন্ধকারে সুনয়নার হাতটা চেপে ধরে থাকে।

হঠাৎ একসময় দরজার বাইরে থেকে একটি স্নেহকোমল স্বর শোনা যায়, 'তোরা কি এখনো জেগে বসে গল্প করছিস ছবি? এবার ঘুমো!'

ছবি বলে ওঠে, 'তুমি তো দেখছি কারুর সঙ্গে গল্প না-করেও এখনো জেগে বসে আছো। ঘুমিয়েছো কই? কাল সকালে কী-কী খাওয়াবে আমাদের তাই ভেবে ঠিক করছো বুঝি, মা?'

মা হেসে ফেলল, 'না রে, আজ যেন কিছুতেই ঘুম আসতে চাইছে না। নয়নাটাকে দেখে পর্যন্ত—না রে বাপু, এবার ঘুমিয়ে পড়। নয়না, আর জাগলে অসুখ করবে রে।'

উনি চলে যান।

আর নয়না হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমাকে এখানে যা-হোক একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারিস ছবি?'

ভোরের আলোর প্রথম ঝলকটা নয়নার সোনাকাকির বাগানের ওপর এসে পড়েছে। সেইখানে নেমে এসেছে নয়না। তুচ্ছ এই লাউমাচা-পুঁইমাচার বাগানে নেমে আসতে এত ভালো লাগছে সুনয়না রায়ের?...কলকাতার সেই এক অভিজাত পল্লীর এক ছবির মতো সাজানো ফ্ল্যাটের বাসিন্দা সুনয়না রায়!

কিন্তু সে কি একাই দাঁড়িয়ে আছে ওই সকালের আলো-এসেপড়া ভাঙা পাঁচিলের ঘেরাটার মধ্যে তুচ্ছ ওই বাগান নামক জায়গাটায়?

'তার সঙ্গে যে দাঁড়িয়ে, সে রোজই আসে।'

প্রথম ভোরের আলো চোখে লাগাবার জন্য! ভোরের সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকলে নাকি হৃত দৃষ্টিশক্তির পুনরুদ্ধার হয়। কে বলেছে এটা?

হয়তো নেহাতই তুচ্ছ কেউ। তবু ডুবন্ত মানুষ তৃণখণ্ডটুকুও হাতের কাছে পেলে আঁকড়ে ধরে।

'আরে, তুইও উঠে পড়েছিস এক্ষুণি? ভালো। ভোরে ওঠা ভালো। সকালের আলোয় তোকে তবু একটু দেখতে পাচ্ছি, নয়না।'

'দেখতে পাচ্ছো? কীরকম দেখছো? খুব বদলে গেছি?'

'বদলে গেছিস কিনা জানি না, তবে আগের থেকে অনেক সুন্দর দেখতে হয়ে গেছিস।'

হঠাৎ কেঁপে ওঠে সুনয়না।

এই সরল স্বীকারোক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সে কি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠবে, 'আগের থেকে? আগে তুমি কখনো আমার দিকে তাকিয়ে দেখেছো?'

'না, এই সকালের স্নিগ্ধ সময়ে তেমন কথা বলা যায় না।'

দাওয়ার ওধারে রান্নাঘরে ঘোরাঘুরি শুরু হয়ে গেছে বাড়ির গৃহিণীর।

ছবি ঘুমোচ্ছে।

অথবা কি ঘুমের ভান করে পড়ে আছে? যখন দেখতে পেয়েছিল, নয়না ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে আপনমনে বলে উঠেছিল, 'ওমা! টুটুদা এত ভোরে উঠে একা বাগানে—' এবং সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুলে নেমে গিয়েছিল, তখন ঘুমোনোটা শ্রেয় মনে করেছিল?

তা বুদ্ধিওলা মানুষরা তো 'শ্রেয়'-টাকেই আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে। তাই সুনয়না বলে উঠেছিল, 'আগের থেকে সুন্দর দেখতে হয়ে গেছি? মুটকি হয়ে?'

টুটু আস্তে বলে, ছিঃ। নিজের সম্পর্কে ওই একটা বিচ্ছিরি বিশেষণ! কবির বৌ হয়েও দেখছি তুই আর মানুষ হলি না। মনে হচ্ছে তোর চেহারায় বেশ-একটা 'রাজেন্দ্রাণী-রাজেন্দ্রাণী' ভাব এসেছে!'

'ইশ, তুমিও যে দেখছি কবি-কবি হয়ে উঠেছ! লিখতে বটে কবিতা, তা সে তো আর কবিকবি ভাষায় নয়। দাঁত ফোটানই যেতো না।'

'হ্যাঁ, এখন এই ভাষাই শ্রেয়।'

রাতের অন্ধকারে মনের যে-কপাটটা খুলে পড়ে, দিনের আলোয় তাকে ছিটকিনি এঁটে বন্ধ করে দিতে হয়। সেটাই বাঁচার পথ!

'না। সত্যিই তোকে দেখে আমার এই তুলনাটাই মনে এল!'

'আচ্ছা টুটুদা, তোমার কি মনে হচ্ছে মাঝখানে দশ-দশটা বছর চলে গেছে?'

'দশ-দশটা?'

টুটু একটু গভীর হেসে বলে, 'আমার তো মনে হয়েছে একশোটা বছর। একশো বছর পরে তোকে দেখলাম।'

'আমার কিন্তু ঠিক উল্টো। মনে হচ্ছে, সেই নয়না, এইখানে ঘুরছে। এক্ষুণি তুমি ধমক দেবে, 'এই নয়না, এই ভোরবেলাই যে বড় চলে এসেছিস। মজুমদার-জেঠু রেগে যাবেন না?'

'আমি তোকে খুব ধমক দিতাম, না?'

'তুমি হয়তো ধমক ভেবে দিতে না। আমার মনে হত! তোমায় খুব রাগী মনে হত।'

টুটু হঠাৎ বলে ওঠে, 'তবু তো ভালোবাসতেও ছাড়তিস না!'

'টুটুদা!'

'বল!'

'তুমি বুঝতে পারতে?'

'কেন? আমাকে কি তোর খুব অবোধ বলে মনে হয়?'

'টুটুদা। তবু তুমি—তবু তুমি—তুমি এত নিষ্ঠুর ছিলে কেন টুটুদা? কেন তুমি আমায়—'

চেষ্টাকৃত 'শ্রেয় পথের' বাঁধটা ভেঙে যাবে নাকি?

না! চিরদিনের নিষ্ঠুর লোকটা সেটা ভাঙতে দেবে না। তাই বাঁধ দেয়। তাই গভীর গলায় বলে, 'হৃদয়বান' হলে তোর কী দশাটা হত তা ভেবে দেখেছিস? দেশসুদ্ধ সবাই 'ছিছি' করত, হয়তো-বা যা-তা অপবাদই দিতে বসত। ওদিকে বাপের তেজ্য কন্যে হয়ে মরতিস। তার বদলে আমি তোকে কতখানি কী দিতে পারতাম বল?...ইশ! ভাগ্যিস তেমন সুমতি হয়েছিল। না-হলে আমার এই

লক্ষ্মীছাড়া জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে বসলে কী গতি হত তোর!'

'দেখো টুটুদা, এখন আমি অ্যাডাল্ট, তা মানো তো? এখন যদি আমি আমার জীবনটাকে নিয়ে নিজের ছাঁচে গড়তে চাই—?'

'পাগলের মতো কথা বলছিস কেন?'

'টুটুদা, ও-সব আদর্শের বুলি ছাড়ো। কেন? জীবনটাকে নতুন ছাঁচে ঢালাই করা যায় না?'

'যায় কিনা' তার উত্তর পাবার আগেই রান্নাঘরের দরজা থেকে নয়নার সোনাকাকির স্বর ভেসে আসে— ওমা! নয়নাও সাতসকালে ওঠে বসে আছিস? কাল তো মাঝরাত্তির পর্যন্ত জেগে ছিলিস! উঠেছিস তো ভালোই হয়েছে। হাতমুখ ধুয়েটুয়ে নে। ভোরেই চানের অভ্যেস আছে নাকি? থাকে তো সেরে নে। কাল তো রাতে কিছুই খাসনি। আজ তোকে আমার গাছের বকফুলের বড়া না-খাইয়ে ছাড়ছি না। আগের মতো দাওয়ায় মাদুর পেতে তিন ভাই-বোনে চা খাবি...'

এ-সময় ছবিও উঠে আসে!

হয়তো মায়ের কণ্ঠস্বরে মনে করে, আর এখন ঘুমের ভান করে পড়ে থাকার মানে হয় না!

নয়না বলে ওঠে, 'শুধু আজ কিগো সোনাকাকি! এখন থেকে তো রোজই তিনজন। ছবির সঙ্গে তো আমার কথাবার্তা হয়ে গেছে; ও আমায় এখানে একটা চাকরি জুটিয়ে দেবে। কাজেই, এখানেই স্থিতি।'

মহিলা শিউরে বলে ওঠেন, 'দুর্গা-দুর্গা। বলাই ষাট! কথার কী ছিরি-ছাঁদ রে তোর? চাকরি করতে যাবি কী দুঃখে?'

'বাঃ, দুঃখে আবার কী? এখন মেয়েরা সবাই স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে দেখো না? পরের ভাতে থাকতে আর রাজি নয় কেউ।'

'যাকগে, সে-সব হচ্ছে উনচুটে মেয়ে! ছবির মতো কপাল কারো যেন না হয়। খবরদার, ও-সব কুচিন্তা মনে আনিস নে।'

সুনয়না হেসে উঠে বলে, 'ও, তোমার বুঝি ভাবনা ধরে গেল, আবার একটা 'অফিসের বাবু'র টাইমের ভাত রাঁধতে হবে বলে। ছবির জন্যে তো রাঁধোই বাপু—'

'থাম তো। ভাত রাঁধার ভয়ে আমি যেন মরে যাচ্ছি। ওঃ, ঠাট্টা হচ্ছে? তবু ভালো। তোদের একালের মেয়েদের বিশ্বাস নেই বাবা! সুখে থাকতে ভূতের কিল খাবার শখও তো দেখি।'

সুখেই যে থাকে তার প্রমাণ কী? সোনাকাকী তোমার মতো এমন 'সুখী'

হবার জোর ক্ষমতা কি সকলের থাকে? হয়তো তাদের মনে হয়, হলই-বা 'সোনা' দিয়ে তৈরী, তবু খাঁচাটা খাঁচাই!

সারারাত অসম্ভব অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছে পুরন্দর, একা বাড়িতে সুনয়নার সমস্ত জিনিসপত্র উলটেপালটে তন্ন তন্ন করে খুঁজে। যদি কোথাও কোনো ক্লু খুঁজে পাওয়া যায় সুনয়নার এই রহস্যজনক অন্তর্ধানের।

নাঃ, কোথাও কিছু না!

ড্রয়ারে গোছা-গোছা খুচরো কাগজপত্র ছড়িয়ে একাকার করে ফেলে। কী সে সব? নানা জিনিসের ক্যাশমেমো, লণ্ড্রির রসিদ। টেলিফোনের আর ইলেকট্রিকের বিলপেমেণ্টের রিসিট, কিছু-কিছু দোকানের ঠিকানা, যা হয়তো পরে কাজে লাগতে পারে ভেবে রেখে দেওয়া। যেমন— একটু বিশেষ ধরনের প্রেসার কুকারের, একটা ওয়াটার ফিল্টারের, এমনি সব। অর্থাৎ একটি সংসারনিষ্ঠ গৃহিণীর পক্ষে যে-ধরনের জিনিসপত্রে আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।

নাঃ, কোথাও কোনো ডায়েরির খাতা নেই, নেই কোনো পুরনো প্রেমিকের চিঠি। একদম রহস্যহীন সাদামাঠা জীবনের ছাপ। ....আলমারি ওয়ার্ডরোব সব তছনছ করেছে পুরন্দর, যেন ভয়ানক একটা অপমানবোধের আক্রোশ। কেন? কেন? কী জন্যে সুনয়না পুরন্দরকে হঠাৎ এভাবে অপদস্থ করে বসল? অপদস্থ ছাড়া আর কী? আর সেটা একগাদা লোককে জানিয়ে।

নাকি বিশ্বাস করতে হবে সুনয়না নামের একটা প্রায় তিরিশ বছরের স্বাস্থ্যবতী মহিলা ভরদুপুরে খুকুর উঠোনের বেড়ার দরজার কাছ থেকে 'কিডন্যাপ' হয়ে গেল?

লুটেরা-চোর ডাকাত-অধ্যুষিত ঘরের মতো ঘরের মাঝখানেই ভোরের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল পুরন্দর, হঠাৎ দরজার বেল বাজতেই চমকে জেগে উঠল। তবে কি এসে গেল? আর সেই ভাবনাটার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের অবস্থার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটা ভয়ের ধাক্কা খেল।

যদি সুনয়না বলে ওঠে, এ সব কী? আর তারপর তার সেই অদ্ভুত নির্লিপ্ত হাসিটি হেসে যদি বলে, 'সন্দেহজনক কিছু পেলে?'

আবার বেল্। আর এ দ্বিতীয়টায় অতি অসহিষ্ণুতার ছাপ!

নাঃ! এ বাজানো সুনয়নার হতে পারে না। তাছাড়া সুনয়না বেল্ই বা বাজাবে কেন? তার হ্যাণ্ডব্যাগে তো সর্বদাই ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। নিজের ফ্ল্যাটে কখনো বেল বাজিয়ে ঢুকতে হয় না তাকে।

বিরক্তচিত্তে এসে দরজাটা খুলতেই জ্যোৎস্নার ব্যাকুল প্রশ্ন ধ্বনিত হল, 'আসে নাই বৌদিদি?'

বৌদি এসে গেলে দরজা খুলতে দাদাবাবু বিছানা ছেড়ে উঠে আসবে না নিশ্চয়ই, এটা তার বুদ্ধিতে খেলেছে।

পুরন্দরের জমে-ওঠা সমস্ত রাগটা ফেটে পড়ল ওই তুচ্ছ মেয়েটার ওপর। কড়া গলায় বলে উঠল, তুমি কী জন্যে? অ্যাঁ? যাও। যেখানে ছিলে, সেখানে চলে যাও। খবরদার আর আসতে চেষ্টা করবে না। বিদেয় হয়ে যাও।

আশ্চর্য, এহেন কঠোরতাতেও দমল না সে। বরং পাছে দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়, তাই সেটাকে চেপে ধরে ভিতরে একখানা পা রেখে অনমনীয় গলায় বলে উঠল, 'তো আমি বিদেয় হয়ে গেলে আপনার খাওয়াদাওয়ার কী হবে শুনি? বৌদিদি তো আসে নাই।'

'সে-কথা তোমায় ভাবতে হবে না। বলছি, বেরিয়ে যাও।'

বৌদিদি না আসা পর্যন্ত আমাকে ভাবতেই হবে। সরেন তো, চায়ের জলটা চাপাইগে আগে।'

বলে চট করে প্রায় পুরন্দরের হাতের তলা দিয়ে গলে ভিতরে ঢুকে আসে অম্লানবদনে। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে চলে যায় কাজের ঘরে, বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে।

পুরন্দর যেন বোকা বনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এবং সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে যায়, হ্যাঁ এই মুহূর্তে তার চা এক কাপ খুব দরকার। আর তারপর? পর্যায়ক্রমে 'দরকার'গুলো চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে।

আজ অবশ্য অফিসে যাবে না, সেটা এক্ষুণিই ঠিক করে ফেলেছে। ভাত না খেলেও চলবে, সেটাও ভেবে ফেলেছে কিন্তু তবু ক্ষণে ক্ষণে চা-টা তো চাই। আর যদি বাইরের কেউ এসে পড়ে? তার কাছেও তো এক্ষুণি ব্যক্ত করা যাবে না, আজ আমি একা। আমার বাড়িতে এমন কেউ নেই যে তোমায় এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারে। আমার বৌ নিখোঁজ হয়ে গেছে।

অতএব জ্যোৎস্না যখন নিত্য নিয়মে চা-টা এনে সামনে ধরল, তখন কাপটা তুলে তাকে তাক করে ছুঁড়ে মারার বদলে, 'তুলে নিয়ে ঠোঁটেই ঠেকাল।'

কিন্তু পুরন্দরের কপালে তো আর আজ ভাগ্যদেবতা শান্তি দেননি। তাই খানিকটা পরেই এসে হাজির খুকু, বীরেশ আর বৌদি।

অবশ্য আসাটাই স্বাভাবিক। ওরা কি আর খবর না নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে?

বীরেশ রাতের বেলাই দীপঙ্করের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে ঘটনা সম্পর্কে খানিকটা ওয়াকিবহাল হয়েছিল এবং টেলিফোনওয়ালা পাশের বাড়ি থেকে ফিরে

এসে বৌকে বলেছিল, 'তোমার ছোড়দা আমার ওপর একদম ফায়ার হয়ে আছে। ঘোষণা করেছে আমার নামে 'বৌ লোপাটের' অপরাধে পুলিস কেস করবে। দাদাকেও নাকি মান-সম্মান না রেখেই ভাগিয়ে দিয়েছে।'

খুকু কাঁদো-কাঁদো ভাবে বলেছিল, 'হতেই পারে, মানসিক অবস্থাটা ভেবে দেখো। ছোটোবৌদিকেও বলি, বাবা, নিখোঁজ নিরুদ্দেশ হতে সাধ ছিল, নিজের জায়গা থেকেই হতিস। আমাকে চোব-দায়ে ধরা পড়াতে আমার বাড়ি থেকে কেন ?'

'কর্তা-গিন্নির মধ্যে কিছু গড়বড় ছিল বলে জানো ?'

'আমি আর কোথা থেকে জানব ? ক'দিনই বা দেখা হয় ? তবে অবস্থা দেখে তো মনে হয় সুখের সাগরে ভাসছে। বড়োবৌদিও বলে, 'এত সুখ-ঐশ্বর্য, তবে অহঙ্কারী হয়ে যায়নি। তালতলায় বেড়াতে যেতে খুব ভালোবাসে, আর গেলে 'নেটিপেটি' ভাব করে।'

'নেটিপেটি ভাব ! সেটা আবার কী ?'

'কী আবার ? বেশ গায়ে-পড়া ভাব। ওই তো ওদের সঙ্গেই তো ফিরতে চেয়েছিল। কিন্তু—'

'ও। তবে এ-খবরের থেকে হঠাৎ 'অন্তর্ধান-রহস্যটা' ধরা যাচ্ছে না।'

'আসলে যে কি হল ! কি জানি বাবা ! কাল একবার 'বড়াই মায়ের' কাছে গিয়ে 'কড়ি চালাই' করে দেখলে হয়। ঠিক বলে দেবেন কোন্‌দিকে গেছে। পূর্ব দক্ষিণ উত্তুর পশ্চিম।'

বীরেশ হাসে, 'কোন্‌দিকে গেছে, তা হয়তো বলে দিতে পারেন তোমাদের 'বড়াই মা'। তবে কী উদ্দেশ্যে বা কী মনোভাবে গেছেন, তা কি বলে দিতে পারেন ?'

'বাঃ। 'কড়ি চালা' তো। কড়ি আর কত চলবে ? সে তো আর কথা বলে না ! শুধু ইশারা দেয়।'

'ওই তো মুশকিল। কথা বলে না। শুধু ইশারায় কাজ হবে না। দরকার একটা 'কথা বলিয়ে'র। যাকগে। কাল ফার্স্ট ট্রেনেই বেরিয়ে পড়া যাক। দেখি গিয়ে শালাবাবুর অবস্থা কী !'

খুকু ব্যগ্রভাবে বলে, 'যাবে ? আমিও ভাবছিলাম। সাহস করে বলতে পারছিলাম না।'

'সাহসের এত অভাব হল কবে থেকে ?'

'আহা, কবে কি এত সাহস দেখিয়েছি শুনি ?'

'দেখাওনি। দেখাতে কতক্ষণ ? তোমাদের মেয়েদের বিশ্বাস নেই। হয়তো হঠাৎ কখন সুযোগ পেলে কারুর সঙ্গে সটকে পড়বে।'

'দ্যাখো, ভালো হবে না বলছি।'

'ভালো হবার আশা কে করছে? তা'হলে ওইকথাই থাকল।'

'ভাবছি, আজ এই যজ্ঞির ঝামেলা গেল, চারিদিকে আগোছালো, কাল সক্কালেই বাড়ি থেকে চলে যাবো? মা কিছু মনে করবেন না তো?'

বীরেশ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, 'আমার মাকে তুমি এত নীচ মনে করো?'

খুকু তাড়াতাড়ি ভয়-তরাসের গলায় বলে ওঠে, 'না না, সে-কথা বলছি না। মানে বলছি, মার খুব অসুবিধে হবে তো।'

'হলে হবে। যেটা উচিত সেটাকেই অগ্রাধিকার দিতে হয়।'

বীরেশ এইরকমই। খুবই হাসিখুশি, স্ফূর্তিবাজ। কিন্তু কোথায় যেন আছে একটা পাথরের পাঁচিল, যেখানে ঠেক খেতেই হয়।

খুকু অবস্থাকে আরো সহজে আনতে বলে, 'তুমি আমায় ছোড়দার ওখানে পৌঁছে, দিয়েই অফিসে চলে যেও।'

'অফিস্! গুলি মারো অফিসকে!'

'ওরে বাবা! বল কি? ভূতের মুখে রামনাম। তবে ছোড়দা যেরকম ক্ষেপে আছে শুনলাম, তাতে না আবার তোমার গুলি খেতে হয়।'

'সে রিস্ক নিতেই হবে। তবে না-ক্ষেপলেই বরং তোমার ছোড়দাকে অমনিষ্যি বলতাম। দশ-বছর ঘর-করা বৌটা হঠাৎ দশ মিনিটের মধ্যে উবে গেল। ভাবা যায়?'

রাত্তিতে ওরা খুব কম সময়ই ঘুমোল। বীরেশ হঠাৎ প্রশ্ন তুলে বসল, 'আচ্ছা, এতদিনও তোমার ছোটোবৌদির বাচ্চাটাচ্চা হয়নি কেন? ডাক্তার-ফাক্তার দেখানো হয়েছিল?'

খুকু বলেছে, 'দূর! এ-সব কিছু না। ছোড়দা চায় না বলেই এখনো—'

'কিছু মনে কোরো না তোমার ছোড়দাটি একটি গাড়ল। মেয়েদের মনের মধ্যে মা হবার আকাঙ্ক্ষা যে কতখানি, তা বোঝা উচিত!'

'হুঁ। শিক্ষাটা দিয়ে এসো এবার। ভালো মাষ্টার পাবে।'

'আর এখন 'দেওয়া-নেওয়া'। পাখি তা উড় গিয়া। তবে আমি তো বাবা সার বুঝি দু-পাঁচটা বাচ্চাকাচ্চা থাকা দরকার।'

'ওরে বাবা। একেবারে দু-পাঁচটা!'

'হুঁ। যাতে বেশ জম্পেশভাবে সংসারে গেঁথে যেতে পারে মেয়েরা।'

'বটে? আর নিজে যে একটার ওপরে দুটো হওয়াতেই লজ্জায় মারা যাচ্ছিলে!'

'ওটা স্রেফ লোকদেখানো। কালের হাওয়ার সঙ্গে তাল দেওয়ার ভান।

সেকালের বিচক্ষণ কর্তারা অত চক্ষুলজ্জার ধারটার ধারতেন না। প্রেয়সীকে ডজন-দেড়ডজন উপহার দিয়ে রাখতেন, যাতে ট্যাঁ-ফোঁটি না করতে পারেন তিনি। ভেগে যাবার ফাঁকটিও না পান।'

'অসভ্য! ছোটোলোক। যা মুখে আসে বললেই হল। ধরেই নিচ্ছো ছোটোবৌদি ভেগেই গেছে।'

'ধরেই নিচ্ছি না, কার্য-কারণের ব্যাখ্যা খুঁজছি। ঈশ্বর করুন, আমার ব্যাখ্যাটা ভুলই হোক। বেচারি ছোড়দা। মনটা খুব কাঁদছে তার জন্যে! বৌ মারা পড়া এক, কিন্তু বৌ হারানো! ইশ্‌....'

'তোমার অন্ত পাওয়া ভার!'

তালতলার বাড়িতে গিয়ে এই কথাটাই বীরেশ নিজেই অনায়াসে বলে বসল বড়োবৌদিকে।...আপনাদের মেয়েদের অন্ত পাওয়া ভার! এখন বড়দার জন্যেও ভয় ঢুকল। কখন তাঁকে অনাথ করে দিয়ে কেটে পড়েন।'

বড়োবৌদিও অবশ্য কম যান না। বলে ওঠেন, 'আমি তো সর্বদা সেই তালেই আছি! সুযোগ জুটছে না তাই!'

তারপরই বলে উঠলেন, 'আরে, আমরা তো দিব্যি হাসিঠাট্টা করছি, বৌ-পালানোর লোকটার কী হাল দেখতে যাওয়া যাক বাবা। চলো, তোমাদের সঙ্গেই চলে যাই। একা তিনজনকে মারধর করতে পারবে না।'

বলল, 'হাসিঠাট্টা করছি।' তবু করতেও ছাড়ছে না! উন্নাসিক পুরন্দরের নাকটায় এমন ঝামা ঘষায় যেন মনে-মনে একটু পুলকের হাওয়া।

হয়তো এই রকমই হয়। ভালোবাসা থাকলেও হয়। রাগী-ঝাঁজি-বদমেজাজি কটুভাষী এ-সব দোষটোষও বরং মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু অহঙ্কারটা অসহনীয়। নাক-উঁচুটা বরদাস্ত করা কঠিন!

তা রীতিমতোই উঁচু ওই লোকটার। 'আপনজন' ভাবটা যেন আসেনা।

এই তো এখন!

গোলমেলে একটা বিপাকে পড়ে গেছিস, একটু নরম হ, আত্মীয়স্বজনের কাছে পরামর্শ চা, তা নয়, গুম-হয়ে-বসে-থাকা মুখটাকে কুঁচকে বলে ওঠা হল কিনা, 'আরেব্বাস! একোরে সদলবলে! আহা উহু করতে বোধহয়?'

খুকু বলে উঠল, 'সব সময় এমন বিচ্ছিরি করে কথা বলিস কেন বল্‌ তো ছোড়দা? কোনো মানে হয় না।'

বলতে-বলতেই ঘরে ঢুকে পড়ে বলে ওঠে, 'এ মা! ঘরের কী অবস্থা! ডাকাত পড়েছিল নাকি?'

পুরন্দর তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, 'এমন কিছু ব্যাপার নয়, একটা দরকারি জিনিস দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাই খোঁজাখুজি করছিলাম।'

বীরেশ একটু হেসে বলে, 'যে -'দরকারি' জিনিসটি দেখতে পাচ্ছিলেন না, সেটা তো আলমারি দেরাজ খুঁজে পাওয়া যাবে না, ছোড়দা। তা এতসব নাড়াচাড়ায় ছোটোবৌদির কোনো আত্মীয়-টাত্মীয়র চিঠিপত্র কিছু দেখতে পেলেন না? কোনো ঠিকানা-টিকানা?'

আসলে, সে-রকম একটা কিছু খোঁজার চেষ্টাতেই যে এই তছনছ কাণ্ড, সেটা বুদ্ধিমান লোকটা বুঝে নেয়।

পুরন্দর ভুরু কুঁচকে বলল, 'আত্মীয়? তোমাদের 'ছোটোবৌদি'র একজনমাত্রই তো আত্মীয় দেখেছিলাম, যিনি তাঁকে আমার হাতে সমর্পণ করার পরই স্বর্গারোহণ করেছিলেন। আর তো কিছু জানা নেই।'

অতএব কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয়। পুলিশের থেকে ভালো।

হঠাৎ জ্যোৎস্না এদের কথার মাঝখানে বলে ওঠে, 'চন্দননগরের সেই যে বন্ধুটি আসেনা; হয়তো তেনার বাড়িতে গিয়েই বসে থাকতে পারে বৌদিদি। আমার তো কেবল তা-ই মন নিচ্ছে।'

চন্দননগরের বন্ধু!

একজন আকাশ থেকে পড়ে, অপরজনেরা একটু আশার আলো দেখতে পায়। তাহলে একটু হদিস মিলছে!

তবে যে লোকটা আকাশ থেকে পড়ে, সে প্রায় ছিটকে উঠেই বলে, 'চন্দননগরের বন্ধু মানে?'

'ওমা! দু-তিনদিন যিনি এলো! কেন, বৌদিদি আপনারে বলে নাই?'

'দু-তিনদিন'-টা কথায় একটা ছন্দ রাখা! দুদিনই। তবে পুরন্দরের যে তার আবির্ভাব সংবাদ জানা নেই, সেটা জ্যোৎস্নার অনুমানের বাইরে। তেমন অনুমান করলে নির্ঘাৎ কোনোসময় কথার ছলে সাজিয়ে সংবাদটি দাদাবাবুর কাছে পরিবেশন করে ছাড়ত?

পুরন্দর হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়ে মান-মর্যাদা রক্ষায় যত্নবান না হয়ে বজ্রগম্ভীরভাবে বলে, 'না! কবে এসেছিল? কীরকম দেখতে?'

জ্যোৎস্না গালে হাত দিয়ে বলে, 'ওমা! আমি বলি আপনি জানো! এইতো কিছুদিন আগে পরপর দু'দিন এসেছিল। একদিন অবিশ্যি আমি দেখি নাই। বাসায় ছিলুম না! খেয়ে গেছে, তার ডিশটা দেখলুম। শুনলুম, ছেলেবেলার বন্ধু এয়েছিল, খেয়ে গেছে। আর একদিন তো বৌদিদি তাকে দেখেই লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে আমারে দোকান পাঠিয়ে কুড়ি টাকার মিষ্টি আনাল! তো তিনি খেল না একটা বৈ দুটো!'

বাকি তিনজন পরস্পর তাকাতাকি করে। যাক, একটা সন্ধানসূত্র মিলেছে। চন্দননগর। এবং 'বন্ধু'।

খুকু হঠাৎ রেগে উঠে বলে, 'ক'টা মিষ্টি খেয়েছিল সে-কথা কে জানতে চাইছে? কীরকম দেখতে সেটাই জিগ্যেস করা হচ্ছে।'

'কীরকম দেখতে—' এই প্রশ্নটার মধ্যে আরো কিছু আছে, যেটা উত্তরের মাধ্যমে পরিষ্কার হবে।

জ্যোৎস্না হঠাৎ হিহি করে হেসে উঠে বলে, 'দেখতে? তা পেরায় আপনার মাথার চুলের মতন রঙ, আর শুকনো কাঠ চেহারা! নাকি বৌদিদির ইস্কুলের এক কেলাসের বন্ধু! তো অতবড়ো মেয়ে, এখনো বে' হয় নাই। ইস্কুলের দিদিমণি বোধ হয়।'

'মেয়ে!'

উত্তেজনার আগুনে জল পড়ে যায়!

তিনজনের নয়, চারজনেরই!

বড়োবৌদি পরিস্থিতি সামলে নিতে একটু হেসে বলেন, 'তা যেমন রঙ বলছ, তাতে আর বে' হবে কী? তো সেখানেই গেছে তোমার বৌদি তা কী করে জানলে?'

জানবো আর কোথা থেকে? জোছনাকে আর কে মনিষ্যির দরে ধরে ডেকে কিছু বলতে যায়? জোছনা, দশকাপ চা বানা! জোছনা ছুটে দোকানে যা—এই তো সম্বন্ধ। অনুমানে যা মনে এলো! বলতে শুনেছিলুম কিনা— 'হ্যাঁরে ছবি! বাড়িটা এখনো সেইরকম আছে? ছবি! এখনো সেই বকুলগাছটা আছে? ফুল হয়? ছবি! কী ইচ্ছে যে করছে দেখতে! মনে হচ্ছে তোর সাথে ছুটে যাই।' ...এই থেকেই অনুমান! ওই চেহারা তার নাম কিনা ছবি।...হি হি হি।

কী আশ্চর্য! ব্যাপারটা তো একবার সোজা—সরল। সুনয়না নামের মেয়েটার বাবার ভিটেবাড়ি তো চন্দনগরেই ছিল বটে। মেয়ের বিয়ের চেষ্টায় কলকাতায় কোনো দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে কিছুদিন থেকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হয়েছিল। এবং সেখানেই বোধহয় মারা গিয়েছিল কিছুদিন ভুগে। এ-খবর তো বীরেশ ছাড়া সকলেরই জানা। বীরেশ তখনো এদের বাড়ির কন্যাদায়-উদ্ধারে এগিয়ে আসেনি।

খুকু জানে, বড়ো বৌদি জানে।

পুরন্দরও অবশ্যই জানে। এবং এও জানে, শৈশবে মা মরায় নাকি পাড়ার লোকের হাতে-হাতে বড়ো হয়ে উঠেছিল মেয়েটা।...কিন্তু সে-কথা কারো মনেই ছিল না। সকলে ভুলেই গিয়েছিল সুনয়না রায়ের একটা শৈশব-বাল্য ছিল। পুরন্দরেরই-বা মনে রাখার কী দায়? সুনয়না কি কোনোদিন তার শৈশব-বাল্যের স্মৃতি উন্মোচন করেছে কারো কাছে?

না-করার কারণটা কী? আর কিছু নয়, সুখ-সৌভাগ্যের সিংহাসনে উঠে বসে অতীতের দৈন্যের ছবিটি কারো সামনে তুলে ধরতে ইচ্ছে হয়নি। মা ছিল না, পরের দয়ায় মানুষ, সে জীবন কি তুলে ধরবার?

অতএব বন্ধু আসার খবরটা পুরন্দরের কাছে চেপে গেছে সুনয়না। কে জানে বন্ধু কোনো সাহায্য-টাহায্যের আশাতেই এসেছিল কিনা! বলতে লজ্জা হওয়াই স্বাভাবিক!

প্রত্যেকের মনের মধ্যেই এই ধরনের একটা চিন্তা খেলে যায়। বড়োবৌদি একটু সহানুভূতির সঙ্গে বলে, 'সত্যি, ও বেচারার যে একটা ছোটোবেলার জায়গা ছিল, কোনোদিন ভাবা হয়নি। কেউই ভাবিনি।'

পুরন্দর একটু শ্লেষের গলায় বলে, 'সে বেচারি নিজেও কোনোদিন ভেবেছে কিনা সন্দেহ। কোনোদিন তো বলতেও শুনিনি।'

'মেয়েরা কত কারণেই যে কত কী মুখ ফুটে বলে না। তা কী আর তোমরা বোঝো? জোছনা, তুমি ঠিক শুনেছ চন্দননগর?'

'না শুনেই কি আর বলচি বড়োবৌদিদি? দু-চারবার শুনেছি।'

খুকু হঠাৎ বলে ওঠে, 'আচ্ছা সেই বন্ধুকে দেখে কি খুব গরিব গরিব মনে হয়েছিল?'

জ্যোৎস্না একগাল হেসে বলে, 'তা [illegible] না দিদিমণি, তাই হয়েছিল। যেমন একখানি শাড়ি পরে এসেছিল, তেমনটা আমরাই পরি। আপনারা ছোঁবেনও না।'

'যাক, বোঝা গেছে। ছোড়দা, আজকের দিনটি কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়াটা বন্ধ দে। ছোট্ সেই চন্দননগরে। দ্যাখ, তোর জ্যোৎস্নার দেওয়া খবরের আলোয় যদি—'

অতঃপর আবার জ্যোৎস্নার ওপর প্রশ্নবাণ বর্ষণ। 'নাম বলছ ছবি? আর কিছু শোননি?'

'আর কী শুনব?'

'ওই-যে কোন্— পাড়ায় বাড়ি, কোন্ ইস্কুলের দিদিমণি'

'নাঃ। সে-সব কিছু শুনি নাই।'

'তো বলি, দেখলে চিনতে পারবে?'

'তা আর পারব না? এই জোছনা মণ্ডল একবার যারে দেখবে তারে জীবনেও ভুলবে না।'

অতএব আর কি!

খড়ের গাদায় সুঁচ খুঁজতে যাওয়ার মতন ওই সামান্য সম্বলটুকু নিয়েই অভিযানে

বেরোও হতভাগ্য পুরন্দর রায়। 'চন্দননগর' 'ছবি' আর কোনো একটা 'ইস্কুলের দিদিমণি'।

খুকু বলল, 'নিশ্চয়ই আজেবাজে কোনো স্কুল হবে মনে হচ্ছে। যেমন শুনলাম। তা হোক, চল না সবাই মিলে—'

পুরন্দর বলল, 'সবাই মিলে ভিড় করে যুদ্ধযাত্রায় কোনো মানে হয় না। আর ট্রেনের টাইম কখন বলেও ভাবার দরকার নেই। অফিসে ফোন করেছি। আজ আর যাচ্ছি না। কাজেই গাড়িটা নিয়েই বেরোনো যাবে। কী তোর আজ তালতলায় থেকে যাবার ইচ্ছে? না, বাড়ি ফিরতে চাস? বলিস তো যাবার পথে তোদের ছেড়ে দিয়ে যেতে পারি। বৌদি যা বলেন। অবশ্য এই যাত্রার ফলাফল কী হবে জানা নেই।'

হঠাৎ ছোড়দাটা এমন সহজ হয়ে গেল কী করে? অবাক হল বৈকি খুকু এবং তার সম্প্রদায়ও!

পুরন্দর নিজেও যেন অবাক হচ্ছে, হঠাৎ মনটা হালকা লাগছে বলে। এই-যে কথা হচ্ছিল কাগজে-কাগজে একটা বক্স নম্বর দিয়ে এবং 'সাংকেতিক' ভাষায় 'সুনয়না'কে আহ্বান করা—আমরা উদ্বিগ্ন, সেখানে থাকো চলে এসো অথবা জানাও—সেটা যে এক্ষুণি করতে হচ্ছে না, এই ভেবে?

বড়োবৌদি বলেছিল, 'নাম-ঠিকানার দরকার কী? লেখা হোক না 'তালতলার বাড়ির সবাই' তাহলে, সবদিক রক্ষে। 'কবি পুরন্দর রায়ের বৌ হঠাৎ নিখোঁজ' এটা এত চটপট নাই-বা জানানো হল সবাইকে।'

যাক, সেটা থেকেও আপাতত রেহাই।

সঙ্গে নিতে হবে ভারি দরকারি জন জ্যোৎস্না মণ্ডলকে। কারণ সে-ই এ যাত্রার কাণ্ডারী।

পুরন্দরের মনের মধ্যে একটু হালকা হাওয়া বইছে বটে, তবু অবচেতনে ভেবে চলেছে, আচ্ছা 'চন্দননগর' শব্দটা সম্প্রতি কি কোথায় যেন দেখেছি? অথবা আভাসে ওই শহরটার কোনো কথা?

কোথায়? নাঃ, ঠিক চন্দননগর নয়। তবে তার আশেপাশের কোনো জায়গার নাম দেখেছি কিসে যেন।

আচ্ছা, কবে যেন ওই চন্দননগর থেকে কোন্-একটা পত্রিকায় সুনয়না নামের কোনো লেখিকার লেখা গল্প বেরিয়েছিল?

কিন্তু সে তো অনেকদিনের কথা!

আর সে তো সুনয়না রায়ের নয়, সুনয়না মজুমদারের মনে হচ্ছে। কোনো-একটা রহস্যের জট কি রয়ে গেছে সেখানেই?

অতঃপর খড়ের গাদায় ছুঁচ খোজা চলছে। কোথায় কোথায় বালিকা বিদ্যালয় আছে চন্দননগর নামক নগরটিতে, অথবা প্রাইমারি স্কুল। বালক বালিকা উভয়েই থাকতে পারে। কিন্তু সন্ধান-সূত্রের সূত্রটি যে নেহাতই পলকা। শুধু ছবি। দেবী যোগ করলে যেন বেমানানই ঠেকছে।

'শুধু ছবি! সারনেম জানেন না? অ্যাঁ? ব্যাপারটা কী বলুন তো, মশাই— ?' ...সকলের একই প্রশ্ন। স্কুলবাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসে ভদ্রলোক সামনে দাঁড়-করানো নতুন অ্যাম্বাসাডারটার ভিতরে বসে-থাকা জনের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন গলায় বলেন, কোনো পুলিস কেসের ঘটনা নয় তো?

গাড়ির আরোহী খোলা গলায় প্রায় হেসে উঠেই উত্তর দেয়, 'কী আশ্চর্য! না না! মোটেই ওসব কিছু না। আসলে ওই মহিলাকে, মানে আর কি যাঁর নাম করেছি, তাঁর একজন নিকট-আত্মীয় তাঁকে একটা বিশেষ খবর জানিয়ে দিতে বলেছিলেন আমায়, আমি এদিকে আসছি দেখে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর দেওয়া নাম-ঠিকানা আর ডিরেকশান-লেখা কাগজটি সঙ্গে নিয়ে আসতে ভুলে গেছি। তাই এই বিপদ। আমার স্মৃতির মধ্যে রয়েছে শুধু কোনো-একটা গার্লস স্কুল, আর দু' অক্ষরের ওই ছোট্ট নামটি। তাই নিয়েই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তো, বলছেন তো, ওই নামের কোনো শিক্ষিকা এখানে নেই। তবে আর কি করা...! আচ্ছা নমস্কার। আপনাদের অকারণ বিরক্ত করলাম।

নেহাতই মোটামুটি ওই জীর্ণ চেহারার বাড়ির পুরনো ইস্কুলটির অফিস-কেরানি শিবনারায়ণ ঘোষ এই নতুন গাড়ি এবং সুন্দর সুকান্ত ও অভিজাত চেহারার ভদ্রলোকটির বিনয়ে বিগলিত হয়ে প্রায় হাত কচলে বলেন, 'না না। আমিই বরং ইয়ে— আপনার কিছু সাহায্য করতে পারলাম না।'

গাড়িটা ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়েই রইলেন, তবে এখন আর খুব নির্মলমুখে নয়। সন্দেহকুটিল কালো ছায়া নিয়ে। পিছনের সিটে গদিয়ান হয়ে বসে আছে যে-মেয়েটা, সেটা কে? দেখতে তো যেন অমার্জিত একটা কাজের মেয়ের মতো। ওরা অবশ্য এখন সাজগোজে মানিববাড়ির মেয়েদের টেক্কা দিলেও মুখের ভাবে ধরা পড়েই।.... নাঃ, রহস্য একটা কিছু আছেই!

তা এই শিবনারায়ণের মতো পোড়-খাওয়া প্রৌঢ় চেহারার লোক ছাড়াও, সন্দেহের ছায়া এমন অনেকের মধ্যেই ছাপ ফেলেছে। ব্যাপারটা তো খুব স্বাভাবিক নয়। তুমি মহাশয়, একখানা ঝকঝকে চেহারা নিয়ে একটা ঝকঝকে গাড়িতে চেপে এখানে-সেখানে যত বালিকা বিদ্যালয়ে হানা দিয়ে বেড়াচ্ছো এমন একজন

শিক্ষিকার খোঁজে, তুমি তার নামের আধখানা অথবা দু-অক্ষরের একটু টুকরো নাম ব্যতীত আর-কিছু জানো না! আবার তোমার সঙ্গে এমন একটা কেলে মেয়ে, যাকে দেখলেই মনে হচ্ছে—এমা! এটা আবার ওঁর সঙ্গে কে?' গাড়িতে গদিয়ান হয়ে বসে আছে।'

অথচ এই ধরনের সন্দেহের হাত এড়াতেই পুরন্দরকে ওই নাম-ঠিকানা-ডিরেকশান লেখা কাগজটুকু ভুলে ফেলে আসার গল্পটি বানাতে হয়েছে।

কী অদ্ভুত বিরক্তিকর এই পরিস্থিতি!

খুকু যে বলেছিল, 'এখন খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজগে যা ছোড়দা—' সেটা ভুল বলেনি।

সত্যি বলতে, ভুল ওরা কেউই বলেনি, কিন্তু সেটা মেনে নিতে বাধ্য হওয়ায় পুরন্দর রায় নামের অতি আত্ম-অহমিকাসম্পন্ন লোকটার মনে রীতিমতো ঘা পড়েছে। কিন্তু সহ্য করা ছাড়া উপায়ও হয়নি। তার এতদিনের জানা বিশ্বস্ত স্ত্রী সুনয়না রায়—যাকে নিয়ে নিশ্চিন্ততার সাগরে নিমগ্ন থেকেছে এ-যাবৎ, সে হঠাৎ এক রহস্যময় অন্তর্ধানে পুরন্দরকে এই বিপাকে ফেলে বসেছে!

তাই যে-লোকটাকে দেখে পুরন্দরের মনের মধ্যে বিষ উঠেছিল, সেই লোকটাই যখন পুরন্দরের ওপর মুরুব্বিয়ানা ফলাতে এসেছিল, তার যুক্তিটাকেই মেনে নিতে হয়েছিল—তার কথায় গায়ে জলবিছুটি লাগা সত্ত্বেও।

বীরেশই গতকাল সেই আলোচনার সময় পুরন্দরকে অবহিত করে দিতেই বলে উঠেছিল, 'বাই কার? বলছেন বটে ছোড়দা, কিন্তু তাতে তো আপনার ট্রেনের থেকে অনেক বেশি সময় লাগবে! আপনার কাজের জন্যে হয়তো দিনের একটু টুকরো মাত্র হাতে পাবেন! তাতে—'

সঙ্গে-সঙ্গে বীরেশের একান্ত অনুগামিনী পতিব্রতা সতী স্ত্রীটি বলে উঠেছিল,' তা সত্যি রে ছোড়দা, 'ও' যা বলছে সেটা ঠিক। ট্রেনে তুই অনেক কম সময়ে পৌঁছে যেতে পারবি। তখনো হয়তো স্কুলটুলগুলো খোলা পাবি। বন্ধ হয়ে গেলে তো—'

হ্যাঁ, সন্ধান চালাবার একমাত্র ক্ষেত্রই তো ওই 'স্কুল'। মেয়েস্কুল। যে-কোনো একটা!

একদা ফরাসি-অধিকৃত প্রাচীন ঐতিহ্য-সংবলিত বহু ইতিহাসের সাক্ষী এই চন্দননগর নামের নগরীটি এ বঙ্গে বরাবরই শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে রীতিমতো অগ্রসর। বিখ্যাত স্কুল-কলেজসমূহ বাদেও অন্য সব শিক্ষায়তনের সংখ্যাও এখানে কম নয়। ছোটো-বড়ো-মাঝারি—অনেক। বালিকা বিদ্যালয়ও তো আগের আর এখনকার মিলিয়ে যথেষ্ট। অতএব খুকুর কথাটাই ধর্তব্য—ওই খড়ের গাদায় ছুঁচ।

ছোটোবোনের এই 'ও'-ভক্তির বহর উঠতে-বসতেই মেলে। অথচ আশ্চর্য, পুরন্দরের স্ত্রীর লোকসমাজে সর্বদাই পতির বিপরীতে কথা বলাই অভ্যাসগত। অবশ্যই বিদ্বেষে বিরুদ্ধ নয়, কৌতুকে বিপরীত। তবু কদাচ এমন সায় দেওয়ার ভঙ্গি থাকে না।

পুরন্দর বোনের দিকে তাকিয়ে নিমপাতার রসে জারিত একটু ব্যঙ্গ হেসে বলেছিল, 'তোর 'ও'-র রেলগাড়ি গ্যারান্টি দিতে পারবে, 'লেট'না করে জোর ছুটে কারের টাইমে পৌঁছে দেবে?'

এমনভাবে বলল, যেন পুরন্দর আজীবনই ওই 'বাই কার'-এ ভ্রমণেই অভ্যস্ত। যেন রেলগাড়িটা নেহাতই রাম-শ্যাম-যদু-মধুর ব্যাপার!

বীরেশ একটু হেসে বলল, 'গ্যারান্টি অবশ্য তামাম ভারতের কোনো লাইনের রেলগাড়িতেই নেই! আর এ তো সব লোক্যাল ট্রেনের ব্যাপার! হয়তো হরেদরে হাঁটুজলই হবে। হয়তো পৌঁছে গিয়ে দেখতে হবে, সকল দুয়ারে কপাট পড়ে গেছে। ফিরে আসতেই হবে। আর আবার কাল সকালে বেরোতে হবে। তার থেকে বলছিলাম কি, আজকে বরং একটু ধৈর্য ধরে বসে থেকে একেবারে কাল ভোরেই—মানে যাতেই যান, পুরো দিনটা হাতে পাবেন। কারণ, আপনার তো, ছোড়দা, সন্ধানসূত্র আবিষ্কারের সম্বল হচ্ছে মাত্র ওই দুটি।'

অর্থাৎ সেই 'যে-কোনো একটি বালিকা বিদ্যালয়' এবং 'ছবি'।

যে-ছবির মুখচ্ছবি কারো জানা নেই, বাদে 'জ্যোৎস্না'।

খুকু তবু বলে উঠেছিল, 'তা'হলেও বাপু বলি ট্রেনই ভালো। একেবারে ফার্স্ট ট্রেনটা ধরতে পারলে অনেকটা সময় হাতে পেয়ে যাবি।...তোকে তো যাকে বলে দোরে-দোরে কড়া নাড়া দিয়ে-দিয়ে দেখতে হবে। 'সময়'ই সবচেয়ে দরকারি।

পুরন্দর গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'খুব যুক্তিযুক্ত পরামর্শ, কিন্তু ওই 'দোরে-দোরে কড়া নাড়া'র ব্যাপারটাও তোদের ট্রেনের দ্বারা হবে?'

'আহা! কি যে বলিস! কেন, সাইকেল-রিকশো নেই? গাদা-গাদা পাবি! বরং তারাই রাস্তাঘাট কোথায়-কী বেশি চেনে। দেশটা তোর 'শ্বশুরবাড়ির' হলেও জম্মে তো যাসনি কখনো। কিছুই চিনিস না।'

পুরন্দর আর-একটু গভীর হেসে বলেছিল, 'তা বটে! শ্বশুরবাড়ির কোনো-কিছু চিনি না। সে যাক, একখানা সাইকেল-রিকশোয় চেপে বসে দোরে-দোরে কড়া নেড়ে বেড়াতে থাকবো—অবশ্যই শ্রীমতী জ্যোৎস্না মণ্ডলকে লেপটে পাশে বসিয়ে? কারণ, সনাক্তকরণের কাজ তো একমাত্র তারই!

কথা শেষ না-হতেই খুকু বোধহয় সেই সম্ভাব্য দৃশ্যটি মনে-মনে দেখে ফেলে,

বলে ওঠে—'এ মা! সত্যিই তো। ধ্যাৎ! রিকশোয় ওকে পাশে বসিয়ে—য্যাঃ। ইশ্‌!... না বাপু, তোর বুদ্ধিই ঠিক।'

'তোর বুদ্ধিই ঠিক।'

অর্থাৎ পুরন্দরের। অতএব জ্যোৎস্না মণ্ডল একখানা চকরাবকরা ছাপাশাড়ি ও লাল টুকটুকে ব্লাউজে ভূষিত হয়ে এবং কানে ইয়া দুটি রিং-মাকড়ি ঝুলিয়ে আর দু'চোখের কোণে মোটাদাগের কাজল এঁকে গাড়ির পিছনের সিটে গদিয়ান হয়ে বসে আছে। আর মাঝে-মাঝেই সঙ্গে-আনা খাবার জলের বোতলটা খুলে জল খেয়ে নিচ্ছে। তার আগে অবশ্য দাদাবাবুকেও একবার করে অফার করছে—আপনার 'ফেলাক্‌সেও' তো জল এসেছে দাদাবাবু, খাবেন?—খাবেন না? পিপাসা পায় নাই? আমার তো গাড়ি ছুটলেই খিদা পায়, পিপাসা পায়!'

পুরন্দর ঘাম ঘুরিয়ে কঠোর দৃষ্টি হেনে চাপা গলায় বলেছে, 'তোমার কী-হয়-নড়া-হয় সেটা কেউ জানতে চাইছে না। চুপ করে থাকো!'

এই ওকে নিয়ে আসাটাও তো একটা চরম বিরক্তিকর! যদি অসম্ভব সম্ভব হয়ে সেই 'ছবি' নামের মহিলাটিকে দেখতে পাওয়া যায়, তবেই-না জ্যোৎস্না মণ্ডলের প্রয়োজনীয়তা? নয়তো একটা ফালতু বোঝা! বিরক্তিকর অরুচিকর বোঝা।

কেউ যদি হঠাৎ কোনো বেপোট অবস্থায় পড়ে যায়, তখন, তার ধারে-পাশে হিতাকাঙ্ক্ষী, পরামর্শদাতারা গজিয়ে ওঠে। এটা অবধারিত! তাই কবি পুরন্দর রায়কেও সৎ-উপদেশ দিতে আসে বদ্যিবাটির ডেলি প্যাসেঞ্জার কেরানি বীরেশ মুখুজ্যে! বলে, 'আপনাদের ওই জ্যোৎস্না যা বর্ণনা দিল, তাতে মনে হয় না সেই ছবিদেবী তেমন বড়ো কোনো স্কুলে আছেন। আপনি বরং প্রথমদিকে মাঝারি গোছের বা ছোটো ধরনের স্কুলটুলেই খোঁজ নেবেন ছোড়দা। 'ছবিদেবী'ই বলতে হবে—'হাসল একটু, 'সারনেমটা যখন জানা নেই।'

অমনি খুকু বলে ওঠে, 'অবিশ্যি 'দেবী'-টা এখন আর সেকেলে নয়। অনেক বিখ্যাত মহিলাটহিলাই তো এখন দু'-চারবার পদবি বদলে অবশেষে দেবীত্বে এসে ঠেকেন।'

বড়োবৌদি এতক্ষণ পুরন্দরের এলোমেলো তছনছ ঘরটাকে গুছিয়ে দিচ্ছিলেন। গলা তুলে বলে উঠলেন, 'আলোচনার সময়-অসময় আছে খুকু। এখন এ-ধরনের আলোচনার সময় নয়। তোমার ছোড়দার মনের অবস্থা এখন—'

সেই ছোড়দা তৎক্ষণাৎ বলে উঠেছিলেন, 'মনের কোনো সাংঘাতিক অবস্থা নেই, বৌদি। জাস্ট একটা কাজ ঘাড়ে পড়ে গেছে, করতে হবে—এই পর্যন্ত। ওসব দেবিত্ব-টেবিত্ব তোমরাই ভালো বোঝো।'

বৌদি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একটু হেসে বলেছিল, ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য দাসিত্বটাই বুঝি। সারাজীবন যেটা ফিল করে থাকি।'

'ও। বটে নাকি? তা'হলে তুমিও একটি রহস্যের নায়িকা হয়ে পড়ো।'

'আমি? হিহি। এ কাঠামোয় আর হবে না।'

'তোমাদের বিশ্বাস নেই।' বলে নাকটা কুঁচকেছিল পুরন্দর।

এখন সেই ঘাড়ে-পড়া কাজটা করতে নেমে পুরন্দরের মেয়েজাতটার প্রতি যে-মনোভাব তীব্রই হচ্ছে, সেটা আর যাই হোক 'দেবী'জনের যোগ্য নয়।

তবু অদৃষ্টের পরিহাস, সেই দরজায়-দরজায় কড়া নাড়ার সময় ওই 'দেবী' শব্দটাকেই ব্যবহার করতে হচ্ছে।... 'এই স্কুলে ছবিদেবী নামে কোনো শিক্ষিকা পড়ান?'

'ছবিদেবী?'

মাথা নাড়ার সঙ্গে প্রতিপ্রশ্ন, 'ছবিই পুরো নাম?'

'তাই তো জানি।'

'সারনেমটা কী?'

'তা জানি না। মানে—'

অতঃপর সেই নাম-ঠিকানা-লেখা কাগজটা ভুলে যাওয়ার গল্প। 'অথচ দরকারটা জরুরি। তাই এই অন্যকে বিরক্ত ব্যস্ত করা।'

কোনো-কোনো স্কুলের হেডমিস্ট্রেসও বেরিয়ে এসে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করে-করে জেরা করেছেন, এবং সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে গাড়ির পিছনের সিটে বসে-থাকা প্রাণীটার দিকে তাকিয়েছেন।

তাঁদের দৃষ্টিতে এই ভাবই ফুটে উঠেছে, এই মেয়েটাকে নিয়েই কোনো ব্যাপার নয় তো?... 'তবে না বাবা, তাঁদের স্কুলে অমন খাপছাড়া নামের কোনো দিদিমণি নেই।'

শেষ পর্যন্ত মাথা নাড়া।

দু'-একজন এ-প্রশ্নও করেছেন, 'ব্যাপারটা 'পুলিস কেস'-জাতীয় নয় তো?'

'অনেকগুলো গার্লস স্কুল ঘুরে এসেছেন? মুশকিল তো!'

'কাজটা এত জরুরি। অথচ আসল জিনিসটাই ভুলে ফেলে এসেছেন! আশ্চর্য তো' সকলেই বলছেন— আশ্চর্য তো, অদ্ভুত তো।'

অথচ এই গাড়ি-আরোহী ব্যক্তিটিকে সরাসরি কোনো অপমানসূচক কথা বলে সন্দেহ ব্যক্ত করতেও পারছেন না।

কী গ্লানিকর কাজ! পুরন্দরের যেন মাথার রক্তটা টগবগ করে ফুটতে থাকে।

হঠাৎ একটু আশার আলো। বরদাপ্রসন্ন মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুলের সেক্রেটারি তখন উপস্থিত ছিলেন, বললেন, 'নাম বলছেন শুধু ছবি? বনছবি মজুমদার কি? সারনেমটা—'

'আর বলবেন না মশাই, সারনেম ভুলে গিয়েই—'

'চেহারা কীরকম, বয়েস কীরকম?'

অকূলে কূল হিসেবে জ্যোৎস্নার দিকে তাকায় পুরন্দর। আর জ্যোৎস্না স্কোপ পেয়ে তড়বড়িয়ে ওঠে, 'রোগা কাঠি! কালো রঙ। তিরিশ বছর হতে পারে। বে-থা করেনি—'

ভদ্রলোক সবেগে মাথা নাড়েন।

না, আর না, যথেষ্ট হয়েছে। ক্লান্ত, বিরক্ত, তিক্তচিত্ত পুরন্দর বলে ওঠে। আর একবার! এইখানে কোথায় যেন একটা 'ভুবনেশ্বরী স্মৃতি বিদ্যালয়' না কি যেন আছে। বলে দিয়েছে আগের ভদ্রলোক। সেইটা দেখেই ব্যস। এই জ্যোৎস্না একটা ধুয়ো তুলে—এতো ভোগালো! রাবিশ!

একটুক্ষণ গুম হয়ে হঠাৎ গাড়ির চালককে নিচুস্বরে কি যেন বলে। চালকও নিচুস্বরে বলে, ঠিক আছে, লাগবে না। সকালে তো হেভি ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরোনো হয়েছে।

ব্রেকফাস্ট শব্দটার সঙ্গে জ্যোৎস্না খুবই পরিচিত তাই ওইটুকুতেই ওদের দুজনের বক্তব্যের মর্মোদ্ধার করে ফেলে বলে ওঠে, 'ব্রেকফাস্ট—সে তো কখন তলিয়ে গেছে ড্রাইভারদা। খিদা তো সকলেরই লাগার কথা। দাদাবাবু, আপনার লাগে নাই?'

'না।'

'তো আপনার না লাগতে পারে, মন-মেজাজ খারাপ। তবে পিত্তি পড়া ভালো না। খাবার দোকান হোটেল রেস্টুরেন্ট সব ফেলে-ফেলে চলে আসা হলো।'

ভারি বিরক্ত হয়ে কড়া করে কিছু বলতে যাচ্ছিল পুরন্দর। হঠাৎ মনে পড়লো, নিজের স্বার্থে একটা মানুষকে না খাইয়েদাইয়ে ঘুরিয়ে মারছি! আবার একবার সুনয়নার ওপর রাগে মাথা জ্বলে গেল।

আর ঠিক এইসময় একটা ঘটনা ঘটল।

দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটাকে দেখে কোথা থেকে যেন একটি তরুণ বয়সের ছেলে দ্রুত চলে এসে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠল, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো স্যার? কিছু মনে করবেন না—'

পুরন্দর ভুরু কুঁচকে তাকালো। কী আবার জিজ্ঞেস করবেন ইনি। তবু গম্ভীর হাসির সঙ্গে বলল, 'কিছু মনে না করাটা নির্ভর করছে কী জিজ্ঞেস করবেন তার ওপর।'

ছেলেটি একটু অপ্রতিভ হেসে বলল, 'না, মানে বলছিলাম, বছর-দুই আগে আপনি একবার 'চিনসুরা পাবলিক লাইব্রেরির' বার্ষিক সাহিত্যসভায় এসেছিলেন...না?'

আগুনে জল পড়ল।

মরুভূমির বালিতে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল।

এ কোন্ স্বর্গলোকের বাণী! দীর্ঘক্ষণের জন্যে যে একটা অপমানাহত পরিবেশের মধ্যে চলে আসতে হয়েছে, সে পরিবেশটা যেন পুরন্দর রায়কে ভুলিয়ে দিচ্ছিল, সে কে? তার পোজিশন কী? সে হতভাগ্যের মতো একটা বৃথা চেষ্টার ফাঁসে জড়িয়ে পড়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরছে, আর লোকে তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। যেন পুরন্দরই কোনো-একটা অপরাধের নায়ক, অথবা সাদা পোশাকে ঢাকা পুলিশের লোক।

এই ছেলেটা পুরন্দরের অনুভূতির জগতে এনে দিল পুরন্দর কী, তার চেতনা!

কিন্তু এই অবস্থায় কি নিজের পরিচয় প্রকাশ করে ফেলা ঠিক হবে? তাই একটু হেসে বলল, 'হঠাৎ এ-রকম মনে হল যে?'

'দেখেই মনে হল। এসেছিলেন, তাই না?'

'হতে পারে। দু'বছর আগের ব্যাপার! তো আপনিও বুঝি সেখানে—'

'আমি ওখানেরই ছেলে। এখানে আমার পিসিমার বাড়ি। ক'দিন হল বেড়াতে এসেছি। কিন্তু আপনি?'

'আমি? আমিও ধরুন বেড়াতেই।'

না, এর সামনে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলবে না পুরন্দর রায়। কিন্তু হঠাৎ জ্যোৎস্না বলে ওঠে, 'আমরা একটা ইস্কুল খুঁজতে বেরিয়ে ঘুরে হয়রান হচ্ছি।'

'ওঃ। ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেওয়া যায় না মেয়েটাকে?'

কিন্তু ততক্ষণে ছেলেটির বিস্ময়চকিত প্রশ্ন, 'ইস্কুল খুঁজতে? অগত্যাই পুরন্দর রায়কে হাল ধরতে হয় (কৌতুকের প্রলেপ দিতে হয়) হ্যাঁ ভাই, এমন একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সন্ধান চালানো হচ্ছে, যেখানে এমন একজন দিদিমণি থাকবেন, যাঁর চেহারাটি হবে রোগা কাঠি, রঙ কালো ঝুল, কিন্তু নামটি, হতে হবে ছবি!'

ছেলেটি একটু থতমত খেয়ে যায়।

তারপর বলে, 'আমি তো এখানকার বিশেষ কিছু জানি না তবে পিসিমার

বাড়ির কাছাকাছি একটা বাচ্চাদের স্কুল আছে দেখেছি। খেলার সময় তাদের হৈচৈ শোনা যায়।'

'বাচ্চাদের স্কুল, মানে নার্সারি?'

'নার্সারি নাকি প্রাইমারি ঠিক বলতে পারবোনা। তবে এই রকম কেউ একজনকে আসতে দেখেছি। অবশ্য নাম জানি না।'

তবে আর কি করা? সেই অন্ধকারেই একবার ঢিল ফেলে দেখা যাক। সেখানেই একবার দেখে আসা যাক। মহাজনের বাণী যেখানে দেখিবে ছাই। উড়াইয়া দেখো তাই। তো চলুন দেখিগে—

হ্যাঁ, মহাজনের বাণীটি তাই বটে।

ছাই উড়িয়ে নাকি পেলেও পেতে পারা যেতে পারে অমূল্য রতন।

কিন্তু আজকের এই অভাজনের ভাগ্যে ছাই ওড়াতেই দেখা গেল ছাইয়ের নীচে গনগনে আগুন। যে আগুনে শুধু হাত নয়, আরো অনেক কিছু পুড়লো!

ছাই ওড়ানোর ধাক্কায় কর্তৃপক্ষের একদল বেরিয়ে এলেন।

'বললেন ছবি! হ্যাঁ আছেন একজন! ছবিলেখা উপাধ্যায়। কিন্তু তিনি তো আজ—'

কিন্তু তিনি আজ 'কী' সে কথা শোনবার ধৈর্য ধরছে কে? যে শুনলো তার মধ্যে একটা বিদ্যুতের শক্ চড়াৎ করে উঠল না?

'কী? কী নাম বললেন?'

'ওই তো, ছবিলেখা উপাধ্যায়। উপাধ্যায়-বাড়ির মেয়ে। কিন্তু তিনি তো আজ আসেননি। দাদার অসুখ বেড়েছে বলে খবর পাঠিয়েছেন। তাকেঁই চাইছেন নাকি?'

খুব কষ্টেই কথা বেরোয়, 'না-দেখলে ঠিক বুঝতে পারছি না—'

'বাড়িতেই পাবেন। কাছেই বাড়ি। ও আপনার তো গাড়ি রয়েছে, দু'মিনিটের পথ। রাস্তায় যাকে জিজ্ঞেস করবেন বলে দেবেন। পুরনোপাড়া, বিদ্যাবাগীশ লেন, উপাধ্যায়-বাড়ি—বলবেন, যাঁর দাদাকে মিথ্যে একটা পলিটিক্যাল কেসের ফাঁদে ফেলে বিনাবিচারে সাত-আট বছর জেলে ভরে রেখে—মানুষটাকে একেবারে—সেই বাড়ি। কী হল? অ্যাঁ।'

এগিয়ে-যাওয়া গাড়িটার চাকার ধুলোয় চোখ রেখে ভদ্রলোক আপনমনে বলেন, 'কিরে বাবা, আবার কোনো পুলিসি ফ্যাসাদ নয় তো?' বলে তো ফেললাম। কী মতলবে এসেছিল কে জানে। দিব্যি ভদ্র চেহারা। মানুষ চেনা দায়। না বললেই হতো ছাই। শেষটা না শুনেই চলে গেল কেন রে বাবা। শুধু হদিসটা জানতে এসেছিল!

কিন্তু কথার শেষপর্যন্ত শোনবার আর কী আছে? যা শোনা হয়েছে সেটাই তো যথেষ্ট। হ্যাঁ, মানুষ চেনবার পক্ষে যথেষ্টই বৈকি। তা'হলে আর সেই পুরনোপাড়া বিদ্যাবাগীশ লেনের কোনো-একটা বাড়িতে যাবারই-বা দরকার কী আছে? গাড়ির চালককে তো বলে ওঠা যায়, না, হল না। গাড়ি ঘোরান। চলুন, ফিরে যাওয়া যাক।

বলে ওঠা যেত। তবু বলা গেল না।

স্বরযন্ত্রটা যদি কেউ মুঠোয় চেপে ধরে থাকে, কী করে বলে ওঠা যাবে? অতএব নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে এসে পৌঁছানো হয়ে গেল। গাড়ির চালকই ঠিক জায়গায় এনে ফেলল বেশ সহজেই।

জ্যোৎস্না মুখ বাড়িয়ে বলে উঠল, 'এ মা। এই বাড়ি। এতো ভাঙা বিচ্ছিরি!...আমি আগে নেমে পড়ি, দাদাবাবু?'

নিজ পদাধিকারের বলেই বলে ওঠে মেয়েটা। সে ছাড়া শনাক্তটা করবে কে? কিন্তু কঠোর একটা নিষেধবাণীতে থমকে যেতে হল তাকে।

'না। নামবে না।'

'বাঃ আমি না দেখলে—'

'থামো, চুপ করো। খবরদার নামবে না!'

'ছবি' নামের কালোকুচ্ছিত একটা মেয়েকে শনাক্ত করবার তো দরকার নেই পুরন্দর রায়ের। অতিসুন্দর আর উজ্জ্বল নির্মল একখানি মুখ হঠাৎ কালো হয়ে গেলে কেমন দেখতে লাগে, সেটাই তো শনাক্ত করার!

যাকে দেখে বলে ওঠা যাবে, 'বাঃ বাঃ, তুমি যে এমন একখানা পাকা অভিনেত্রী তা তো জানা ছিল না।'

কিন্তু বলা হল কই?

ছবি ছিল না। ছবি ডাক্তারখানায় গেছে।

ছবির মা এসে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, 'সুনয়না রায়? কেন? সে বাড়ি ফেরেনি? কাল সকালবেলাই তো চলে গেছে বাবা। এসো ভেতরে এসো। দেখেই বুঝতে পারছি তুমি কে?—কী বলছ? বসবার দরকার নেই? যা জানবার, জানা হয়ে গেছে?'

মহিলা হঠাৎ প্রায় কেঁদে ফেলে আর্তস্বরে বলে ওঠেন, 'বাড়ি ফেরেনি? তবে সে কোথায় গেল? আমিই যে তাকে প্রায় ঠেলে পাঠিয়ে দিলাম বাবা। ছেলেমানুষের মতো বায়না ধরে বলছিল, 'ছোটকালের জায়গায় এসে পড়ে আর যেতে ইচ্ছে করছেনা। মনে হচ্ছে থেকেই যাই।—আমিই বললাম, বাড়িতে না-জানিয়ে এভাবে বোকার মতো চলে আসা উচিত হয়নি।... তো বললো

কি, ঠিক আছে, চলেই যাচ্ছি। কিন্তু কোথায় গেল তবে ? আমার যে গা-হাত-পা কাঁপছে বাবা।... তুমি একটু বোসো বাবা, আমার মেয়ে এক্ষুণি এসে পড়বে।... ছেলের অবস্থা হঠাৎ খুব বাড়াবাড়ি হওয়ায়—'

কিন্তু কার শোনবার দায় পড়েছে ওই বুড়ির বকবকানি।

কথার মাঝখানে ছেদ পড়ে, 'আপনার ছেলের সঙ্গে দেখা হতে পারে ?'

কেন বলেছিল এ-কথা পুরন্দর রায় নামের লোকটা ?

তার কি সন্দেহ হচ্ছিল, এই হাড়গোড় বার-করা ভাঙা বাড়িটার মধ্যেই কোনখানে রয়ে গেছে সুনয়না। তাই ঢুকে পড়তে চেয়েছিল ? নিজের চোখে সন্ধান করতে চেয়েছিল ?

মহিলা কাতর আক্ষেপে বলেছিলেন, গতকাল হলেও দেখা হতে পারত বাবা। কালও একটু ওঠাউঠি করেছিল। হঠাৎ কি যে হল রাত থেকে একদম অচৈতন্য। তাছাড়া, আমার অদৃষ্ট। চোখের দৃষ্টিটাও হারিয়ে ফেলছে ক্রমশ। কত ভাগ্যি...তুমি এই ভাঙা কুঁড়েয় পায়ের ধুলো দিলে বাবা, অথচ আমি...ওই যে আমার মেয়ে এসে গেছে। ..ওমা! ডাক্তারবাবুও যে...'

যেন বেঁচে গেলেন।

ত্রাণ পেলেন।

পাড়ার ডাক্তার। চিরকালের চেনা আত্মীয়েরই মতো। পাড়ার অনেকের মতো ইনিও উপমন্যুকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবার পর কিছুটা ছাড়াছাড়া ভাবে থেকেছেন। তাছাড়া এরাই বা কে নিজেদের প্রয়োজনে ডাক্তারের কাছে ছুটেছে ? মা আর মেয়ে— দুটো প্রাণী। অসুখ করলেই ডাক্তার ডাকতে যাবে, এমন বিলাসিতার প্রশ্ন ছিল না।

কিন্তু কালক্রমে সকলেরই মত পাল্টেছে। কারণ পরিবেশও বদলে যাচ্ছে। এখন আর ওর ছেলে জেলে গেছে, বলে পড়শীরা আড়ষ্ট হয় না। তারপর তো ছেলে ফিরে আসার পর সকলেই সহানুভূতিতে বিগলিত আর পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। বিদেশী শাসকদের অত্যাচার থেকে যে অত্যাচার কিছু কম হয় না, দেশী শাসকদের হাতে, সে কথা বলতে আর এখন কেউ ভয় পায় না।

তা তদবধিই ডাক্তারবাবু আবার আত্মীয়ের অধিক।

ছবির মার কথায় বললেন, 'হ্যাঁ চলেই এলাম। ছবি যেমন বললে, তাতে মনটা একটু ইয়ে হলো শুধু শুনে ওষুধ দেওয়াটা ঠিক লাগলনা। ভাবলাম একবার চোখেই দেখে আসি।

কিন্তু দেখা মাত্রই যে তিনি রায় দিয়ে বসবেন, রোগীকে এই দণ্ডে হাসপাতালে দেওয়া দরকার একথা কে ভেবেছিল ?

আর একথাই বা কে ভেবেছিল, কবি পুরন্দর রায়ের নতুন গাড়িখানাতে

চেপে হাসপাতালে ভর্তি হতে যাবে অভাগা হতভাগা জেলখাটা আসামী উপমন্যু উপাধ্যায়!

অথচ ঘটলো তেমন ঘটনা।

কাঁচাপাকা চুল, কাঁচার থেকে পাকায় বেশী। সৌম্য চেহারার ডাক্তারবাবু বললেন, 'গাড়িটা কার ছবি?'

'ইয়ে, মানে এক আত্মীয়ের।'

'টুটুকে দেখতে এসেছেন?'

'না, মানে, পরে আমি আপনাকে সব জানাবো ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তারবাবু একটু বিগলিত ভাবে বললেন, 'এর আর জানানোর কী আছে? বলছো যখন আত্মীয়। আমাদের ওই বিড়লা হসপিটালটা তো বেশী দূর নয়, ওখানে নামিয়ে দিয়ে যাবেন। এখন এক মিনিট সময়ও ভয়ঙ্কর দামী ছবি! আমি কী ওঁকে অনুরোধ করতে পারি?'

'না না। ডাক্তারবাবু। একটা ট্যাক্সী ডাকতে আর কতো দেরী হবে? আপনি দাদাকে দেখুন —আমি—'

তোলপাড় করছ সারা শরীর মন।

সব আমার জন্যে। এই লক্ষ্মীছাড়ি হতভাগী ছবির দুর্মতিতেই সব। ওঃ। এসবের কোনো কিছুই ঘটতোনা। যদি ছবি অমন একখানা অঘটন কাণ্ড ঘটিয়ে না বসতো। নয়না তো মুছেই গিয়েছিল। হয়তো নয়নার মন থেকে আমরাও। আমিই কবর খুঁড়ে গলিত শব বার করে বসে—ওঃ। কাল যদি দাদা অতো উত্তেজিত না হতো, যদি নয়নার সঙ্গে সেই কথাগুলো না হতো, যদি নয়না বলে না যেত, 'তাড়িয়ে দিচ্ছো তাহলে তোমরা আমায়? ঠিক আছে।'

তাহলে কী দাদার এমন অবস্থা হতো?

ভিতরে ভিতরে তো ক্ষয়েই এসেছিল। কিন্তু এমন ফোঁপরা হয়ে গিয়েছিল, তা তো জানা যায়নি।

ছবি বলেছিল, 'ডাক্তারবাবু, এটা কি স্ট্রোক?'

'সেটা জেনে তোমার আর এখন কী লাভ— ছবি! দেখা যাক চেষ্টা করে।—'

ছবি বেরিয়ে এসে দেখলো গাড়িটা দাঁড়িয়ে, আর গাড়ির দরজা ধরে দাঁড়িয়ে পুরন্দর রায়। সময় নেই, তবু একটা থমকালো। বললো, 'দেখুন মাপ করবেন, আপনার সঙ্গে কোনো কথা বলা তো এখন সম্ভব হচ্ছে না। আমার দাদার হঠাৎ খুব—একটু থেমে সামলে নিয়ে বললো, ডাক্তারবাবু বলছেন, এক্ষুণি হাসপাতালে নেওয়াতে—

পুরন্দর একটু থতমত খেয়ে বললো, 'কেসটা কী?'

'কেসটা? সে এখন বোঝানো যাবে না। কিছু মনে করবেন না, আমি এখন—'

'বললেন তো ইমিজিয়েটলি হসপিটালাইস করার দরকার। তাহলে? যাচ্ছেন কোথায়? অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে?'

'অ্যাম্বুলেন্স!'

ছবি থমকে আর প্রায় শিউবে উঠেই বললো, 'না না, শুধু একটা ট্যাক্সী দেখতে—'

'দাঁড়ান, শুনুন, এই গাড়িটা তো রয়েছে।'

হ্যাঁ, সুনয়নার বরের গাড়ি চেপেই সুনয়নার প্রেমাস্পদ হাসপাতালে গেল চিকিৎসিত হতে।

হ্যাঁ। এমন অসম্ভব ঘটনা কতোই ঘটে!

যার সঙ্গে একবার দেখা হয় কিনা জানতে চেয়েছিল পুরন্দর রায় তাকে দেখলো!

দেখে ভিতরে ভিতরে খুব একটা ধিক্কার অনুভব করলো। এই কঙ্কালখানাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে!..আর সুনয়নার রুচি দেখে!

আশ্চর্য! কী অদ্ভুত ভাবে এদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল পুরন্দর। কয়েকমিনিট আগেও কী এটা ভাবতে পেরেছিল পুরন্দর? কবে আবার পুরন্দর এমন হৃদয়বান আর পরোপকারী ছিল?

ওর তো এই গোলমেলে ব্যাপার দেখে বলে ওঠার কথা, 'আচ্ছা নমস্কার! যে খবরের জন্য এসেছিলাম, তার আর দরকার নেই।'

তারপর চলে যেতো গাড়ির চাকার ধুলো উড়িয়ে।

কোন একটা হতভাগার মরণ ঘনিয়ে এসেছে বলে কাতর হয়ে তার জন্যে নিজের অমূল্য সময়ের এতোখানি ব্যয় করবে পুরন্দর রায়? এ কী ধারণা করবার কথা?

অথচ ঘটলো তেমন ঘটনা।

ছবি নামের রোগা কালো মেয়েটার উদ্‌ভ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে পুরন্দর রায় বলে উঠলো, 'এই গাড়িটা তো রয়েছে—'

অতঃপর?

অতঃপর দেখা যাক, ওই উপমন্যু উপাধ্যায় নামের লোকটা যে নাকি দীর্ঘদিন

ধরে একটা ভয়ঙ্কর অত্যাচারের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে কষতে ভিতরে ভিতরে ফোঁপরা হয়ে গেছে, সে আরও কতক্ষণ কতোদিন আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে চলতে পারে।

অথচ এসবের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই থাকতো না পুরন্দর রায়ের, যখন, জ্যোৎস্না বলে উঠেছিল, 'কী হলো দাদাবাবু? বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন না? বৌদি আসে নাই এখানে? যদি তখন পরিস্থিতিটা বদলাতো।'

তখন তো পুরন্দর বলে উঠেছিল, 'দূর্! যতসব বাজে খবর।' এবং চলে যেতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়ই পুরন্দরের গাড়ির ড্রাইভারের মনে হয়েছিল, গাড়িটার তেষ্টা পেয়েছে। অতএব তার পানীয় জল ঢালা দরকার। পাশেই রাস্তায় একটা কল থেকে জল পড়ে যাচ্ছে দেখেই হয়তো মনে পড়েছিল।

তারপরই তো ছবির উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বেরিয়ে আসা।

পরে—অনেক পরে ছবির সঙ্গে কথা হয়েছিল বৈকি।

ডাক্তারবাবুর হস্তক্ষেপে ভর্তি করার কাজটা দ্রুতই হলো। তারপর আনুষঙ্গিক কিছুর জন্যে লাগলো অনেকটা সময়।

আর সেই ছুটোছুটির জন্যে সেই গাড়িখানাকেই কাজে লাগানো হবে যেটাতে করে রোগীকে নিয়ে আসা হয়েছে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু তারপর?

রোগীকে 'বিশেষ কেয়ারে' রাখার ব্যবস্থা হয়ে পড়ার পর, রোগীর আত্মীয়দের আর কী করার থাকে?

তবে ডাক্তারবাবুর থাকতেও পারে কিছু করার। বলেছিলেন, 'আমি একটা রিকশ নিয়ে পরে চলে যাবো ছবি। তুমি এবার চটপট বাড়ি ফিরে যাও। তোমার মা কী অবস্থায় রয়েছেন, বুঝতে পারছো তো?'

ফিরে এসেছিল পুরন্দর ছবিকে নিয়ে।

আর হঠাৎ রাস্তায় একটা হোটেল খানা গোছের দেখে জ্যোৎস্না নামের মেয়েটাকে বলে উঠেছিল পুরন্দর, 'এই তুমি এখানে কিছু খেয়ে নাও। আমি এঁকে পৌঁছে দিয়েই চলে আসছি!'

যদিও মেয়েটাকে দেখছিল, আর বিষ উঠছিল, তবু বলতেই হলো।

তো সে মেয়েটা তো বলে উঠল, 'ওরে বাবা! আপনি আর ড্রাইভারদা দুজনায় চলে যাবে?'

তাতে কী? তোমাকেই তো খেতে বলা হয়েছে। তোমায় তো কেউ খেতে আসছে না। এটা তো বাঘ-ভাল্লুকের জঙ্গল নয়। তখন খিদে পাওয়ার কথা বলছিলে—'

জ্যোৎস্নাকে অবশ্য কেউই স্বেচ্ছায় আলো দেয়নি।

জ্যোৎস্না যখন ছবিকে দেখেই চমকে আর প্রায় উথলে বলে উঠেছিল, 'ভুলবাড়ি কী গো দাদাবাবু, এই তো বৌদিদির সেই বন্ধু।'

পুরন্দর চাপা কঠোর গলায় বলেছিল, 'তুমি থামবে? একদম চুপ থাকবে। নাহলে এইখানে নামিয়ে দিয়ে চলে যাবো!'

তদবধিই সেসমস্ত ঘটনা সমূহের নীরব দর্শক।

আর তদবধিই পুরন্দরের সমানে মনে হয়েছে, কী মারাত্মক ভুলই হয়েছে, ওই 'আগলি' জীবটাকে সঙ্গে আনা। না আনলে কোনো ক্ষতিই হতো না। অথচ এই আনাটায়—ওঃ।

ঠোঁট কামড়েছে সমানে।

ইচ্ছে হচ্ছে, ওটাকে এখানেই খুন করে কোথাও ফেলে দিয়ে যাই। এই সর্ববিধ ঘটনার সাক্ষীটাকে আবার ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। এবং জনদরবারে গিয়ে পেশ করতে হবে। উঃ।

জীবনে আর কতো বার কতো ভুল করবে পুরন্দর?

তবু—

ছবির সঙ্গে কথাটা হয়েছে ওর কান বাঁচিয়ে।

ছবি বলেছিল, 'আমার অবশ্য সন্দেহ হয়েছিল ও হয়তো বাড়ি ফিরবে না।'

আর সেইটা শোনামাত্রই পুরন্দর স্বভাবগত ভাবে তীক্ষ্ণতায় ঝলসে উঠেছিল, 'কেন? আপনার বন্ধুটি কী খুব কষ্টের মধ্যে ছিলেন? অত্যাচার, নির্যাতন, দুঃখ, দৈন্য?'

ছবি এতো মন খারাপের সময়ও একটু হেসে বলেছিল, 'মোটেই নয়, ঠিক তার উল্টোটা। বরং অতিরিক্ত সুখেই ছিলো। আর চেহারাতেও সে সুখের ছাপটি আঁকা হয়ে গিয়েছিলো। তবে কী জানেন? কপালটা যাদের দুঃখের সুখ তাদের বেশীদিন সয় না।...'

তারপর যতোটা সংক্ষেপে সম্ভব 'উপমন্যু উপাধ্যায়ের' আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি ঘটিত ঘটনাটি বিবৃত করে বলেছিল,

'সবটাই আমার দোষ। আমি ওই অদ্ভুত বোকামিটা না করে ফেললে, তার জীবনে এমন ঘটনা কোনোদিনই ঘটতো না। সারাজীবনটাই তার পরমসুখের ঘরখানাতেই কাটিয়ে দিতে পারতো। আমি না বুঝে তার সুখের ঘরখানায় আগুন দিয়ে বসলাম।'

পুরন্দর রায় একটু শ্লেষের গলায় বলেছিল, 'ঠিক কী তাই? হয়তো আগুনটা

ছিলই ছাইচাপা হয়ে, আপনি হয়তো ছাইটা একটু উড়িয়ে দিয়েছেন মাত্র।'

ছবি ওই শ্লেষতিক্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখে। তবু দোষ দিতে পারে না। ওর মনের অবস্থাটাও বুঝছে বৈকি ছবি! 'বিচ্ছেদ বিরহ' ওসব ফালতু কথা চুলোয় যাক। প্রধান প্রশ্ন তো 'মান সম্মানের'! সমাজে কতোখানি উঁচু পোষ্টে রয়েছে ওই কবিটি, সুনয়না যেন তাকে সেইখান থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চাইছে।

তাই ছবি শান্ত গলায় বললো, 'হয়তো তাই। আপনি কবি মানুষ। মানুষের হৃদয়ের নাড়ি নক্ষত্র বোঝেন। তবে হ্যাঁ, এখানে আমরা গঙ্গার পারের একেবারে কাছাকাছি মানুষ, গঙ্গার ভাঙ্গন দেখেছি। দীর্ঘকাল ধরে ভিতরে ভিতরে মাটি ক্ষইতে থাকে।...টের পাওয়া যায় না। হঠাৎ একদিন ধ্বস নামে। আর যখন পড়ে তখন হুড়মুড়িয়ে অনেক খানি পড়ে যায়।

তারপর আবার একটু হেসেই বলেছিল, 'জানেন, ও আমায় ধরে পড়েছিল, এখানে যাহোক একটা চাকরী জুটিয়ে দিতে। বলেছিলো এখনকার মেয়েরা সবাই স্বাবলম্বী। তা আমরা সবাই মিলে তাকে বকে বকে তাড়িয়ে দিলাম। মা বললো, বরকে না জানিয়ে এভাবে চলে আসাটা খুব অন্যায় হয়েছে! দাদা বললো, 'পাগলামি করিসনা! সংসারী মানুষরা গল্পের নায়িকা নয়।' আর আমি বললাম 'তোকে এখানে থাকতে দিচ্ছে কে?...ও বললো, ঠিক আছে। চলেই যাচ্ছি!'

ছবি হঠাৎ মুখ ফেরালো। বললো, 'এসে গেলাম।'

তারপর হঠাৎ বললো, 'যদি বাড়িতে ফিরে যায়, আমরা কী একটু খবর পেতে পারি?'

পুরন্দর স্থির গলায় বললো, 'যদি ফেরে? তবেই তো এ প্রশ্নের উত্তর।'

ছবি বললো, 'মাপ করবেন। নমস্কার।'

তারপর নেমে পড়লো।

পুরন্দর রায়কে এখন সেই 'আগলি' প্রাণীটিকে নিয়ে গাড়িতে তুলতে হবে। তার ভুরি ভোজনের দাম মিটিয়ে দিয়ে। তারপর একটা গল্প বানাতে হবে। বলতে হবে, 'হ্যাঁ, এই ঠিকানাটা ঠিকই। এই বাড়িতেই তোর বৌদি ছেলেবেলায় মাসিমার কাছে মানুষ হয়েছিল। ওইটিই ওর বন্ধু। কিন্তু এখানে তো আসেনি। দেখলি তো বাড়িতে একটা মরোমরো রুগী! এলে কী আর দেখে চলে যেতে পারতো? ওরাও তো শুনে ভাবনা করলো।

আপাততঃ এই গল্পটাই বেষ্ট।

'মরমর' রোগীকে পুরন্দর নিজের গাড়িতে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে এলো এর সাক্ষীতো রইল ওই পাজী মেয়েটা।

চলতে চলতে পথটা খুব দীর্ঘ লাগে।

আর তখনি হঠাৎ মনে হয়, 'গল্প তো' বানাতেই হয় মানুষকে। অসুবিধেয় পড়লেই বানাতে হয়, গল্প বানিয়ে বানিয়েই ম্যানেজ করতে হয় জীবনের সমস্ত গোলমেলে জায়গাগুলোকে। তাপ্পি দিতে হয় ফুটোফাটাগুলোকে।

এখন তো আপাততঃ এই গল্প। তারপর তাকে ভাবতে হবে, সেই পাকা অভিনেত্রী অবিশ্বাসিনী অন্যাসক্ত স্ত্রীটিকে খুঁজে বার করবার জন্যে যথাবিধি তোলপাড় করা চেষ্টা চালিয়ে চলা হবে, না কি তাকে 'জনহীন পথে' একা হারিয়ে যেতেই দেওয়া হবে।

হারিয়ে ফেলতে হবে বলে কী খুব যন্ত্রণাবোধ হচ্ছে?

সেটা আপাততঃ খেয়ালে আসছে না। এখন শুধু একটাই প্রশ্ন তীব্র হয়ে উঠছে, সমাজ-জীবনের সম্মান-সম্ভ্রম-বোধ। সেটাকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করতে হবে প্রাণপণে।

তার মানে সবার ওপরে 'মিথ্যাটাই সত্য।'

সমাজ-জীবনের কাঠামোটা যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর নীচের কাঠামোটা কার কতো মজবুত কে জানে। তবু দেখাতে হয় ভারী মজবুত। আসলে, বুঝি সকলেই নিঃসঙ্গ পথিক।

শুধু ওই 'সম্মান-সম্ভ্রম আর গৌরবময় সামাজিক পরিচিতির' চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে থাকবার চেষ্টায় একের সঙ্গে অপরে একটা ছায়াসেতু রচনা করে কাটিয়ে চলে। সেই সেতুটা উল্টে যেতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে, যে-কোন তুচ্ছ আঘাতে। আঘাতটা নিমিত্ত মাত্র।

অথচ এই ছায়াসেতু দিয়েই অহরহ পারাপার।

কিন্তু সুনয়না?

সে কোথায় হারিয়ে গেল?

এই ছায়াসেতুটা ছায়ায় মিলিয়ে যাওয়ায় সে কী জলের তলায় তলিয়ে গেল?.....

তা জানে না সুনয়না। সে এখন কোনদিকে ছুটে-চলা দূরপাল্লার একটা ট্রেনের কামরায় বসে আচ্ছন্ন হয়ে চলে চলেছে গত সন্ধ্যার স্মৃতির ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে।

টুটুদা বলেছিল, 'পাগলামি করিসনা, নয়না। জীবনটা নাটক নয়। সংসারী মানুষরা গল্পের নায়ক-নায়িকা নয়। সেটা হতে চাওয়াটা জীবনের মাঝখানে মৃত্যুকে ডেকে আনা!'

কিন্তু টুটুদা, ওই 'জীবনটাই' যদি সত্যি না হয়?

টুটু বলেছিল, 'কতো মিথ্যে আস্তে আস্তে 'সত্যি'হয়ে ওঠে, তার কী হিসেব আছে রে নয়না? তবু হয়।'

'তুমি দেখেছ এমন?'

'সবই কি প্রত্যক্ষ্যে দেখতে হয় রে? কিন্তু একটা কথা তুই আমার কাছে সত্যি বলবি? তুই কী তোর বরকে আদৌ ভালোবাসতে পারিসনি?'

নয়না মুখ তুলে বলেছিল, 'জানিনা।' একদিন ছবিও এই কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল। বলেছিলাম, 'লুঠ করে নিয়ে যাওয়া বাঁদীরাও তাদের ক্রীতদাসীর জীবনে থেকেও হয়তো হঠাৎ কোনো সময় সেই লুঠেরা বাদশাজাদাকে ভালোবাসতে শুরু করে। হয়তো সে ভালোবাসা নিরুপায়ের ভালোবাসা। পায়ের তলার মাটিকে মানুষ যে ভাবে ভালোবাসে। অথবা মাথার ওপরকার ছাউনিটাকে। সে মাটি ধ্বসে যেতে বসলে প্রাণপণে সামলায়। ঝড়ে ছাউনিটা উড়ে যেতে গেলে আঁকড়ে ধরে। তাকে যদি ভালোবাসা বলা হয় তো ভালোবাসা।'

'নয়না, জীবনের বহিরঙ্গটাও তো ফ্যালনা জিনিষ নয়। কাল তুই জিগ্যেস করেছিলি, একদা অতো নিষ্ঠুর হয়ে থেকে ছিলাম কী করে? তার উত্তরও ওই একটাই। 'সত্য'কে যাচাই করতে বসলে পৃথিবীর সামনে নিরাবরণ জীবনটাকে মেলে ধরতে হয়। যেটা শেষ পযর্ন্ত না রাখে গৌরব না দেয় সম্মান।'

'সম্মান সম্ভ্রম, গৌরব'—এইটাই শেষ কথা।

টুটু একটু হেসে বলেছিলো, 'শেষ কথা কিনা জানি না। তবে ওটাই অশেষ কথা।'

'কিন্তু টুটুদা খুব দীন দুঃখী ভাবে, কোথাও একটু টিঁকে থাকবার স্বাধীনতা কী থাকতে পারেনা মানুষের? মানে মেয়েমানুষের?'

টুটু একটু হেসে বলেছিল, 'থাকতে হয়তো পারে। কিন্তু হঠাৎ একসময় হয়তো কোনো সময় ধরা পড়বে সেটাও একটা অন্য ধরনের মিথ্যা! অথচ তখন আর কিছু করার থাকে না।

তারমানে চিরদিন একটা মিথ্যার সঙ্গে আপোস করে থাকাটাই তোমাদের মতে উচিত।

টুটু প্রায় জোর গলায় হেসে উঠে বলেছিল, 'আপোস না করতে পারলে কি হয় তার নমুনা তো দেখছিস এই উপমন্যু উপাধ্যায়কে! পুলিশের ঠ্যাঙানিতে হাত ভাঙবে হাঁটু ভাঙবে পাঁজরের হাড়গুলো গুঁড়ো হবে। বাকি জীবনটা বিছানায় মৃতবৎ পড়ে থাকা! পালা নয়না। দোহাই তোর! পুলিশ সর্বত্রই আছে। ঘরে বাইরে।'

'টুটুদা, আমি যদি শুধু তোমার সেবার অধিকারটুকু নিয়ে এখানে পড়ে থাকতে চাই? তাহলেও কী পুলিশ ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে আসবে?

তখন ছবি বলে উঠেছিল, 'কে দিচ্ছে তোকে সেই অধিকার? কে থাকতে দিচ্ছে এখানে? যা ভাগ্! নিজের ডানলোপিলের গদিতে হাত-পা বেলে শুতে বসগে যা!

'টুটুদা! তোমারও তাই মত?'

টুটু গাঢ় স্বরে বলেছিলো, 'তা ছাড়া আর কী মত আশা করিস নয়না? আমি তোর ভালো চাই! তোর দুরবস্থা দেখতে চাই না! আমিও বলছি তুই চলে যা, নয়না।'

'ওঃ। সকলে মিলে আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছো? ঠিক আছে!'

'ভুল বুঝিস না নয়না। তোর নিজের মনটাকেই আগে যাচাই করে দ্যাখ। সেটাই সব চেয়ে জরুরি।'

'যদি বলি, যাচাই হয়ে গেছে?'

টুটু বলেছিলো, 'আমি তোর মুখ দেখতে পাচ্ছি না নয়না। তবু অনুভব করছি, হয়তো হয় নি। সে যাচাই আবেগের সময় হয় না!.....একা নির্জনে বসে, নিজেকে তুলে ধরে ধরে দেখতে হয়!.....জেলযাত্রায় গিয়ে আমার ওই একটা সুবিধে হয়েছিল নিজেকে যাচাই করবার।'

'কী? নিজেকে যাচাই করে দেখেছো?'

'ধর তাই!'

তবু তুমি আমায় চলে যেতে বলেই যাচ্ছ। ঠিক আছে আর কখনো আসবো না!

'যদি শুনিস আমি মরে যাচ্ছি, তখনো না?'

'সেটা শোনবার আর খুব বেশী বাকি আছে কী, টুটুদা?'

'তা হয়তো নেই। আর যখন প্রত্যাশার বাইরে ছিলো তখন মনে মনে কল্পনা করতাম, হয়তো মরণকালে হঠাৎ দেখবো তুই কোনো সূত্রে অকস্মাৎ এসে হাজির হয়েছিস! মানে নাটক ফাটকের মতই।'

'টুটুদা, সেই কালটাকে তো প্রায় ঘনিয়েই এনেছো। তবে কেন তাড়িয়ে দিচ্ছো?'

'আরে দূর্? তার এখন অনেক বাকি। এহলো দধিচীর হাড়ে গড়া দেহ। এতো সহজে যাবে না। তুই এখানে পড়ে থাকলে, হয়তো চক্ষুলজ্জার দায়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়তে হবে।'

'টুটুদা! এই কথা বলতে পারলে তুমি? ঠিক আছে।'

হ্যাঁ বরাবরের মতোই 'ঠিক আছে' বলে দাঁড়িয়ে উঠেছিল সুনয়না বলে। আর তারপর কিনা রাত পোহাতেই একটা 'বেঠিক' কাজ করে বসেছে। 'ফিরেই যাচ্ছি' বলে একটা উল্টো লাইনের রেলগাড়িতে উঠে বসেছে। যে গাড়িটা দূরপাল্লার।.....তবে কী এখন নিজেকে যাচাই করতে বসবে সুনয়না? না, সেটা হয়ে গেছে? আর পথটাও বোঝা হয়ে গেছে?....একা-একা এক....নির্জন পথ।